আদিম আশ্রয়

শক্তিপদ রাজগুরু

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ

কান্তি রঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ

পঞ্চানন মালাকর

প্রকাশকাল ঃ

সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ

নিউ বৈশাখী প্রেস

শ্রীসুকুমার ঘোষ

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা-৬

অনুজ সাহিত্যিক

গোবিন্দ বর্মণ

স্নেহাস্পদেষু—

মুরুং বেশ মন দিয়েই লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা।

ঘন শালবনের ফাঁক দিয়ে দুপুরের একফালি রোদ লুকিয়ে ছাপিয়ে যেন উঁকি দিচ্ছে। এ বনে সূর্যের আলোও ঠিকমত ঢোকে না। নীচে গাছ-গাছালির ঝোপ, তাতে জড়িয়ে আছে চীহড় লতাপলাশের ঘন আলিঙ্গন। আর মাটিটা স্যাঁতসেঁতে।

বছরের পর বছর ওখানে ঝরা পাতা পড়ে পচেছে—বর্ষার জল বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে। কুড়কি—কাড়ান, দুর্গা ছাতুগুলো সাদা বিরাট ফুলের মত ফুটে থাকে।

আর গাছগুলো সিধে সোজা উঠে গেছে।

ওদের কাণ্ডের বাকলগুলো মাঝে মাঝে কারা যেন টেনে তুলেছে, সেগুলো শুকিয়ে ঝুলছে লম্বা সাপের মত। মুরুং জানে কুলা, গণেশ মহারাজের কাণ্ড ওসব। সারান্দার বনে বুনো হাতির অভাব নেই। দলে দলে তারা ঘুরে বেড়ায় এই বনের সম্রাটের মতই। মুরুং দেখেছে ধান-পাকার সময় তাদের বসতিতেও আসে—ধানক্ষেতে নামে রাতের অন্ধকারে।

বাতাসে ওঠে ওদের তীক্ষ্ণ চীৎকার।

তাদের বসতির মারু সর্দার—মতি কাকা—ডুংরির সকলে বের হয় মশাল জ্বেলে। ওরা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ছেলে মেয়ে মিলে চীৎকার করে।

অনেকে আবার কুলোয় ধান দিয়ে জমির এদিকে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর স্বরে বলে—

—বোঙা—এ বাবা গণেশ বোঙা, মোর ক্ষেতির ধান না খা বাবা। সারা বরষ বাল-বাচ্চা-পোনা লিয়ে ভুখা মরবো বাবা।

পূজো দিলম তুকে—তু হুরুকে যা।

তাদের এই কাতর প্রার্থনা হয়তো বনচারী ওই বিরাট জীবগুলোর কানে যায়। ওই প্রাণীগুলো শুঁড় তুলে বাতাসে কিসের ঘ্রাণ নেয়,

বিরাট কান নেড়ে কি শোনার চেষ্টা করে। অনেক সময় ওদের অত্যাচার বন্ধও হয়ে যায়।

পাকা সোনা ধানের ক্ষেতে একপাল হাতি নেমে ফসল যা না খায় নষ্ট করে তার থেকে বেশী। বিরাট পায়ের চাপে ধানগুলোকে মাড়িয়ে দেয়, জলে কাদায় পুঁতে দেয় পাকা ধানের রাশ।

ওদের প্রার্থনা হয়তো বুঝতে পারে বন্য প্রাণীগুলো। মুরুং তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিচ্ছে—তার সারা দেহে কি নেশা, বলিষ্ঠ দেহ—কৌতূহলী চোখ মেলে দেখছে সে; কিন্তু মনে হয় ওই বিরাট জানোয়ার একটাকে তীরকাঁড় দিয়ে শেষ করে দেবে।

কিন্তু কুইলি বাধা দেয়—এ্যাই; গণেশ ঠাকুর বটে। চুপ যা!

কুইলিও এসেছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে।

রাতের আবছা অন্ধকারে মশালের লাল আভা পড়েছে কুইলির মুখেচোখে, কি যেন ভয় জড়ানো। কুইলি হাত দিয়ে মুরুং-এর তীরটা ধরেছে। থেমে গেল মুরুং!

কুইলির কথা সে ফেলতে পারে না।

হাতিগুলোও আর এগোয় না। কি ভেবে দলপতি বিরাট দাঁতাল হাতিটা উপরের দিকে শুঁড়টা তুলে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে—হু-হু-স্… হাতির পাল পিছিয়ে যাচ্ছে ওরা চড়াই-এর উপর বনের দিকে চলে গেল।

....আজকের মত ফিরে গেল ওরা কি ভেবে।

মুরুং ছেলেবেলা থেকেই এই বনে জন্মেছে। বনের সীমানা কতদূর তা জানে না, চারিদিকে দেখেছে আকাশছোঁয়া পাহাড়, আর পাহাড়ের পর পাহাড়।

সেবার ছাতাপরবের সময় ওরা ছাতাবুরু পাহাড়ে উঠেছিল একেবারে মাথার উপর। ঘন বন চীহড়লতা জড়াজড়ি করে পথ আটকে রেখেছে।

ভুরিয় মুইয়া—কারো—তামুহো—টুয়াই আরও অনেকে রয়েছে। মেয়েরাও চলেছে ক'জন। কুইলিও বলে—আমিও যাবো হে।

মুরুং ধমকে ওঠে—তু যাবি নাই। সাঙ্গীণ বন আর তেমনি খাড়াই বুরু বটে!

কুইলি সোনাই মুণ্ডার মেয়ে। সোনাই মুণ্ডা এই ডুংরির মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ। তার গোয়ালে অনেক গরু, শুয়োরও পোষে, আর ক্ষেতি জমিও বেশী। গুয়ার হাটে তার ঘরের তৈরী ঘি, ছাগল বিক্রি করার জন্য পাইকেররা আসে।

বনের কাঠমহাজনদের সঙ্গে সোনাই মুণ্ডার ভাব সাব খুব।

ওর ঘরেই তারাও আসে।

ক'বছর ধরে ট্রাক আসছে বনে, শীতকালের ক'মাস ধরে বনের বিরাট কাঠ-লগগুলো মহাজনরা গুয়া-মনোহরপুরে চালান দেয়।

সোনাই মুণ্ডার তাই চলতি অবস্থা।

আর কুইলি তাই ডুংরিতে দাপিয়ে বেড়ায়। টুয়াই হো মেয়েটাকে দেখে বলে ওঠে মুরুং-এর কথায়:

—চল তু। মুরুং কে বটে হে যে না করবেক।

মুরুং কথাটা শুনে চুপ করে থাকে। কুইলি বুনো ময়ূরের মত গলাটা তুলে বুক চিতিয়ে চলেছে টুয়াই-এর সঙ্গে। ও যেন মুরুংকে এখন কেয়ার করে না। আর করবেই বা কেন!

বনের এপথে মানুষজন চলে না। পথও নেই। সঙ্গে হাতটাঙ্গি দিয়ে ঝপ ঝপ কোপ দিয়ে পথ করে চলেছে। গাছে গাছে ঝুলছে পরগাছার জঙ্গল, নীচের প্রায়ান্ধকার বনরাজ্য দিয়ে ওরা চলেছে।

ওদের গানের সুর ওঠে।

ছাতাপরবের জন্য দুর্গম বনের থেকে ছাতা কাঠ কেটে আনবে ডুংরির জোয়ানরা। সঙ্গে নিয়েছে চাল রুটির পোঁটলা, নুন আর মরিচ।

ঝর্ণার জলের অভাব নেই।

মুরুং ওদের সাবধান করেছিল—হুঁসিয়ার যাবি। সাঙ্গীণ বন বটে। দুর্গম অরণ্য। আদিম যুগ থেকে যেন নিজের স্তব্ধতার অতলে ডুবে থাকে। দূরে দেখা যায় গুয়ার পাহাড়—ওদিকে নাকি পাহাড় পেরিয়ে গুয়ার কারখানা—হাট। তারও ওদিকে বড়জামদা—বড়বিলে নোয়ামুন্ডি

কল এসেছে। পাহাড় কেটে, ফাটিয়ে লোহা পাথর তুলছে। রাতকে দিন করেছে, সেখানে বিজলি বাতি জ্বলে।।

টুয়াই তাদের স্বজাতি হলেও সে সারান্দা বনের বাইরে পাহাড়ের ওদিকের ডুংরির ছেলে। সোনাই মুণ্ডার এখানে কাজ করে। বন-মহাজনদের ট্রাকে করে গেছে। ও দেখেছে, বাইরের জগৎটাকে ওই গুয়া লায়মুণ্ডি সহরকেও।

ছায়ানিবিড় বনের বুক চিরে উঠছে তারা পাহাড়ের দিকে, সঙ্গে নিয়ে চলেছে চামড়ার ছাউনি করা বিরাট বাদ্যি, টামাক, ধামসা চড়া, পেটির কুলকুলি।

বনের গভীরে রেগড়া টামাক-এর বাদ্যিটা গুম গুম আওয়াজ তোলে —ধামসা বাজছে।

—ভুড়ি ভুড়ি তাম্—বাস্কে পটম তাম্!

ওরা সারবন্দী চলেছে। ঝপাঝপ ধারাল কুঠারের কোপ পড়ছে লতা, ছোট গাছগুলোর উপর। পথ করে উঠছে তারা পাহাড়ের মাথায়।

টুয়াই দেখায়—উই বটে বড়জামদা হে, উদিকে ঠাকুরাইন পাহাড়। ধোঁয়া উঠছেক উটো বটে নুয়ামুণ্ডি। ইদিকে ভাল্ ন্যাড়া ঠ্যাক ঠ্যাকে পাহাড়।

অবাক হয়ে দেখছে মুরুং। চারিদিকে সারান্দার গভীর সবুজ কালো অরণ্য—পর্বত যেন ঢেউ খেলানো। যতদূর চোখ যায় চলে গেছে পাহাড়ের সীমা পার হয়ে। এদিকের পাহাড়শিরার মাথাটা যেন ধ্বসে পড়েছে—বিরাট দেহটায় জঙ্গলের সবুজ ভাব নেই। লালচে মাটি—কালচে পাথরগুলো দেখা যায়। বিশ্রী বেদনাদায়ক বোধহয় ওই দিকটা।

কুৎসিত। মুরুং শুধোয়।

—উদিক এ্যামন কেনে হে? খাবলে খেয়ে ফেলালো কে বটে?

হাসে টুয়াই। মুরুং এই বাইরের জগৎকে দেখেনি, চেনেও না। তাই টুয়াই বলে।

—দিখুরা পাহাড় ফাটাই বন কাটি সাফ করি দিছে, ওই পাহাড়ের পাথর খুব দামী হে। ইয়া বড় বড় কল বসাই—খাবুলে পাথর তুলছে। উতে লোহা হয়—বড় বড় কল বানালো টাটায়—লোহার কল।

মুরুং বুঝতে পারে না লোহার কল বসাবার জন্যে তাদের সুন্দর বন-পাহাড়গুলোকে এভাবে ঘুচিয়ে দেবে কেন?

দুপুর হয়ে গেছে। মুরুং চুপ করে দেখছে দূরের উপত্যকার বিচিত্র রাজ্যের দিকে। ওখানের আকাশ ধোঁয়ায় মলিন, সবুজ ওখানে নিঃশেষ প্রায় রোদের আলোয় দেখা যায় টিনের লম্বা শেড—ছোট-খাটো বাড়ি আর একটা বিরাট কেঁচোর মত কি গড়িয়ে চলেছে।

টুয়াই বলে—রেল বটে! কলে চলে! লুহার লাইন বরাবর গড়-গড়িয়ে ছুটে যায়।

সব কাঠ—ওই পাথর ইসব লিয়ে যায় ইখান থেকে।

মুরুং বিস্মিত চাহনি মেলে বহুদূর আকাশপথ থেকে দেখছে ওই জগৎকে। যেখানে তাদের বনের সবকিছু চলে যায়।

এখানে অরণ্যের বুকে ছায়া নেমেছে, একটা ঝর্ণার ধারে ওরা বসেছে। ডুংরি থেকে আনা শালপাতায় মোড়া দাকা পটম, উডু পট-মগুলো বের করেছে। সেই ভোরের আঁধারে 'ডুরখা ইপিল' অর্থাৎ শুকতারা থাকতে থাকতে ওরা ডুংরি থেকে বের হয়েছে কালকের রাঁধা ভাত আর তরকারীর পুঁটুলি নিয়ে।

এতক্ষণ ধরে বনে পাহাড়ে ঘুরে এবার খিদেও পেয়েছে।

মুরুং চুপ করে বসে আছে। কুইলিকে দেখছে! মেয়েটার কালো নিটোল মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, মুক্তোর মত টলটল করছে। ডাগর চোখে খুশীর আবেশ।

কুইলি-টুলাই-মান্নু-দোকাই ওরা বসেছে ঝর্ণার ধারে পাথরে। হাসে ওরা। ওদের হাসির শব্দ বনে সুর তুলেছে। টুয়াই গান ধরেছে। চোখে মুখে বিশ্রী হাসিটা ফুটে ওঠে।

—উল বেল এ হরমো তাম্ হো—

বেল সিঙ্গোঁ তু-আ তাম্ হো—

নো আ হরমো—নো আ-তো আ দো

মুরুং চমকে উঠে চাইল ওদের দিকে। ওই গান লোকালয়ে ওরা গায় না। এ গান যৌবনের উন্মাদনার গান। আর টুয়াই এ গান শোনাতে চায় কুইলিকে।

ওর অর্থ তোমার শরীরটা যেন পাকা আমের মত রসাল। তোমার স্তন দুটি পুরুষ্ট বেলের মত সুন্দর।

হাসছে ওরা সকলেই।

কুইলি ঝর্ণার জল ছিটিয়ে হাসছে। ও প্রমত্ত একটি ঝর্ণা, যেন বনের গভীরে কলহাস্য মুখরা রূপে বয়ে চলেছে। মুরুং চুপ করে থাকে। ওই গানটা তার ভাল লাগে না।

…হঠাৎ কান পেতে কিসের শব্দ শোনে সে।

বনের বাতাসে ওঠে মড় মড় শব্দ। সাবধানী সন্তর্পণী ওই শব্দটা থামছে, আবার শোনা যায়। মুরুং ছেলেবেলা থেকে বনে বনে ঘুরেছে, অরণ্যই তাকে যুগিয়েছে অন্ন-জল। এ মাটির প্রাণীদের সে চেনে। ওই পায়ের শব্দ তার চেনা। বাতাসে সে ঘ্রাণ পায় জানোয়ারদের।

জলের ধারে বসে আছে তারা। কোন বন্যপ্রাণী আসবে জল খেতে; কিন্তু তাদের দেখে সরে গেছে। মুরুং গাছের ফাঁক দিয়ে দেখছে দূরের পানে, গাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—রোদে ছায়ায় ওদের নীচে অন্ধকার নেমেছে। মুরুং ধনুকটা নামিয়ে একটা তীর বের করেছে।

হঠাৎ শান্ত বনভূমি ছাপিয়ে একটা চাপা হুঙ্কার ওঠে।

ওদের কলরব—গান থেমে যায়। কুইলি আর্তনাদ করে ওঠে। —বাঘ বটে গ।

ওদের আড্ডা ভেঙ্গে গেছে। কে কোন্ দিকে ছিটিয়ে পড়তে চায়।

মুরুং গর্জন করে,—কেউ ভাগবি নাই, ইদিকে আয়। এক ঠাঁই হবি। হুঁসিয়ার মরদ।

ওদের হাতের টাঙ্গি—ফরশা ভাল্লাগুলো সোজা হয়ে ওঠে। ভয়ে কাঁপছে কুইলি, টুয়াই!

টুয়াই ততক্ষণে সামনের শাল গাছটার ডাল ধরে লাফিয়ে উঠেছে। কুইলির ব্যাকুল চীৎকার শোনার সময় তার নেই, ডাল ধরে উঠে চলেছে সে উপরের দিকে।

বাঘটা সরে যাচ্ছে এদের চীৎকারে। মুরুং রুখে দাঁড়িয়েছে। দু-চোখ জ্বলছে, তার হাতে উদ্যত তীর। কালো পেশীবহুল দেহটা কি এক তেজে ফুলে উঠেছে। হঠাৎ পাতার উপর একটা শব্দ তুলে হলুদ একটা প্রাণী সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়েছে—দুচোখে তার ভয়। এদের দেখে ওখানেই শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তার আগেই মুরুং-এর তীরটা গিয়ে শূন্যেই ওই প্রাণীটার বুক ভেদ করেছে—মাটিতে পড়বার আগেই দ্বিতীয় তীরটা কাঁধের কাছে বিঁধেছে।

সশব্দে মাটিতে, ঝোপ জঙ্গলের উপর আছড়ে পড়ে বিরাট হরিণটা, বাঘের তাড়া খেয়ে এদিকেই আসছিল সে। বাঘটা এদের দেখে থেমে গেছে—হরিণটা ভেবেছিল পালাতে পারবে।

কিন্তু তা হয়নি—মুরুং-এর দুই তীর বিঁধে পড়েছে সেটা এদের সামনেই।

ওরা সকলে এবার টাঙ্গির ঘায়ে শেষ করেছে প্রাণীটাকে।

বাঘটার মুখের শিকার কেড়ে নিয়েছে এরা ; তাই যেন চাপা গর্জন করছে সে দূর থেকে।

মুরুং গর্জায়—সামনে আয় দেখবো হে।

কুইলি দেখছে মুরুংকে। কালো নিটোল দেহে শুধু শক্তি-ই নয় মনের সাহস—হাতের নিশানাও দেখেছে আজ। ও বিপদের মুখে আজ এদের সকলকে রক্ষার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল, আর সেই সাধ্য তার আছে এটা দেখেছে কুইলি।

—এ টুয়াই, টুয়াই হে! মানা মুণ্ডা হাঁকছে টুয়াইকে।

টুয়াই প্রথম চোটেই ভয় পেয়েছিল বাঘের গর্জন শুনে, বাঘটা যেন এবার তাদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই টুয়াই গাছে উঠে পড়েছিল, কিন্তু বাঘটা সরে গেছে মুখের শিকার ছেড়ে—আর সেই শিকার

ছিনিয়ে নিয়েছে মুরুং।

বিরাট হরিণটা এবার ওরা ডুংরিতে নিয়ে যাবার আয়োজন করছে।

টুয়াইও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে এবার সামাল দেবার চেষ্টা করে। ও বলে।

—দেখছিলাম বাঘটা কোন্‌দিকে গেল হে।

—নেমে এসো! ডাকছে ওরা:

টুয়াই এবার বিপদে পড়েছে। যতখানি শক্তি নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গাছে উঠেছিল প্রাণের ভয়ে, এবার নামবার সময় সেই উদ্যম ফুরিয়ে গেছে। নীচের দিকে চেয়ে ভয় পায় টুয়াই।

বলে—নামছি হে। যা পিছল—হড়কে না যাই হে।

কুইলি দেখছে ওই প্রাণীটিকে। ওর মুখচোখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির কাঠিন্য।

ঝপ্ ঝপ্ কোপ পড়ছে মাঝারি একটা শালগাছে, ওরা গাছটা কেটে ফেলে হরিণটার সামনের দুপা—আর পিছনের পা দুটো লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ওই গাছ পুরে কাঁধে নিয়ে যাবার আয়োজন করছে।

কুইলি দেখছে টুয়াইকে।

গাছ থেকে ওকে ধরে নামিয়ে এনেছে মানা মুণ্ডা। টুয়াই-এর বিশেষ সঙ্গী সে। লাল পিঁপড়েতে কামড়েছে টুয়াইকে। ঝাড়তে ঝাড়তে টুয়াই এগিয়ে এসে কুইলির দিকে চেয়ে হাসলো।

মেয়েটা ফুঁসে ওঠে—হুরুকে যা। ডরপোক্ তু—মাদীটো। কেনে পালাইলি?

টুয়াই একটু অবাক হয়। তবু পকেট থেকে ওকে খুশী করার জন্যে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয়।

—লে।

মুরুং দেখছে ব্যাপারটা।

কুইলি ফুঁসে ওঠে—সিগ্রাট না খাবো।

ওর সঙ্গীদের বলে—চল রে!

হাসে টুয়াই! নিজেই সিগারেটটা মুখে নিয়ে দেশলাই জেলে সিগারেটটা ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা শুকনো পাতার ওপর ফেলে এগিয়ে যাবে, হঠাৎ মুরুং-এর ডাকে চাইল। মুরুং বলে ওঠে।

—ইটা কি রে? বনে বাস করে বনকে জ্বালাইবি নাকি? লিভোও ইটাকে।

পা দিয়ে জ্বলন্ত পাতাগুলোকে নিভিয়ে ওর মুখ থেকে সিগারেটটা ফেলে দেয় ঝর্ণার জলে। তখন গ্রীষ্মকাল।

এখন বনে ঝরাপাতার রাজ্য, সব যেন বারুদের মত দাহ্য হয়ে আছে। সামান্য আগুনের ফিন্‌কিতে সারা বনে ছড়িয়ে পড়বে ওই আগুন।

মুরুং-এর ধমকে টুয়াই থেমে গেল।

আজ মুরুং-এর কাছে কোথায় নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে টুয়াই!

ওরা এবার শোভাযাত্রা করে ফিরছে। আজ মুরুং-এর মনে বিচিত্র একটা সুর ওঠে। ছায়ানামা বনে মুরুং হঠাৎ চাইতে দেখে কুইলির ডাগর দুটো চোখের চাহনি নিবদ্ধ রয়েছে তার দিকে।

নীরব চাহনীতে ফুটে উঠেছে বিচিত্র বিস্ময়—আরও কিছু।

দলবেঁধে এই অরণ্যভ্রমণ—এই গহন বন আর প্রকৃতিকে চেনা—কঠিন দুর্গমতার মাঝে জীবনকে দেখা এ যেন যৌবনের ধর্ম। এখানের মানুষের জীবনযাত্রার আদিম পদ্ধতি।

ডুংরির ছেলেমেয়েরা এভাবে কোন পরব উপলক্ষ্যে বের হয় বন ভ্রমণে।

তাদের একঘেয়ে জীবন বৈচিত্র্য আনে, নিজেদের শক্তি সাহসটাকেও যাচাই করে নেয় তারা।

সোনাই মুণ্ডা জঙ্গলের আদিবাসী ক'টা গাঁয়ের মধ্যে প্রভাবশালী লোক। এখন এদিকের মানুষও যেন বদলাচ্ছে। জোট বেঁধে তারাও আগেকার বনের মাঝের নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাত্রাটাকে বদলাতে চায়।

সোনাই-এর জমিতে—তার কাঠের কারবারে দু-চার জন কাজ করে। মুনিমজীকে সোনাই মুণ্ডা এনেছে বড়জামদা থেকে। কাজকারবার

করতে হয় তাই পড়া লিখা জানা আদমীর তার দরকার। মুনিমজীর শীর্ণ পাকানো চেহারা—লোকটাকে বসতির একদিকে কাঠের গুঁড়ির টাল, কেন্দুপাতার আড়তের পাশে একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছে। মুনিমজীও কানে খাঁকের কলম গুঁজে এসে হাজির হয় সোনাই-মুণ্ডার বাড়ির বাইরের উঠোনে।

সোনাই-মুণ্ডা বোরাই সর্দারকে দেখে চাইল। বৈকালের আলো নেমেছে বনে পাহাড়ে। বুড়ো হয়ে গেছে বোরাই, মুখের চামড়াগুলোয় বয়সের ছাপ আঁকা। সারা দেহের চামড়া কুঁচকে গেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা এখন নুয়ে পড়েছে, তবু সরজম দারু। শালগাছে ঘুণ ধরে না। বোরাই সর্দার জন্মসূত্রে এই অরণ্যভূমির ভূমিজ সর্দার।

—অতীতের মুণ্ডারা এই অরণ্যরাজ্যের ছিল সর্বজন সম্মত শাসক। তাদের বিধানই ছিল চরম। এখনও গভীর অরণ্যে দেখা যায় পাথরের তৈরি গুহাগুলো। এখন সেখানে মানুষ যায় না।

গভীর অরণ্য নীচে লিগিরদার জলা—জায়গাটা হয়ে উঠেছে বনের হাতি, বুনো মোষ, বারোশিঙ্গা হরিণ-সম্বরদের আস্তানা।

চারিদিকে ঘন বন ওই গুহারাজ্যকে আজ যেন মানুষের দৃষ্টির বাইরে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছে। আর সেখানের বড় বড গুহাগুলোয় আশ্রয় নেয় বনের প্রাণীরা।

বর্ষাকালে এ অরণ্যে মেঘগুলো পর্বতকন্দরে—দীর্ঘ গাছগুলোর মধ্যে আটকে গিয়ে সব বৃষ্টিটুকু নিঃশেষ করে। বর্ষা নামে এই অরণ্যে তখন বাইরের জগতের সঙ্গে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর সেই মেঘঢাকা বিদ্যুৎ চমকানো পরিবেশে এই বনরাজ্য আদিমতায় ভরে ওঠে। বোরাই এই অরণ্যের সেই বিস্মৃত যুগের নায়ক।

বাঘ অরণ্যের সুখী প্রাণী। তার গায়ে বৃষ্টির জল লাগলে সে বিরক্ত হয়, পায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগলে চেটেপুটে সাফ না করে থামবে না! বাঘও ওই গুহায় আশ্রয় নেয় সেই বর্ষায়। সেইদিনের আদিবাসীদের প্রাসাদ আজ পরিত্যক্ত।

বোরাই মুণ্ডাকে দেখে ভক্তিভরে জোহার করে অনেকেই। সোনাই

মুণ্ডা মাথাটা তেমন নোয়ায় না। আজ সোনাই মুণ্ডা জানে বোরাই সর্দারের মূল্য কতটুকু। অতীতের অরণ্যজগতের ধ্বংসস্তূপ মাত্র। আর লোকটার জমিজারাতও কিছু নেই। তার বংশও ফৌত।

ভাই বাদুমুণ্ডার ঘরে একটা চালায় পড়ে থাকে, টুকটাক জড়িবুড়ির ওষুধপত্র দেয় আর মাদনা কুদ্‌রো টাড়াবারো এই দেবতাদের কথা বলে, মাটিতে ভর দিয়ে ওর নুয়ে পড়া দেহটা টেনে টেনে বলে, যেন একটা বাজপড়া শালগাছ—খোলসটাই দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ওটা ফোঁপরা হয়ে গেছে। একটা দমকা ঝড়ে যে কোন মুহূর্তে উপড়ে পড়বে।

বোরাই সর্দারও জানে সোনাই-এর টাকার গরমের কথা। আর বাইরের দিখুদের সঙ্গে ওর মেলামেশার কথাও শুনেছে। কে একটা বাবুই দড়ির বোনা মাচুলি এগিয়ে দিয়ে বলে—

বোসো সর্দার।

বোরাই শুধোয়—পোলাগুলান ফিরেছে বন থেকে ?

সোনাই মুণ্ডা প্রথম থেকেই চটেছিল, সে দিনভোর ওই ছেলেদের কাজ কামাই করে বনে বনে ঘোরাটা পছন্দ করে না। তার অনেক কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বোরাই সর্দার বলে—বনে বাস করবি, ইখানে মানুষ হবি ইখানের বনকে চিনবি নাই তুরা ? কতো বুরু—কতো বোঙা তাদের জোহার করবি নাই ; ছাতা নামবেক, বসুমতী শেতলা হবেক।

সোনাই মুণ্ডা কিছু বলার আগেই এখানের মানুষজন বৃদ্ধা তোকি বুড়িও স্বীকার করে।

—হ্যাঁ। ঠিক কথা।

তাদের কাছে এই অরণ্য পর্বত দেবতাবিশেষ।

বোরাই বুরু অতীত আরণ্যক জীবনের প্রতীক।

এখনও দুর্বার ঝড়ে কাঁপে এই অরণ্য, বজ্রাঘাতে যেন পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যাবে—বৃষ্টির কালো মেঘ আঁধার করে তোলে বনরাজ্যকে। বনে ওঠে যত বাঘের হুঙ্কার, ধানক্ষেতে নামে অরণ্যের কালো যমদূতের মত বুনো হাতির পাল। ওদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়—জানে-

প্রাণে শেষ করে দেয় সেই অশুভ আরণ্যক শক্তি !

তাকে আজও মানে—ভয় করে এরা।

তাই বোরাই সর্দারের কথায় ডুংরির সকলেই বলে—

—যাবেক গ ! বনে যাবেক উরা।

সোনাই মুণ্ডা প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল।

জানে ওর প্রতিবাদ এরা মানবে না !

তাই বলে ওঠে সোনাই মুণ্ডা।—তবু যেয়ে কি হবেক ? বনে বনে কেনে ঘুরবেক ?

বোরাই-এর জীর্ণ দেহখানা কেঁপে ওঠে। লাল সিন্দুরমাখা কপালটা শক্ত হয়ে ওঠে ওই প্রতিবাদে।

বোরাই-এর গলাটা ভারি হয়ে ওঠে। এমনি প্রতিবাদ শোনা তার অভ্যাস নেই। এতকাল বোঙার থানে বসে যা বলেছে সে—এখানের মানুষ তাই শুনেছে মুখবুজে।

আজ বোরাই দেখেছে সোনাই মুণ্ডার মুখচোখে কি জ্বালা।

বোরাই সর্দার বলে—যা বলছি কর তুবো। দিখুদের সাথে ভাব করে তু পয়সার লালচ দেখেছিস সোনাই। ইটা ভালো লয় হে। বনে বাস করে বনের কানুন মানতে হবেক।

সোনাই চুপ করে থাকে।

ডুংরির ছেলেদের তাই আর বাধা দেয়নি সোনাই। তবে রেগেছিল আরও তার মেয়ে কুইলিকেও ওদের সঙ্গে যেতে। অবশ্য মেয়েদের অনেকেই গেছে—কুইলিকে তবু যেতে দিতে চায়নি সোনাই। তবু গেছে সে, আর তার রাগটা সেই কারণেই।

বৈকালে বোরাই সর্দারকে এসে হাজির হতে দেখে চাইল সোনাই।

বোরাই তালাস নেয়—উরো ফিরলো নাই ইখনও ?

সোনাই বলে—তাই ভাবছি।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। পাহাড়ঘেরা উপত্যকার বনে বনে আঁধার জমেছে। এ অরণ্যভূমি তখন ভয়াল হয়ে ওঠে। গ্রামবসতটুকু হারিয়ে যায় সেই তমসায়। আদিম অরণ্য স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে জেগে ওঠে।

ভাবনায় পড়ে সোনাই মুণ্ডা।

কয়েকদিন আগেই একটা দলছুট হাতিকে দেখা গেছে বনে বনে ঘুরতে। শয়তান বুনো মোষ আছে—আর আছে ভালুক। মাঝে মাঝে ছু-একজন মারা পড়ে ওদের আক্রমণে।

বোরাই সর্দার বলে—ভাবনার কি আছে হে? এত গুলান জোয়ান রইছে, মুরুংও সাথে গেছে। হ্যাঁ মরদ বটে উ! কুন ডর নাই।

সোনাই মুণ্ডা গর্জে ওঠে—মুরুং কি করবে হে?

হাসে বোরাই সর্দার—লড়বে বটে। উর তীর ভাল্লাকে সবাই ডরাবে। এসে পড়বে ইবার। ছাতা বুরু তো ঢেক পথ।

ছুহাত তুলে বোরাই সর্দার ছাতাবুরুর দেবতার উদ্দেশ্যে জোহার জানায়।

সোনাই বলে—

—আর ইসব চলবেক নাই সর্দার, ছাতাবুরুর দফাও এবার শেষ করবেক ওই কোম্পানী। ওখানে নাকি লোহা-পাথর পেয়েছে। ওখানে বেলাসটিং হবেক।

চমকে ওঠে বোরাই সর্দার—ছাতাবুরুর বোঙা ইসব সইবে নাই গ। দেখে লিও তুমরা।

অন্ধকার স্তব্ধ বনে বনে ধামসা, রেগড়া, টামাক, কুলকুলির শব্দ ওঠে।

ডেন্ সা পটম্—দ্রাম্ গিড়গিড়।

ডেন্ সা পটম্—দ্রাম্ গিড়গিড়—

ওই গুরুগম্ভীর শব্দটা ছাপিয়ে বুনো মোষের শিঙের তৈরী শিঙ্গারে তীব্র সুর ওঠে। ডুংরিতে কলরব ওঠে, ঘর থেকে মেয়ে মদ্দ বের হয়—আইছে গো—আইছে উরা।

আঁধার বন ফুড়ে মশালের আভা ওঠে। সেই আদিম লালাভ আলোয় দেখা যায় বলিষ্ঠ মুরুংকে। হাতে ভল্লা—ওদের কাঁধে ঝোলানো বিরাট হরিণটা। পদশ্রমে ক্লান্ত তবু মুখে ওদের জয়ের আনন্দ। মেয়েরা কলকলিয়ে ওঠে। সেই বিশাল হরিণটাকে নামানো

হল। ছাতাবুরুর প্রসাদ ওটা। ডুংরির সকলেই বের হয়ে আসে।

আর মুরুং আজকের নবনায়ক।

সোনাই মুণ্ডার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। টুয়াই এতক্ষণ চুপকরে আসছিল ওদের সঙ্গে। এবার মালিকের কাছে এসে দাঁড়ায়। সোনাই দেখছে ডুংরির বীর মানুষগুলো বোরাই সর্দারের ভাইপো মুরংকে নিয়ে পড়েছে।

বোরাই সর্দারের চোখগুলো কি আনন্দে ঝক্ঝকিয়ে ওঠে। বুড়োর কেউ নেই তার বংশের একমাত্র টিকে আছে ওই ভাইপো মুরুং—তার ভবিষ্যৎ বংশধর, সর্দার বংশ। এ বনের আদিবাসীদের কাছে ওরা পূজ্য। আজ মুরংই তার মান রেখেছে।

মুরুংকে বুকে জড়িয়ে ধরে বোরাই সর্দার।

টুয়াই এক ফাঁকে সরে যায়। তার মনের গভীরে জ্বালাটা তীব্রতর হয়ে ওঠে। আজ ওকে এরা কেউ চেনে না। কুইলিও সারা পথ তার সঙ্গে কথা বলেনি। এড়িয়ে গেছে তাকে। কুইলি ফুঁসছিল।

—মরদ! উটা একটা শিয়াল!

কুইলিও সারা মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে টুয়াই-এর উপর।

টুয়াইকে ওই মেয়েটা সহ্য করতে পারে না। তার বাবা সোনাই মুণ্ডা যে কেন ওই ছেলেটাকে এত আস্কারা দেয় তা জানে না।

টুয়াই তাদের বসতির কেউ নয়। পাহাড়ের ওদিকে দিখুদের বসতি ওপাশে টুয়াইদের ঘর। ছেলেটা বড়জামদার ইস্কুলে পড়েছিল। হিসাব কিতাবও জানে আর তাই সোনাই মুণ্ডা গুয়ার হাটে গিয়ে ওকে দেখেশুনে নিয়ে আসে এখানে।

টুয়াই ক্রমশঃ এখানে মানুষদের উপরও তম্বি চালায়।

সোনাই মুণ্ডাকে কাঠের কারবারে নামিয়েছে টুয়াই। আর মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে, নাহয় কাঠমহাজনদের ট্রাকে গুয়া—বড়জামদায় যায়। বাবার পাওনা টাকা-কড়িও আদায় করে আনে। কুইলির উপর তাই যেন ওর দাবী আছে। তাই জ্বালাতন করে প্রায়।

সেদিন টুয়াই ওকে খুঁজছে।

কুইলি জানে ছেলেটার মতলব ভালো নয়। পুরুষের চোখের াহনি দেখে কুইলি বুঝতে পারে ওর মনের ভাবগতিক। টুয়াইকে চাই এড়িয়ে চলে মেয়েটা।

সেদিন বর্ষা নেমেছে। মাঝে মাঝে এক একটা কালো মেঘের ল গাছগাছালি ছেয়ে নেমে আসে, পাহাড়ের উপর সেই সাদা মেঘ-গুলো ধোঁয়া ধোঁয়া পুঞ্জের মত এসে জমে গাছের ভিড়ে—বৃষ্টি নামে ারিদিকে আধার করে।

বনে কাড়ান, কুড়কি, দুর্গা ছাতু গজায়। সবুজ লালচে মাটিতে না ধপধপে ওই ছাতুগুলো পদ্মফুলের মত ফুটে ওঠে। কুইলি, সতির আরও ক'জন মেয়ে বের হয়েছিল ছাতু তুলতে। বুনো আমও এখনও ফুরোয় নি। নিশ কালো বিরাট গাছগুলোর ডালে ডালে সেই কাঁচা আমগুলো বাতাসে দোল খায়। ওদের পাথরের ঘায়ে ছিটকে পড়ে।

কুইলি দলছুট হয়ে ছাতু তুলছে, ঝরাটার লালচে মাটি ধোয়া জল নামে, নির্জন বনে ওই জলধারার সুর ওঠে। তখনও থমথম করছে কালো আকাশ। সবুজ ঘন শাল—ধ—আসানগাছের পাতায় জমে থাকা জলকণাগুলো টুপটাপ শব্দ তুলে বনের ঐকাতানে একটি রেশ এনেছে, বর্ষার রেশ। একটা পাহাড়ী ময়না কোথায় যেন ডেকে চলেছে।

কুইলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরণ্যের এই ছায়াঘন রূপের অতলে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ সামনে টুয়াইকে দেখে চাইল।

টুয়াই-এর পরনে দিখুদের মত প্যান্ট, পা দুটো হাঁটু অবধি গুটিয়ে তোলা। টুয়াই বলে।

—কতো খুঁজলম তোকে! দ্যাখ গুয়ার হাট থেকে কি এনেছি বটে।

টুয়াইকে এখানে দেখে ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। আশেপাশে

টুয়াই পকেট থেকে একটা সাদা বড়দানা পুঁতিরমালা বের করে এগিয়ে আসে, ও বলে চলেছে—খাসা সোন্দর মানাবে তুকে।

খপ্ করে টুয়াই ওর হাতটা ধরে এক ঝটকায় কাছে টেনে নেয়, কুইলি এমনি আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। অতর্কিত টানে ওর গায়ে পড়েছে, ছোট কাপড়খানা সরে গেছে, শালবনের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে আসা একফালি আলোর ওর নিটোল অনাবৃত ভরাট দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর টুয়াইও বনের ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে—যেন পিষে ফেলতে চায় তাকে। ছিটকে পড়বে কুইলি আর ওই ভুবুক্ষু জানোয়ারটা ওর বেবশ দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে সবকিছু লুটে নেবে?

কুইলি চমকে উঠেছে—এ্যাই টুয়াই—টুয়াই!

ছেলেটা যেন এক জানোয়ারের মত রক্তলোভী হয়ে উঠেছে। কুইলির সারা দেহ অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণ শক্তিতে মেয়েটা রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে অবলম্বন খুঁজছে, হঠাৎ বৃষ্টির জলে আলগা হয়ে যাওয়া একটা পাথরের টুকরো হাতে পড়তে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরশক্তি দিয়ে কুইলি আঘাত করে টুয়াই-এর কপালে, পর পর আঘাত করেছে—হাতে ভিজে রক্ত লাগে মেয়েটা ওই রক্তের ছোঁয়ায় যেন ক্ষেপে উঠেছে।

টুয়াইও এই আঘাতের জন্য তৈরি ছিল না। কপালেই লেগেছে পাথরটি—রক্ত গড়িয়ে পড়ে। চোখটা যেন ঢেকে আসছে। ওর হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে যেতেই লাফ দিয়ে সরে যায় কুইলি।

বনের ঢালু পাহাড়ী পথে তাড়া খাওয়া হরিণীর মত ছুটছে মেয়েটা

…সেই ঘটনাটা আজ মনে পড়ে কুইলির। টুয়াই অবশ্য বসতিতে কিছু বলেনি। কুইলিও সেদিন চেপে গেছল ব্যাপারটা। কিন্তু সেদিন থেকেই মেয়েটা বদলে গেছে। সে দেখেছে বসতির অন্যান্য ছেলেদের। মুরুংকেও দেখেছে।

বলিষ্ঠ সতেজ সারজম দারু—শালগাছের মত ঋজু দেহ। বোরাই সর্দারের ভাইপো। ওই ছেলেটাকে দেখে মনে হয়, টুয়াই-এর থেকে

ও অনেক ফারাক ! এত লোভী—নীচ নয় ওই মুরুং ।

আজ ছাতাবুরুতে দেখেছিল ওই ছেলেটির বলিষ্ঠতা। মরদের মত রুখে দাঁড়িয়েছিল ভল্লাহাতে দলের নিরাপত্তার জন্য, আব ওই লোভী টুয়াই তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠেছিল।

....রেগড়া টামাকে সুর ওঠে। কুলকুলিটা চড়া সুরে বাজছে। রাতের অন্ধকার অরণ্যের মাঝে মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ ওঠে। বোঙার থানে ছাতাপরবের নাচ গান শুরু হয়েছে।

তাদের উৎসবের পবিত্রতামণ্ডিত সুরে টেমকি বাজছে দান্‌সা পটম্, তাম গুড় গুড় !

ডুংরির ছেলেমেয়েদের যেন ডাকছে ওই মাদলের শব্দ, বাঁশীর সুর।

এ কোন্ আদিম আরণ্যক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠার সুর নিয়ে ওই শব্দটা প্রকৃতির নির্জন অসীমে ছড়িয়ে পড়ছে।

গহণ অরণ্য, শাল তামাল মহুয়া গাছের জটলা, অন্ধকার ঘনতর হয়ে ওঠে পাহাড়। বনে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কটরা—সম্ভরের ডাক।

বোঙার থানে কয়েকটা তেলের মশাল পোঁতা হয়েছে। লালচে আলোর আভা ওঠে, কাল্‌চে ধোঁয়া, ওই আলোর আভায় দেখা যায় সারবন্দী ছেলেমেয়েদের। মাঝখানে মাদল বাজাচ্ছে কালো পাথরকুঁদা দেহ নিয়ে মুরুং। মশালের আলোর সঙ্গের পাথরের মূর্তি বলে মনেহয়।

বনের কলাগাছ, শালকাঠ পুড়িয়ে ক্ষার তৈরি করে তাই দিয়ে কাপড় কাচে এরা। সাদা শাড়িতে বলিষ্ঠ দেহের রেখাগুলো সোচ্চার। নাচের তালে তালে কাঁপছে ওর দেহ। মাথায় গুঁজেছে কূর্চি—বনগুলঞ্চ-লালবরণ ফুলের থোকা।

রাতেব অন্ধকারে ওদের সুরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে নির্জন বনরাজ্যে।

নিত পউড়ি তাড়াম্ তাড়াম্।
বার পউড়ি তাড়াম্ রে
তায়ম সেতেন ক্যাস্মু রুসাদ
চেলে চেলেকো মেনা কাতাম।

প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকা গৃহত্যাগ করছে। রাত্রির অন্ধকার

নেমেছে প্রেমিকা একবার সামনে আবার পিছনের দিকে চাইছে, তবু কি মায়া কাটানো দায়। এক পা সামনের দিকে চলেছে—অন্য পা যেন পেছনের দিকে তাকে টানছে।

এ তাদের যৌবনের কামনার গান।

প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে তাদের জীবন কাটে। অরণ্যের নির্জনে তাদের দিনগুলো আসে শৈশবে, কৈশোরে—কৈশোর থেকে মত্ত যৌবন নিয়ে। প্রকৃতির বুকেও আসে নব কিশলয়ের জন্ম—একটা গাছ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। তার শৈশব-কৈশোর থেকে আসে যৌবন। পাতা ঝরে আবার নতুন পাতা আসে। তাদের কাণ্ডের গভীরে এই বর্ষ-চক্রের চরণচিহ্ন আঁকা হয়ে যায়। ক্রমশঃ সেই ছোট্ট গাছটা সতেজ দীঘল কাণ্ড নিয়ে মুক্ত আকাশে মাথা তোলে, বনস্পতিতে পরিণত হয়। তাদের শাখায় শাখায় আশ্রয় নেয় পাখীর দল। গান গায়—প্রেম নিবেদন করে, বংশবৃদ্ধি করে তারা।

এই মাটিতেও আসে শস্যের ইশারা—পূর্ণতার ইঙ্গিত। গ্রীষ্মের জাবদাহের পর নামে কালো মেঘের দল আকাশ ছেয়ে ছেয়ে। আবার বৃষ্টিতে ধরণী হয় উর্বরা—ঋতুমতী। আসে ফসল বোনার পালা।

—এখানের যৌবনও তাই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায় নারী পুরুষের মন জানাজানির পালা—বংশ বৃদ্ধির স্বপ্ন জাগে ওদের মনে প্রকৃতির নিয়মে ওরা তাই জেগে ওঠে।

দ্রিম্ দ্রিম্—মাদল বাজে। ঝড়ে কাঁপা শালবনের মত যৌবনোদ্ধত মেয়েরা এ ওর কোমর ধরে নাচছে, মাদলের তেহাই-এ ওদের ঘাড় পিছলে হেলে গিয়ে উদ্ধত নিটোল বুকের রেখাগুলো দুর্বার হয়ে ওঠে

ওই নাচের মত্ততায় ওরা আদিম রাত্রির অন্ধকারে মাতন এনেছে।

পাহাড় বনে রাত্রি ঘনিয়ে আসে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছেলেমেয়েদের মানুষগুলোর সারা মনে মদের জড়তা। ওদিকে গাছের ডালে টাঙ্গানো ছিল বিরাট হরিণের দেহটা—নীচে আগুন জ্বেলে ওটাকে ঝলসানো হয়েছিল, সবটাই ফুরিয়ে গেছে, পা-টা ঝুলছে গাছের ডালে—নীচেকার কাঠের আগুনও নিভে গেছে। শুধু কামনার উত্তাপ নিয়ে গন্ গন্

করছে কাঠকয়লার নিভু নিভু আগুন। মদের হাঁড়িগুলো শূন্য।

এখানে-ওখানে গড়িয়ে পড়েছে নিদ্রামগ্ন কিছু বেবশ মানুষ, দু-একজন তখনও গাছে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

মুরুং আর কুইলি ফিরছে ঘরের দিকে। কুইলিকে পৌছে দিয়ে মুরুং ঝোরার ধারে তাঁর নিজেদের ঝুপড়ির দিকে যাবে। কুইলির দুচোখে নেশার জড়তা। ওর প্রচণ্ড দেহমনে কি সাড়া জাগে। মুরুং দেখছে ওকে।

—অ্যাই। কুইলির বেবশ দেহে কি উত্তেজনার সাড়া।

কুইলি যেন চলতে পারে না। মুরুং-এর নিটোল দেহটাকে জড়িয়ে চলেছে সে। মুরুং-এর সারা দেহ মনে যেন ঝড় উঠেছে। ওই উত্তপ্ত ছোঁয়া—কুইলির মাতলাকরা হাসি এই নির্জনরাত্রির পরিবেশে মুরুং-এর সব চেতনাকে যেন বিভ্রান্ত করেছে।

কিন্তু মুরুং জানে কুইলির বাবা সোনাই মুণ্ডা এ দিগরের মস্ত লোক। তার তুলনায় মুরুং-এর কিছুই নাই। দিনমজুরিও করতে হয় তাকে ওই সোনাই মুণ্ডার জমিতে—কাঠের কাজে। নিজেদের বংশের নামটাই আছে। বোরাই সর্দারের ভাতিজা—সর্দারের বংশ।

একদিন এই অরণ্য পর্বতে তাদের পূর্ব পুরুষেরাই রাজা ছিল। আজ সব হারিয়ে গেছে তাদের নতুন দিন বদলের পালা বনের ভিতরেও এসেছে চুপে চুপে। সোনাই সেখানের প্রথম পুরুষ। এদের কোন পরিচয় প্রতিষ্ঠা আজ নেই।

মুরুং-এর কাছে ওটা যেন একটা পরিহাসের ব্যাপারই বলে বোধহয়। তাই কুইলির দিকে এগোতে চায়নি সে।

বাধা দেয়—এ্যাই কুইলি? না-নারে: ই ঠিক লয়।

গোড়াবুরুর শালবনের মাথার আকাশে চাঁদ ঢলে পড়েছে। তারাগুলো সব স্থির হয়ে যায়। রাতের বাতাসে ভেসে আসে কটরা হরিণের ডাক, কোথায় হাড়গুম পাখী কঁকিয়ে উঠলো। কুইলি দুহাত দিয়ে মুরুংকে কাছে টেনে নিয়ে ওর দেহটাকে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে বলে, —ডরে যি সিটিয়ে গেলি মরদ? তখন তো বনের বাঘকে হাঁকড়ে

উঠলি, এখন? এত ডর্ তুর!

মুরুং দেখছে কুইলিকে। ওর দুচোখে তারার ঝিলিক। যৌবন-মদির দেহের উত্তাপ মুরুং-এর বলিষ্ঠ দেহে মাতন এনেছে। ওর সারা দেহে একটা তীব্র মাদকতা—মনে হয়, কঠিন নিষ্পেষণে মেয়েটাকে সে গ্রাস করবে।

তবু মুরুং মনের অদম্য কামনাটা চেপে থাকে। সে ভয়ও করে তাকে। কুইলি নয়—সামনে যেন সারান্দার কোন বাঘিনীকেই দেখছে সে।

কুইলির সারা অণুপরমাণুতে চাঞ্চল্য জাগে, সগুজাগর নারীমন আজ এই রাতনির্জন প্রকৃতির উদার স্তব্ধতায় নিজেকে পেতে চায়, পেতে চায় অনেক কিছু।

মুরুং বলে—রাত শেষ হয়ে আসছে। ডুরখা ইপিল উঠলো রে। ঘরকে যা।

শুকতারা উঠেছে আকাশে। কুইলি আজ যেন বদলে গেছে: ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে মেয়েটা!

—ওই ডুরখা ইপিল সাক্ষী থাকলো মুরুং—আমি তুকে ভালোবাসলম, তু আমার জামরাগ বটিস্ হে। ধরম সাক্ষী—

চমকে ওঠে মুরুং—কুইলি? ই কি বলছিস?

....কুইলির দুহাতের বাঁধনে আজ যেন চিরদিনের জন্য বন্দী হয়ে গেছে মুরুং-এর বলিষ্ঠ দেহটা। শিশির-ভেজা ঝরাপাতার বুকে ওদের যৌবনমত্ত দেহ দুটো এক হয়ে গেছে। টুপটাপ শিশিরবিন্দু ঝরার নিঃসঙ্গ শব্দ ওঠে বনরাজ্যে—বাতাসের সুরে মিশছে দুটি মানুষের বুকভরা তৃপ্তির নিঃশ্বাস। কি পূর্ণতার গভীরে হারিয়ে গেছে দুটি মানবিক সত্বা প্রকৃতির এই অখণ্ড বৈচিত্র্যভরা স্তব্ধতার রাজ্যে দুটি চেতনা কোন গভীরে অবলুপ্ত হয়েছে।

...টুয়াই চমকে ওঠে। ওদের কথা শুনে।

তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ওই দৃশ্যটা। তারার আবছা আলোয় টুয়াই জেগেছিল। ওই নাচের আসরে সে যায়নি, সন্ধ্যার

পর নিজের ঝুপড়িতেই বসেছিল, অবশ্য টুয়াই শুধু শুধু বসে থাকেনি। চোলাই মদের অভাব তার নেই। তাই গিলেছে।

বাইরে ওই বোঙার থান-এর দিক থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসে, ওদের গান শুরু হয়েছে। দেখেছে টুয়াই কুইলিকেও সারি-সোয়াঁদের সঙ্গে সেজে বের হয়ে যেতে।

টুয়াই-এর দিকে ও চাইল না। কুইলি যেন চেনে না ওকে। টুয়াইও গুম হয়ে বসে থাকে, মনের রাগটা চেপে। সোনাই মুণ্ডাকেও দেখেছে টুয়াই!

লোকটা চায়নি কুইলি যাক ওই আসরে, কিন্তু বোঙার দোহাই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। বোরাই সর্দারকে না মানলেও— তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সোনাই মুণ্ডা তার সব প্রতিষ্ঠা দিয়েও। টুয়াই আনে এসব খবর।

তাই মুরুংকেও সোনাই মুণ্ডা দেখতে পারে না। চুপকরে সহ্য করে তাকে।

…রাত নেমেছে।

টুয়াই-এর সারা দেহমনে মদের নেশা কি তীব্র জ্বালা ধরিয়েছে। ঘুম আসে না। টুয়াই বের হয়ে আসে।

চারিদিকে স্তব্ধ অরণ্য। আঁধার নামবে অরণ্যভূমিতে। টুয়াই শুঁড়ি পথ ধরে এগিয়ে যায়—বোঙার থানের দিকে। ভিজে ভিজে গন্ধ জাগে বাতাসে। একটা খরগোস ওকে দেখে লাফ দিয়ে বনে ঢুকে গেল। স্তব্ধতা নেমেছে।

ওদের গান থেমে গেছে। বোঙার থানে পড়ে আছে কয়েকজন, নেশার ঘোরে অচৈতন্য না ঘুমুচ্ছে ঠিক বোঝা যায় না।

মুরুং-কুইলির দেখা নেই, টুয়াই অবাক হয়! ফিরছে সে, হঠাৎ ঝোপের ধারে কাদের কথা শুনে চাইল, দুচোখ রগড়ে নিয়ে চমকে ওঠে টুয়াই।

আবছা অন্ধকারে এই শিয়াল যেন ঝোপের আড়াল থেকে চেয়ে দেখছে ওদের। টুয়াই-এর দুচোখ জ্বলে ওঠে কি প্রতিহিংসার জ্বালায়।

কুইলির উছল হাসির শব্দ শুনেছে, দেখেছে তার দুচোখ কি বাঁধন-হারা মত্ততা। মুরুং-এর বলিষ্ঠ দেহটাকে ঘিরে আজ মেতে উঠেছে মেয়েটা—যেন বাতির আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে একটা রঙিন প্রজাপতি কি দুর্বার কামনার জ্বালায়।

দুটো দেহ এক হয়ে যায়, ভিজে ঝরাপাতার বুকে ওঠে তৃপ্তির শিহর। টুয়াই তার নিজের সর্বনাশটাকে স্বচক্ষে দেখেছে। মনে হয় লাফ দিয়ে পড়বে, দুহাত দিয়ে মুরং-এর কণ্ঠনালী টিপে ধরে ওকে শেষ করে দেবে।

কিন্তু পারে না—মুরংকে আজ ভয় করে সে। জানে ওর শক্তির পরিচয়। টুয়াই সরে এল।

তখন কি উত্তেজনায় কাঁপছে ওর সারা দেহ। একটা ধূর্ত শিয়াল যেন বাঘের শিকার ধরা দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছে।

ঘুমোয়নি সোনাইমুণ্ডা।

আজকের ওই বোরাই সর্দারের ব্যাপার—তার অনুশাসনটাকে মানতে চায়নি সোনাই। আজ তার দিন বদলাচ্ছে, ও দেখেছে ওই সর্দার বোঙা আর কিছু মানুষ কোন অজানা ভয় দেখিয়ে এই আদি-বাসীদের পদে পদে বাধা দিয়েছে এগিয়ে যেতে। ওদের অন্ধকারেই রেখেছে নিজেদের কুসংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে, সোনাই-এর প্রতিষ্ঠা সেখানে বাধা পেয়েছে।

সোনাই মুণ্ডা চেয়েছিল এই বাধাগুলোকে ভাঙ্গতে আর নিজের স্বার্থে ওই মানুষগুলোকে তার পায়ে মাথা নীচু করাতে নতুন এক প্রয়োজনের চেতনাবোধ দিয়ে। সেটা হচ্ছে টাকা, কিছু পাবার লোভ। সেই লোভে ওরা সোনাইকে শ্রদ্ধা জানাবে।

সোনাই মুণ্ডা বনের সীমানার বাইরে বড়জামদা, বড়বিল, গুয়া- তু, একবার চাইবাসা সহরেও গেছে। দেখেছে অথের প্রাচুর্য একশ্রেণীর লোক সেখানের অনেক কিছু লুটে নিচ্ছে।

তার মহাজন বিমলপ্রসাদজীকেও দেখেছে। লোকটা দেখতে

দেখতে যেন ফুলে ফেঁপে টাকার কুমীর হয়ে উঠেছে। পাহাড় ফাটিয়ে লোহাপাথর তুলছে—বনের তামাম লগ্ কাঠ নিয়ে গিয়ে ট্রেনে চালান দিচ্ছে, বিরাট প্রাসাদই তুলেছে প্রসাদজী—গাড়ী—ট্রাক—বাড়িতে, বাতাসে গান ভেসে আসে, যন্ত্রে সুর বাজে ওর বাড়িতে। সোনাই-এর মনে ওই সব পাবার স্বপ্ন জাগে।

বিমলপ্রসাদজী বলে —রুপেয়া সোনাই, রুপেয়া কামাই করো। দেখবে সবকোই তুমাকে পচাহানবে, মানবে। জামানা বদল গিয়া আভি।

সোনাইও ভেবেছিল টাকার লোভে সকলেই আসবে তার কাছে। এ বনের সব কিছুর নায়ক হবে সে।

ডুংরি এ বনের আরও বসতির সবাই তাকে মানবে। তাই সোনাই এখানে লোক লাগিয়ে বনের কেন্দুপাতা তোলার ইজারা নিয়েছে। কাঠমহাজনদের কাজের লোক যোগান দেয়, বনবিভাগ থেকে ব্যবস্থা করে নিয়েছে জমিজারাত। কিন্তু তবু দেখেছে এখানের মানুষগুলো যেন কোথায় আদিম, বন্যই রয়ে গেছে।

হাঁড়িয়া পেলে সেদিন বেদম গিলে পড়ে থাকে ঝুপড়িতে, কাজেও যাবে না। মুনিমজী বকাঝকা করে—তামাম পাত্ত পড়া হ্যায়, খারাপ হো যায়েগা।

ওরা কোন্ পরবের গন্ধ পেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়েছে মদের ঘোরে, তাই জবাব দেয়—নাই যাবো গ !

ওদের পরনে একটু মাত্র কাপড়, আর খাবার বলতে ওই ভাত, সঙ্গে নুন, ঘরের গাছের কাঁচা-লঙ্কা। তার বেশী আর প্রয়োজন নেই। তাই ওরা স্বাধীন।

সোনাইও জানে সেই স্বাধীনভাবেই থাকতে চায় তারা।

টুয়াইকে তাই রেখেছে সে যেন ওই আপনভোলা অল্পে তৃপ্ত অদিবাসীদের সামনে বিলাসময় জীবনের ইঙ্গিত হিসেবে। টুয়াই প্যাণ্ট জামা পরে, জুতা পরে মশমশিয়ে হাঁটে—সিগারেট খায়। আর দাপটের সঙ্গেই চলা ফেরা করে। যাতে ডুংরির ছেলেদের ওই জীবনে মোহ আসে।

কিন্তু তাতে ওই বোরাই সর্দার বলেছিল,—বসুমতীর বুকে চাষের লাথি মারবা নাই হে ছুকরা। উসব ঝলর-মলর পুষাক কি পরো ইখানে? ....সোনাই সেখানেও ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে তাদের সামাজিক ব্যাপারেও। তার কোন নির্দেশই ওরা মানে না।

সেদিন গিরি হো সোমত্থ বৌটা নয়াবসতির কানাই-এর সঙ্গে ভেগে গেল। কানাইটাকে কাজ দিয়েছিল সোনাই মুণ্ডা। টুয়াইকে সেও মানতো।

ওদের পালানো নিয়ে হৈ চৈ হয়ে গেল ডুংরিতে। সোনাই বলে,—কি এমন খারাপ কাজ করেছে কানাই? উরা ফিরে আইল, বিহাসাদী দিয়ে দে।

গর্জে উঠে বোরাই সর্দার। সমবেত হয়েছে তারা বৃদ্ধবটের নীচে ওই প্রশ্নের বিচার করতে। গিরি হো অভিযোগ এনেছে। —কানাই জোর করে মেয়ের ধরম লিছে। একজনের ঘর ভাঙ্গিছে, উর বিচের হবেক।

খানিকটা তাই-ই ঘটেছে। কানাই মদ খেয়ে সেদিন মেয়েটাকে একা পেয়ে কাণ্ডটা বাধিয়ে তাকে কাঠের ট্রাকে তুলে ফুঁসলে নিয়ে যায়। ক'দিন পর ফিরেছে।

কাঁদছে মেয়েটা। সমবেত জনতাও এটাকে ঠিক সহজে মেনে নেয়-নি। কিন্তু সোনাই মুণ্ডার আশ্রিত ওই কানাই। তাই সোনাই মুণ্ডা বলে—বিহাসাদী হোক। আমি পাঁচগণ্ডা টাকা দিব। গিরি উকে ছেড়ে দিক।

স্তব্ধতা নামে বৃদ্ধবটের নীচে। কালো পাথরগুলো মাথা তুলেছে এখানে। বসতির বৌ-ঝিরা সাঁঝপিদীম জ্বেলে যায়। পবিত্র এক বনস্পতির এই মাটি পাথর স্পর্শ করে ওদের জীবন বয়ে যায়। মৃত্যুর দিনেও এই মৃত্তিকায় অভিষেক করে ওরা শেষকৃত্য করে। এ তাদের পরম তীর্থ—ওই বৃক্ষ তাদের দেবতা। বহু ঝুরি নেমেছে, ওগুলো যেন সমাজের শাসন-বন্ধনের প্রতীক। ওর উপরই এই কাণ্ডটা—ওই ছায়াঘন বনস্পতিরূপী হো—মুণ্ডাসমাজের মূল গভীরে প্রোথিত।

এর নীচে ওরা সমবেত হয়েছে।

সোনাই মুণ্ডা যেন এখানের প্রধান এবং প্রথম ব্যক্তি। তার ওই বিধান শুনে এরা ঠিক খুশী হতে পারেনি। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসও এদের নেই।

হঠাৎ বোরাই সর্দার বলে—ইটি ক্যামন হলো? ঘরের বৌ মেয়ের ধরম লিবেক, আর জোর করে বিহা করবেক, তিন মাস পর ছেড়ে দিয়ে বেওরা করে দিবেক, সাতাশীর ইকি বিচের হে?

সকলেই এবার সমর্থন জানায় সর্দারকে কথা বলতে দেখে—লায্য কথা বটে!

তোকি বুড়িও বসেছিল একপাশে। এই ডুংরিতে তার দীর্ঘ ষাট-সত্তর বছরের জীবন কেটেছে। সে দেখেছে তখন চারপাশে গহন বন, দিনের বেলাতেই আঁধার ছম ছম করতো, বুনো হাতি, ভালুক দেখা যেতো আশপাশে, তার মরদটাকে বুনো দাঁতাল হাতিতে মেরেছিল। তোকি বুড়ি দেখেছে এখানের সমাজ, এখানের সেই আদিম জীবন আর মানুষগুলোকে।

আজ সে জানে ছাতাবুরু—তাদের বর্ষার বোঙা, ফসলের রাজা।

ওই মাদনা বোঙা, কুদ্‌রো বোঙা, তাদের রক্ষক! এই আদিম বট-বৃক্ষমূলে আছে তাদের শিকারের দেবতা।

…আহার যোগান তিনি, বসুমতী শেতলা হয়—ঝর্ণার ক্ষীরধারা বয় ওদেরই দয়ায়। ধরম বোঙার দয়ায় তাদের জীবনে শান্তি নামে। তাই আইন-সংস্কার ধরম মানতেই হবে।

তোকে বুড়ি এবার বলে—হায় হায়, ইটা কি বলছিস সোনাই? একজনের ঘর ভাঙ্গবেক, বৌ মাইয়ার ধরম লিবেক—তু বলিস বিহা দে! এখনও আত দিন হচ্ছে, ঝোরার ধারা বইছে—বসুমতী ফল ফসল দিছে, ধরম মানব নাই গ? ই বাবা গ?

সোনাই মুণ্ডা দেখছে তার কথা ওরা মানতে রাজী নয়।

সেই অন্ধকার যুগের প্রতিভূ যেন ওই বোরাই সর্দার। কপালে লালমাটির প্রলেপ, জীর্ণ ভাঁজপড়া মুখে বয়সের চিহ্ন, চোখদুটো তবু

কি তেজে জ্বলছে। বোরাই সর্দার বলে ওঠে,

—কানাইকে দণ্ড দিতে হবেক।

সমবেত জনতাও সমর্থন করে—হ—হ গো।

সোনাই মুণ্ডার মুখের উপর বোরাই সর্দার ঘোষণা করে সাতাশীর সামনে তার বিধান।

—তিন মাস উ ডুংরীতে ঢুকতে পাবেক নাই। হঠা বাহার থাকবেক ইদিকে। কারো সাথে উর লাগাড় থাকবেক নাই।

সোনাই মুণ্ডাকেই ওরা যেন এই নির্বাসন দণ্ড দিল। সমবেত জনতা বলে—

ঠিক কথা হে. হঠাও ওই বুনমেগোটাকে এদের সমাজে অনাচারী অত্যাচারীর ঠাঁই নেই।

এই কথাটাই ওরা ঘোষণা করে সোনাই মুণ্ডার উপর। ওরা জানিয়ে দেয় সোনাই মুণ্ডা টাকার জোরে তাদের এই স্বাধীনতা-সংস্কার তাদের প্রতিষ্ঠাকে হঠাতে পারবে না। সমাজের অনুশাসনের কাছে তার এই প্রতিষ্ঠার দাম নেই। ওরা অগ্রাহ্য করে সোনাইকে। সোনাই গুম হয়ে রইল বিচারের রায় শুনে।

সোনাই মুণ্ডা সেদিন থেকেই মনে মনে কঠিন হয়ে উঠেছে, ওই সমাজের জীর্ণ কাঠামোটা—ওদের এই আরণ্যক জীবন বদলাবেই। সেইই আঘাত হানবে।

সোনাই মুণ্ডা ওদের ওই কাজ, ওই নীতি, সংস্কার মায় স্বাভাবিক দিনযাপনের অনুষ্ঠানগুলোকেও সহ্য করতে পারে না।

ওই ছাতাপরবের অনুষ্ঠানে নিজের মেয়ে কুইলিকেও ওদের সঙ্গে সামিল হতে দেখে তাই চটে উঠেছিল, রাগটা প্রকাশ করতে গিয়েও পারেনি। তবু মনে মনে জ্বলছে সোনাই মুণ্ডা। আজ সেই রাগটা বেড়ে উঠেছে।

ওই বোরাই সর্দারের ভাইপোটাকে দেখতে পারে না সোনাই। মুরুং যেন নীরব একটা প্রতিবাদ। সোনাই মুণ্ডার ক্ষেতের চাষীদের ধান মকাই-এর ভাগ নিয়ে এবার মুরুংই গোল বাঁধিয়েছিল। ওরা

একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে।

—তিন ভাগের এক ভাগ ফসল চাই হে। নাহলে চষবই নাই কুন জমি।

সোনাই রাগে জ্বলে ওঠে।—দিব নাই।

কিন্তু বাধ্য হয়েই সোনাইকে তাই দিতে হয়েছিল।

সেই তেজী ছেলেটা ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে, তার কাজের প্রতিবাদ করছে ওরা মুরুং-এর সমর্থনে। ওই বোরাই সর্দার—মুরু: তার প্রতিপক্ষ। সোনাইকে হার মানতে হয়েছে ওদের কাছে।

সোনাই মুণ্ডা ধীরে ধীরে এবার তৈরি হচ্ছে। ওদের এসব কাজেরই জবাব সে দেবে।

কুইলি এখনও ফেরেনি। সোনাই মুণ্ডা জেগে আছে, পরবতলায় ওদের গানের সুর থেমে আছে, তখনও ফেরেনি মেয়েটা। সোনাই নীরব রাগে ফুলে ওঠে। তার বোনই এখন সংসারের কর্ত্রী, সোনাই মুণ্ডার স্ত্রী গত হয়েছে বছর তুয়েক হ'ল, ওই একমাত্র মেয়ে কুইলিই এখন তার সব।

মেয়েটাকে সে এখানের বাইরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু বোনের প্রতিবাদেই পারেনি।

সোনাই-এর দিদি মিতিনই নিষেধ করেছিল—একটা মেয়ে তাকেও ছেড়ে থাকবি তু? পাঠাই দিবি হ দিখুদের উখানে? বোরাই সর্দার বলে—বোঙার শাপ লাগবেক মেয়েটোকা উখানে পাঠালে?

সোনাই বোরাই সর্দারের কথা উঠতে জ্বালাভরা স্বরে প্রতিবাদ করে!

—চুপ দে। বোরাই সর্দার ইখানে কথা বলে কেনে? আমার বিটির ভালোমন্দ আমি বুঝবো।

কিন্তু মিতিন তবু জানায়—ঘরটো খালি হই যাবেক! কি লিয়ে, কাকে লিয়ে থাকবি তু বল? তারপর দিখুদের উখানে যেয়ে মেয়েটো যদি বিগড়াই যাই—আর আসবেক ইখানে? এই বনে? বল!

কথাটা ভেবেছে সোনাই। কুইলিকে বাইরের তার আত্মীয়দের কাছে রেখে পড়ালেখা শেখাবার ইচ্ছাটাকে আপাততঃ চেপে রেখেছিল। কিন্তু কুইলি এখানে ওই বন্যজীবনেই মিশে থাকতে চায়।

আর তার কারণটাও অনুমান করেছে সোনাই। আজ যেন তেমনি কিছু দেখেছিল সোনাই।

কুইলি এখনও ফেরেনি। রাত অনেক হয়ে গেছে। নির্জন অন্ধকারে সোনাই-এর মনে হয় যেন একটা চক্রান্ত চলেছে তাকেই চরম আঘাত হানার জন্যে। ওদের কিছুই নেই—সোনাই এখানে অনেক পেয়েছে। তাই তার লালসা লোভও বেড়েছে। কুইলির ব্যবহারেও চটেছে সে।

সোনাই মুণ্ডার বয়সও তেমন বেশী নয়, আর শক্ত সমর্থ, কঠিন। বৌও মারা গেছে ক'বছর, বিয়েথাও করেনি আর সোনাই।

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চাইল সোনাই।

অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ ওঠে। কাঁঠালগাছে মুচি এসেছে। কাঁঠাল ফুলের তীব্র সুবাস রাতের ভিজে বাতাসকে ভারি করে তুলেছে, তার সঙ্গে মিশেছে ল্যাণ্টানা—বনচাঁপা ফুলের খোসবু, তারাগুলো ঝকমক করে, বহু দূর দিগন্তে আকাশছোঁয়া পাহাড়সীমায় গুয়াখনির একটু আলোর আভা দেখা যায়। ওই তাদের সভ্যজগতের আলোর নিশানা—কি নির্মম চাহনি নিয়ে আদিম দিগন্ত বিস্তৃত বনরাজ্যের দিকে চেয়ে আছে অনেকটা স্তব্ধ চাহনি মেলে।

....ওই পায়ের শব্দ ওই হাসিটা চেনে সোনাই মুণ্ডা। কত বিনিদ্র রাতে ওই হাসি তার সারা মনে ঝড় তুলেছে। মাতন এনেছে সোনাই বলিষ্ঠ দেহে দু রাতের স্বৈরিণা সোয়ী।

চাইল সোনাই, এগিয়ে আসে সোয়ী!

তারার আলোয় দেখা যায় ওকে। যৌবন পার হয়ে গেলেও এখনও সেটাকে ধরে রেখেছে মেয়েটা। কালো পাথরকোঁদা নিটোল দেহ. মতি মুণ্ডার বৌ সোয়ী—নামেই বৌ। মতিও সেটা জানে।

লোকটা রোগে ভুগে ভুগে জীর্ণ হয়ে গেছে। সেবার ভালুকের

হাতে পড়েছিল মতি। ভালুকের থাবায় মতির গালের একটা দিক ঝলে পড়েছে, হাতটা পঙ্গু। মতির বৌ সোয়ী বলে ওকে—দানো রে তুই!

এককালে মতি দানোই ছিল, এখন তার কঙ্কাল মাত্র। সোনাই মুণ্ডার দয়ায় তার ক্ষেতে পাহারা দেয়। ধানের ক্ষেতে টিয়ার দল নামে—সেইই পাখী তাড়ায়। আর রাতের বেলায় গাছের টং-এর কুঁড়েতে বসে পাহাড় বন থেকে নেমে আসা হাতির পাল দেখলে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে মশাল জ্বেলে চীৎকার করে গ্রামবসতে খবর দেয়—হো হো হোই হাথি বটে হে—

...আর সোয়ী, বলিষ্ঠ মাতাল করা মেয়েটা—তখন রাতের অন্ধকারে সোনাই মুণ্ডার বিছানার কবোষ্ণ পরিবেশে এসে ঢোকে। ওর কঠিন দেহটা তখন সোনাই-এর নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়ে।

....আজও এসেছে মেয়েটা এই রাত গহণে।

ছাতাপরবের নাচের আসরেও ছিল। মদ গিলে আজ মাতাল হয়ে এসেছে সোয়ী।

সোনাই দেখছে ওকে। তারা জ্বালা আলোয় ওর নিটোল দেহের মাদকতা ফুটে ওঠে।

সোয়ী বলে ফিসফিসিয়ে—ঘরকে যাবা নাই গ? চলো!

অন্যদিন এই আদিম আহ্বানে মেতে ওঠে সোনাই। কিন্তু আজ সোনাই-এর মনে ঝড় উঠেছে। মেয়েটা তখনও ফেরেনি। কুইলির জন্য ভাবনা হয়।

সোয়ী বলে—ভাবছো কি গ?

সোনাই মুণ্ডা তখন মেয়ের কথা ভাবছে।

—কুইলিকে দেখলি উথানে? সোনাই শুধোয়।

সোয়ী হেসে ওঠে। সারা শরীর কাঁপে সেই হাসির মাতনে। আদুড় গা, বুকে পাহাড়ের কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

সোয়ী বলে—ওই দামাল মেয়েটার খিদে নাই? মেয়েগুলানের খিদের জ্বালাটা বেশী গ।

সোয়ীর হাতখানা এসে পড়েছে সোনাই-এর গায়ে। ওর সারা

মনে কি দুবার জৈবিক ক্ষুধা। সোনাই তবু কুইলির কথা ভেবে আজ জ্বালাটাকে থামিয়ে রাখে। এ যেন তার কঠিন পরাজয়।

হঠাৎ অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পেয়ে সোয়ী সরে গেল খড়গাদার ওদিকে, সোনাইও দেখছে ওই ছায়ামূর্তিটাকে।

কুইলি নয়—টলতে টলতে আসছে টুয়াই। সেও যেন সোনাইকে খুঁজছিল।

—কি হে? সোনাই এগিয়ে আসে।

বলে ওঠে টুয়াই—একবার এসো দিকি মালিক। লিজের চখে দেখ গা। এসো হে!

টুয়াই সোনাই মুণ্ডাকে যেন জোর করে নিয়ে চলেছে ওই ঝুপি বনের দিকে। সোয়ীও পিছনে পিছনে চলেছে সাবধানী পা ফেলে। ব্যাপারটা তাকেও দেখতে হবে। স্বৈরিণী মেয়েটা চলেছে তাই।

মুরুং আর কুইলি যেন এক নতুন চেতনার অতলে হারিয়ে গেছে। দু'জনের দেহটা তখন নিবিড় বাঁধনে বদ্ধ। ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত—নিঃশেষিত প্রায় তারা।

…হঠাৎ চমক ভাঙ্গে মুরুং-এর।

দু'জনেই চমকে ওঠে। বনের প্রাণীদের পায়ের শব্দ তারা জানে, হঠাৎ যেন কিসের শব্দ শুনেছে তারা স্তব্ধতার মাঝে। …সরে যাবার আগেই হঠাৎ ওই সোনাই মুণ্ডাকে দেখে চমকে ওঠে মুরুং। কুইলিও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে।

সোনাই মুণ্ডা কঠিন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে আজ যা দেখলো সেই চরম সত্যটাকে ও যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে। ক্রমশঃ চেতনা ফিরছে তার। কঠিন হয়ে ওঠে ওর দেহ। এখনই যেন লাফ দিয়ে পড়বে মুরুং-এর উপর। ওকে টুটি টিপে শেষ করে দেবে, তার বংশের সর্বনাশ করেছে সে। তার মেয়েটাকেও দেখছে সোনাই। নিজেকে সঁপে দিয়েছে ওই ছেলেটার হাতে।

টুয়াই ওদের দেখিয়ে দিয়েই বুঝেছে একটা কাণ্ড কিছু ঘটবে। তাই সে এখান থেকে সরে গেছে। এবার ওরা লড়ুক—খুন-খারাবি হোক। সাবধানী লোকটা পালিয়েছে। সোনাই মুণ্ডা এগিয়ে যায়।

—মুরুং। গর্জে ওঠে সোনাই মুণ্ডা।

হাতের কুঠারটা তুলেছে। চমকে ওঠে মুরুং—নিরস্ত্র সে। তারার আলোয় চিক চিক করছে কুড়ুলটা। গর্জে ওঠে সোনাই।

—আজ তুকে ছাপ খুন করেই ফেলাবো। এতবড় বাড় তুর। কুইলি কোনরকমে ওর আদুড় গা ঢাকছে। সোনাই জ্বলে ওঠে। —তর লাজ নাই? আজ দুটোকেই শেষ করবো।

কুইলি চেনে তার বাবাকে। ওর টাঙ্গিটা ঝলসে ওঠে।

আজ মেয়েটাও কি বেদনাভরা কণ্ঠে মুরুং-এর বিপদে চীৎকার করে ওঠে।

—বাবা!

—চোপ! দুটোকেই শ্যাষ করে বনের বাঘের ভোজে লাগাবো, যাতে কেউ জানতে না পারে।

গর্জাচ্ছে সোনাই। ওর মাথায় খুন চেপে গেছে।

হঠাৎ টাঙ্গিটাকে ধরে ফেলেছে সোয়ী! মেয়েটাও পিছু পিছু এসেছিল তার। সেইই ধরেছে টাঙ্গিটা।

সোনাই চাইল ওর দিকে—টাঙ্গি ছাড়!

—না। চোখ নাই তুমার সর্দার? সোয়ীও এগিয়ে আসে। সোনাই রাগে ফুঁসছে। সোয়ী বলে ওঠে।

—যা তুরা।

—খবরদার! গর্জে ওঠে সোনাই।—ছাড় সোয়ী।

—না। সোয়ী দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সোনাইকে, রাতের নির্জন অন্ধকার নেমেছে বনভূমিতে।

তারাগুলো জ্বলছে আকাশে।

সোয়ী বলে—ইকাজ করো না সর্দার। বয়সের ধরম মানবা নাই? তাহলে আমিও তো নষ্ট হই গেছি গ! টাঙ্গিটা তাহলে আমার

মাথাতেই বসাও। দাও, কুপিয়ে শ্যাষ করে দাও আমাকে ?···

সোনাই দেখছে সোয়ীকে।

ওর লাজ লজ্জা বসন সব খুলে পড়েছে আদিম অন্ধকারে। কি ব্যাকুল আর্জি নিয়ে ও আজ এগিয়ে এসেছে, যেন চিরন্তন বন্য আদিম প্রকৃতি—পুরুষের কাছে কি কাতর আবেদন জানায়।

জীবনের একটি নির্মম রূপকে দেখেছে সোনাই।...

টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে ফিরছে বসতের দিকে। সব চিন্তা-ভাবনাগুলো ক্ষণিকের জন্য ওর গুলিয়ে গেছে।

তোকি বুড়ির ঘুম আসেনি। বয়স হয়েছে, চুলগুলো শননুড়ির মত সাদা আর এককালের যৌবনের ঢল-নামা দেহটার সব রস শুকিয়ে এখন দড়ি পাকিয়ে গেছে। রাতের হিম-বাতাসে কাঁপুনি ধরে। জীর্ণ কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে বুড়ি আবার মালসাটা টেনে নিয়ে হাত পা সেঁকার চেষ্টা করে। নির্জন রাতে হিম ঝরছে বাতাসে তাই কন্‌কনানি ভাব। কিন্তু মালসায় কাঠকয়লার আগুনটা কখন নিভে গেছে।

কোন উত্তাপ নেই, তোকি বুড়ি ডাকছে—সোয়ী! অ সোয়ী!...

কোন সাড়া মেলে না। মেয়েটা বোধহয় ঘরে নেই।

রাতের প্রথম প্রহরে সোয়ী গেছে নাচের আসরে। এখনও ফেরার নাম নেই। তোকি বুড়ির জ্বালাই বেড়েছে ওই বৌকে নিয়ে। একমাত্র ছেলে মতি মুণ্ডা তখন চোখের নেশায় ভুলে মেয়েটাকে ঘরে এনেছিল। তোকি বলেছিল ওই মেয়েকে দেখে সেদিন।

—এটোকে কেনে আনলি রে মতি? আগুনের খাপরতো এটি। আ বাপ।

ডবকা গড়ন, চোখগুলো বড় বড়—সারা দেহে অফুরাণ যৌবন। হাবভাব সুবিধের ঠেকেনি তোকির। তাছাড়া এদেল বাঁও-এর বসতির অনেক বদনাম আছে। দিখুদের কাঠের কল বসেছে উখানে, হৈচৈ চলে মদের দোকানে। পরদেশীরা মদ খেয়ে ওখানের মেয়েগুলোর সাথে লুচ্চামি করে। সোয়ী যে তাদের দলে ছিল না তাই

বা কে জানে।

তোকি বলে ওঠে—ঠিক কাজ করলি নাই ত মতি রে। মেয়েটো ভালো লয়।

মতির দুচোখে তখন সোয়ীর যৌবনমদির দেহের নেশা।

মতি বলে মাকে—তুর যতো বাজে ভাবনা। চুপ দে তো মা। কেমন কাজের মাইয়া দেখ কেনে ?

তখনকার মতো চুপ করেছিল তোকি।

বনের মাঝে মাঝে ইংরেজ আমল থেকেই বনবিভাগের বিট অপিস, চেকপোষ্ট গড়ে উঠেছিল। বনের মধ্যে কিছু কর্মচারা ওই হাতি বাঘ —বাইসন-এর রাজ্যে বনবাস-এর চাকরী নিয়ে থাকতো। দু-চারটে বাড়ি নিয়ে তাদের কোয়ার্টার—অপিস সবকিছু।

স্থানীয় কিছু আদিবাসীদেরও এখানে এনে বসত করানো হতো, যাতে বনের পাহারা দেওয়া, বনে গাছপালা লাগানো বা বনের কাঠ বিক্রীর ব্যাপারে তাদের কাজে লাগানো যায়। কুসুম বসতির পত্তন হয়েছিল বহু কাল আগে হয়তো এইভাবেই।

বনঅপিস-এ দু-চারজন বাবু আসেন আবার বদলি নিয়ে চলে যান। সোনাই মুণ্ডার খাতির জমে এদের সঙ্গে। বনের কাঠ, সরেশ শালগাছ-গুলোর ডাক হয়। কেন্দুপাতার ব্যবসাও জোর চলে। বিড়ির পাতার চাহিদা সারা দেশে বাড়ছে। কেঁদ গাছের কচিপাতা গজাবার সময় তুলে নেবার ইজারাও সেই নেয়। আর বাইরের কাঠ মহাজন বিমলাপ্রসাদজীর সঙ্গে সোনাইও কাঠের ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা কামাই করে, অন্য কাঠমহাজন ভূধর পাঠকও আসে তার কাছে। সোনাইও বন-বিভাগের লোকদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তাকে কিছু পাইয়ে দেয়। নিজেরও কিছু থাকে।

বিট অপিসের বাবু মশায়জীর নজরে পড়ে মেয়েটা। সোনাই গুও জানে কি ভাবে কর্তাদের খুশি করতে হয়। তাই সোয়ীকেই লে—বনবাবুর ওখানে কাজকাম করে দিবি। ট্যাকা দিবেক মাস মাস।

সোয়ীও দেখেছে তাদের সংসারের অভাবের ছায়া। তোকি

বুড়ি বনেবনে কোথায় কাঠ-কুটো কুড়িয়ে আনে, শালপাতা তুলে পাতা বোনে, হাটে বিক্রি করে যা পায় তাতে সংসার চলে না। দাকা ভাতও জোটে না সবদিন। সোয়ী সোনাই মুণ্ডার কথাটা শুনে চাইল। সোনাই বলে—তাই নে কাজটা।

হাসছে সোয়ী। ঝোরার ধারে কুসুমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পুরুষের নজরের সামনে নিজেকে তুলে ধরে মেয়েটা। সোনাই-এর বলিষ্ঠ দেহে ঝড় ওঠে। সোয়ী সেই ঝড় তুলেছে।

ধূর্ত মেয়েটা বলে—সাতাশার উরো, ওই সোরাই সর্দার কিছু বুলবেক নাই তো ?

সোনাই-এর সামনে সোয়া যেন পরীক্ষা করতে চায় সাতাশাসর্দার বড় না সোনাই বড়! সোনাই বলিষ্ঠ বুক দিয়ে ওই নিটোল কামনামতা মেয়েটাকে যেন বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

সোনাই বলে—তুর্ কুন ডর্ নাই! মতিটাকে কাজে দিব রে। দু'জনে খাটবি খাবি, সাতাশা তুকে খেতে দিবেক ?

তোকি বুড়ি খবরটা শুনে অবাক হয়। মতিও বনবাবুদের ওখানে কাজ পেয়েছে। বনে গাছ লাগানো হবে—নতুন গাছ। তারা কাজে নেমেছে। সে পায় দিনে তিন টাকা বেতন, তোকি বুড়ি বলে।

—তু যেছিস যা মরদ। বউটো কেনে যাবে বনবাবুটোর বাসায় ? এ্যা!

এই সাতাশার লুক কি বলবেক!

সোয়ী সেজেগুজে ক্ষারকাচা কাপড় পরে খোপায় লতাপলাশের লাল আগুন জ্বেলে বের হয়ে যায়। তোকি বুড়ি গর্জায়—মরবি ইবার!

সোয়ি নতুন জীবনের স্বাদ পেতে চায়, দিখুবাবুদের নেশালাগা দেহটা ওর মনেও সাড়া তুলেছে। দেখেছে সোনাই মুণ্ডার মত লোকের চোখের সেই আগুন। বসতির ওপাশে ঝোরার জল পার হয়ে বাবুদের টোলার গাছে গাছে এসেছে নতুন পাতার রাশ—পলাশ-শিমূল ফুলের আগুন জ্বলে বনে বনে। সেই আগুন যেন ওর মনে

ছড়িয়ে গেছে।

বোরাই সর্দারও বোঙার থানে সেদিন সাতাশীকে ডেকেছে। কথাটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যেন ঝড় উঠছে বনে। ওদিকে গৈইলকেরা মনোহরপুর, চান্দোয়ার আদিবাসীরাও ক্ষেপে গেছে। বনের গভীরের বসতিতেও 'গিরা' এসে গেছে। বনবাবু ওই দিখুরা সারান্দার সরজম দারু ওই শালগাছ কেটে নাকি সেগুন বন লাগাবে। সে কাঠের দাম অনেক বেশী। কিন্তু সে বন শালবনের মত নয়। তার পাতায় দাকা খাওয়া চলে না, চুটিও বানানো যায় না। একগাছ থেকে বংশ পরম্পরায় গাছ গজিয়ে বনকে ঘনসবুজ করে তোলে না। শালের মত মহান সে নয়—সেগুন স্বার্থপর একক গাছ। শুধু গুঁড়িটাই তার দামী! আর সব ফালতু!

বনে বনে আন্দোলন ওঠে—শাল আদিবাসী, সাগোয়ান দিখ্‌ সাগোয়ান রোপাই বন্‌ধ করো।

বোরাই সর্দার-এর বৃদ্ধ দেহটা সতেজ হয়ে ওঠে ওই শালগাছের মতই, সারা বনের ছড়ানো বসতির মানুষ মেয়ে-পুরুষকে সে শোনায়।

—ই হবেক নাই। উ বনে কাজ করবা নাই। আমরা সাগোয়ান চারা উপড়াই দিব। ই ডুংরীর লুক শুন্‌ সবাই। সরজম দারু বোঙা আছে—সরজম দারু কাটা চলবেক নাই।

সোনাই মুণ্ডা, বাইরের বিমলপ্রসাদ মহাজনও ট্রাকে করে লোকজন পাঠিয়েছে। এসেছে মদের ট্যাঙ্ক। তারাও হাটে হাটে নেমেছে প্রচারে। বনবিভাগ থেকে মজুরী বেশী দিয়ে লোক লাগিয়েছে। সোনাই মুণ্ডা আজ বোরাই সর্দারদের জানিয়ে দিতে চায়। ওদের প্রতিবাদ মিথ্যা, অর্থহীন।

তাই সেগুন গাছগুলো পাহাড়ের গায়ে গায়ে মাথা তুলেছে দীঘল হাতির কানের মত সবুজ পাতা নিয়ে, আরও রোপাই চলছে। পয়সা —মদ—কাপড়—চাল সবই এসে যাচ্ছে। বুভুক্ষু মানুষগুলোকে যেন কিনে নিয়ে ওরা শালবন কেটে নতুন সেগুন রোপাই করে চলেছে।

তোকি বুড়ি সাতাশীর বোঙার থানের দীঘল বলিষ্ঠ শালগাছ-

গুলোর নিচে পিদীম জ্বালে। ওরা যেন এই বনভূমির রক্ষক। বোরাই সর্দারও কোথায় হেরে গেছে। এখানের শালবন কাটেনি ওরা—তবু পাহাড়গুলোর বিস্তীর্ণ বুকের কোণে কোণে ওরা নতুন বন করছে। আর্তনাদ করে উপড়ে পড়ে শালগাছগুলো।

বোরাই বলে ক্লান্ত স্বরে।

—বোঙার কোপ আসবেক তোকি! ই ডুংরীর মানুষগুলো শুনলো নাই। সোনাই ইসব মদত দিলেক। তুর ছেইলা মতি-বৌটোও গেল উদিকে।

তোকি বুড়িও কি অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে।

রাত ঘনিয়ে আসে বনে বনে। ভিজে বাতাসে বনচাঁপার সুবাস ওঠে। একটা শিয়াল বার কতক ডেকে থেমে গেল। বনের ভিতর স্তব্ধতা নামে। আদিম কোন স্তব্ধতা।

কোয়াক্....কোয়াক্!

হরিণের সাবধানী ডাক শোনা যায় স্তব্ধতার মাঝে। ওই ডাকটা কর্কশ আতঙ্কময় একটা পরিবেশ গড়ে তুলেছে। ঝোরার ওদিকে নেমেছে বোধহয় বাঘ জল খেতে! ধারালো জিব দিয়ে জল চাঁটছে সে।

বনবাবুর নেশালাগা চোখের সামনে সোয়ীর আদুড় বুক—নিটোল পূর্ণ দেহটা যেন অমনি কোন শিকারের সামগ্রীই।

হাসছে মেয়েটা—খেয়ে ফেলাইবা নাকি গ ছাপ্। এ্যাই-ই! হাসছে মেয়েটা, ওর হাসি ওই লোকটাকে যেন মাতাল করে তুলেছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে ওরা। ঝুপড়ির আগলটা সরিয়ে তোকি বুড়ি হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালো। লোকটা ছায়া-মূর্তির মত সরে গেল—আঁধারে মিলিয়ে যায় সে। তোকি বুড়ি গর্জে ওঠে—কে উটো। মরণ হয় না তুর? তাই দেখি ট্যাকা শাড়ি—জামা কত কি আসে? রূপের দুকানী তুই কসবি, লজ্জা নাই ছুঁড়ি? বিষলতা খাই মরতে পারিস না?

হাসে সোয়ী, ও জানে এই বুড়ির জিবটাই সার। করার মুরোদ নাই কিছু। কাপড়টা দিয়ে গা ঢেকে বলে বুক চিতিয়ে।

—চুপ করে থাকবি? মরতে যাবো কেনে—কেনে বটে? এত দিছি তুদের।

তোকি বুড়ি গর্জায়—তু কালামুখী, বোঙা ইয়ার বিচার করবেক। দিখুদের দলে তুই—শয়তানী তুই।

মতিকে এখন বাইরের ক্যাম্প-এ থাকতে হয়। বনবাবু ওকে বাইরের ক্যাম্প-এ রেখেছে ইচ্ছে করেই। শালবন কাটাই হচ্ছে—আর সেগুন লাগাচ্ছে তারা। ঘন বনে সেবার কাটাই করছে হঠাৎ একটা ভালুকের বাচ্চাকে ধরে ফেলে তারা। কুঁই কুঁই করছে নধর বাচ্চাটা। নিয়ে আসে ওদের বনের ক্যাম্পে। কাঠ কুটো দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি, বনের মধ্যে ওই ভাবেই থাকতে হয়। কানাই বলে।

—উটোকে বনে ছেড়ে দে মতি।

মতিই আটকে রেখেছে বাচ্চাটাকে। শীতের রাত। আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে ওই ঝুপড়ি কটা। আগুন জ্বেলেছিল তাও শিশিরে নিভে গেছে। হঠাৎ ঝড়ের মতো কি যেন এসে পড়ে মতির খেয়াল হবার আগেই মদ্দা ভালুকটা এসে মতিকেই থাবা মেরেছে। মাদী ভালুকটা বাচ্চাটাকে নিয়ে বনে ঢুকে যায়।

কলরব ওঠে, ভালুকটার থাবার আঘাতে ছিটকে পড়েছে মতি। মুখের একটা দিকের মাংস তুলে নিয়েছে, ডান হাত দিয়ে রুখতে গেছে, প্রচণ্ড আঘাতে হাতের মাংস উঠে গিয়ে হাড়ে চোট লেগে হাতটা ঝুলছে কোন মতে।

চীৎকার-আর্তনাদে ঘুমন্ত ঝুপড়ির লোকজন জেগে ওঠে। ভালুকটা তখন কালো ধোঁয়ার মত সব তছনছ করে বনে ঢুকে গেছে। মতির জ্ঞানহীন রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে মাটিতে। বনের কোন এক অপদেবতাই যেন ওদের অন্যায়ের বিচার করে শাস্তি দিয়ে বনের গহণে মিলিয়ে গেছে।

ওরা ভোর রাতেই শাল রোলার ডুলি তৈরি করে মতির রক্তাক্ত অচেতন দেহটা নিয়ে ডুংরিতে এসেছে। তোকি বুড়ি চীৎকার করে বুক চাপড়ে।

—ই কুনপাপে ই সব্বোনাশ হল গো ! হেই সর্দার ছেইলাটাকে বাঁচাও গ !

এতদিন ডুংরিতে মানুষের জ্বর জারি—সাপেকাটা—ভালুকের চোট বনবরার চোটের চিকিৎসা করেছে বোরাই সর্দার। জুরি-বুটি গাছ-গাছড়া লাগিয়ে বোঙার থানের মাটি দিয়েই ওদের চিকিৎসা করে এসেছে ওরা। কেউ বেঁচেছে, কেউ মারা গেছে।

আজও বোরাই সর্দার লতা পাতা এনেছে, কিন্তু বাধা দেয়· বনবাবু, ওই সোনাই মুণ্ডাও। সোয়ীও এসে পড়েছে। কাঠ মহাজনের ট্রাকে মাল উঠছিল। সোনাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে।

—ওসব তাক তুক এর কাম লয় সর্দার !

বোরাই সর্দার অবাক হয়। মারা হো বলে—কি বলছো হে সোনাই ?

সোনাই বলে—ট্রাক যেছে, ওকে গুয়ার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবেক। ভালোকরে চিকিৎসে করবেক উখানে।

বনবাবুও বলে—ভালুকের ঘা, বিষিয়ে যেতে পারে। ওখানেই পাঠাও ওকে।

তোকি বুড়ি ঝামরে ওঠে—না ! বোরাই সর্দারই দেখবেক উয়াকে।

বোরাই সর্দার অবাক হয়। সোনাই মুণ্ডা আজ এত লোকের সামনে তাকে, তার বিদ্যাকে, তাদের জাতের সংস্কারকেই আঘাত দিয়েছে কঠিনভাবে। জীবন মরণের প্রশ্ন। বোরাই সর্দারই বলে —ওরা যা বলছে কর্ তোকি !

সোনাই মুণ্ডার কথায় মতির অচেতন দেহটাকে ট্রাকে তোলা হ'ল। সোনাই বলে—তুইও চল্ সোয়ী। দেখ ভাল্ করতে হবেক। তোকি বুড়ি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—বনের বাইরে যেতে মানা। বোঙারশাপ লাগবেক সর্দার। ছেইলাটা বাঁচবেক নাই গ—হেই সর্দার !

আজ বোরাই সর্দার যেন পরাজিত। ওরা ট্রাক নিয়ে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। বুড়ি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ বনের আত্মা যেন অমনি করে গুমরে কাঁদছে কি এক নতুন যন্ত্রণায়। বুড়ো

সর্দার বলে।

—চুপ দে তোকি!···চুপ দে!

বনের পথ দিয়ে ট্রাকটা চলেছে। সোনাই-এর পাশে বসে আছে মেয়েটা। সে দেখছে সোনাইকে ওর ডাগর চোখে।

রহস্যাবৃত হাসির তীক্ষ্ণতা। দমকা বাতাসে গায়ের শাড়িটা খুলে গেছে সোয়ীর, যেন হুঁস নেই। সোনাই-এর দু'চোখের চাহনি ওর সারা মাংসল দেহটাকে যেন জিব দিয়ে চাটছে—সোয়ী সেটা দেখেও দেখে না।

···ওপাশে কাৎরাচ্ছে আহত রক্তাক্ত মতি, সোয়ী ওর দিকে চাইবার প্রয়োজনও বোধ করে না। ও যেন কি এক নতুন নেশায় মেতে উঠেছে। সোনাই মুণ্ডার তাজা শরীরটা সোয়ীর মনে নেশা ধরিয়েছে। নতুন এক নেশা।

মতি ফিরেছিল কোনরকমে প্রাণে বেঁচে, কিন্তু একটা হাত অকেজো হয়ে গেছে, মুখের একটা দিক ওর বিকৃত, কথা বলে অস্পষ্ট স্বরে, যেন একটা জানোয়ার ঘেংড়ে কাঁদছে। কোনরকমে চলতে পারে বাঁকা দেহটা নুইয়ে, কোন বন্য প্রাণীর মত দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে চলে এখন—কাজ করার ক্ষমতা তার নেই।

তোকি বুড়িও জানে সোয়ীর ব্যাপারটা। মেয়েটার পাপেই সব গেছে।

বুড়ি তাই দিন রাত গর্জায়, ওই ছেলের উপরই তার যত রাগ, জ্বালা ফুটে ওঠে।

—মরতে পারলি নাই ক? এ্যাই যমটো। কি দেখতে বেঁচে আছিস রে? সোয়ী রাতে এখন প্রায়ই বের হয়।

মতি মায়ের ডাকে চাইল।

তোকি শুধোয়—বৌটো কুথায়? রাতভোর কুথায় থাকে—কুন লরকে রে? আর তু তাই দেখিস? মরদ! ঝাঁটা মারি এ্যামন মরদের মুখে।

মতিও জানে সব, সারা দেহমন রাগে জ্বলে ওঠে সোয়ীর নির্লজ্জ ব্যবহারে; কিন্তু করার কিছুই নাই। অব্যক্ত ভাষাহীন একটা গোঙানি ফুটে ওঠে রাতের আঁধারে। আজ সে অসহায় পশু।

তোকি বুড়ি গর্জায়—মরণ! বনের মোষটো গাঁঙ্গাচ্ছে বটে! চুপ দে। তখন খুব তো গেছলি বনে, এখন কে দেখে তুকে?

বুড়ি ওই হিমশীতে কাঁপছে। আজ মনেহয় এর চেয়ে মরাই ছিলো ভালো।

তাই রাগে দুঃখে আর যন্ত্রণায় কঁকাচ্ছে বুড়ি

সোয়ী তখনও ফেরেনি। বুড়ি জানে সোনাই মুণ্ডার ঘরেই গেছে মেয়েটা। আজ তাদের কোন প্রতিবাদ করার সাধ্য নাই। মুখবুজে সব সয়ে থাকতে হয়—ওই বুড়ি আর অক্ষম মতিকে। তাই জোয়ান মতিরও প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে গেছে। রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত গজরায় শুধু। ফেটে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টাই করে সে।

…সোনাই মুণ্ডা সেইরাত্রে চুপকরে এতবড় অপমানটা হজম করে সরে এসেছিল, কিন্তু এ নিয়ে ভেবেছে সে। মুখবুজে এতবড় অপমানটা সে সহ্য করবে না।

আজ সোনাইমুণ্ডা এই অরণ্যভূমিতে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে, ছাতাবুরুর লাগোয়া পাহাড়টার ইজারা নিয়েছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে। কাঠের ব্যবসাও চালু রয়েছে। নিজেও একটা ট্রাক করেছে। বসতির মধ্যে এবার পাকা বাড়ি বানাবার ইচ্ছাও আছে তার।

গুয়া বড়জামদার প্রসাদজীই তাকে এসব ফন্দীফিকির দিয়েছে, ভিতরের অনেক খবর পায় তারা। এই বনের বুকে রেল লাইন বসবে একেবারে ধরমপাদা অবধি। ধরমপাদার ওদিকেই বিরাট পাহাড়-গুলোয় পাওয়া গেছে প্রচুর লোহাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ আরও কত কি। আরও সবকাজ চলছে। ওখানের পাহাড় থেকে যন্ত্র বসিয়ে মাল তোলা হবে, সব মাল চালান যাবে রেল লাইন দিয়ে।

সোনাই মুণ্ডা এবার স্বপ্ন দেখছে আরও বড় হবে সে।

আর সেই লোকটা ওই বোরাই সর্দার, তার দলবলকে সে পরোয়া করবে না। কাল রাতে ওই মুরুং-এর ব্যাপারটা তার মনে জ্বালা ধরিয়েছে। বোরাই সর্দারের সামাজিক বিধান—তার প্রাধান্য—বংশগত সর্দারের অধিকার, সব ছিনিয়ে নেবে সোনাই মুণ্ডা। সেইই হবে এ অরণ্য বসতিগুলোর মহামান্য প্রতিভূ।

টুয়াই—মুনিমজী সকালে কাজের ব্যাপার নিয়ে বসেছে। ডুংরির আশপাশের বসতির জোয়ান ছেলে-মেয়েরা আসে সোনাই মুণ্ডার বাইরের বাড়িতে। ওখানে যে-কজনের কাজের দরকার তাদের নেওয়া হয়। কেন্দু পাতা তোলা ও বাণ্ডিল বাঁধার কাজ করে মেয়েরা, পুরুষদের জন্যে কাঠের কারবারের নানা কাজ—জমির কাজ—এসব থাকে।

মুনিমজী খাতা নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, টুয়াই মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে দেখে, সবই চেনা মুখ। রোজকার মতই কাজ সুরু হয়েছে। সোনাইও বের হয়েছে কাজের তদারকে। যেন কালরাতে কিছুই ঘটেনি। তার মনের জ্বালাটাকে বাইরে প্রকাশ করেনি সে। পরবের পর্ব চুকে গেছে মেয়েদের কাজের ফর্দ দিচ্ছে টুয়াই।

ওদের মধ্যে মুনিয়া, গোরাই, কদমি—তাদের বেশী প্যার করে।

একজন মেয়ে বলে ওঠে—আমি কি খারাপ হে টুয়াই, লজরে ধরছে নাই গ? হেসে ওঠে অনেকে।

টুয়াই-এর মনমেজাজ ভালো নেই। কাল রাতের সেই দৃশ্যটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। কুইলিকেও আর দেখেনি।

টুয়াই মেয়েদের কথায় বলে—তুরো সবাই বেইমান রে! দিনের বেলায় কতো ভালোবাসাবাসি আর রাতের বেলাই চিনতেই লারিস!

মুনিয়া সারা গতরে জোয়ার এনে বলে।—দাগাটি কে দিলে ক হে? আহা—গ।

ওদিকে সোনাই মুণ্ডাকে দেখে ওরা থেমে যায়। টুয়াই মেয়েদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এবার ছেলেদের দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মুরুংকে দেখে। সেও কাজে এসেছে রোজকার মত।

গতরাত্রের সেই ছবিটা টুয়াই-এর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি কি আদিম উদগ্র কামনার গভীরে হারিয়ে গেছে। পুরুষের এই বলিষ্ঠ সত্তার প্রতিভূ হিসেবেই যেন দাঁড়িয়েছে আজ তার সামনে ওই জোয়ানটা।

টুয়াই জানে মালিকের ব্যাপার এটা। তার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়াই হবে এবার মুরুং-এর। তাকে কাজ দেবে কিনা ভাবছে। মুরুংও চুপকরে থাকে।

সোনাই মুণ্ডাও এগিয়ে এসেছে। দেখেছে সে মুরুংকে। মুরুং-এর চোখে মুখে বলিষ্ঠ ঋজুতা ফুটে উঠেছে। সোনাই চতুর ব্যক্তি। সে কালকের রাতের ব্যাপারটাকে নিয়ে এত তুচ্ছভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় না। তাই কি ভেবে বলে টুয়াইকে।

—মরদগুলানকে কাঠের গুঁড়িগুলান জমা করতে পাঠাই দে। মাপ করে কেটে কুটে রাখুক, কালই চালান দিতে লাগবে ক।

সোনাই হুকুম দিয়ে চলে গেল।

টুয়াইও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। মুনিমজীর খাতায় হিসেব জমা হয়—এক কুড়ি তিনটে মরদ গ!

…সেই হিসেব দৃষ্টে সন্ধ্যায় বেতন দেওয়া হবে। তবু মালিকের এই নিস্পৃহ ভাব দেখে সে অবাক হয়।

মুরুংকে বলে—যা কাজে লাগ। এত কাজ পড়ে রইছে।

মুরুং ভেবেছিল একটা কিছু বাধবে তা হয় না দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয় সে।

দুপুর নেমেছে বনরাজ্যে। মেয়েরা পাতা তুলছে। শালপাতা আর কেন্দুপাতা। শালপাতাগুলোর টাল বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা বসতের চালার দিকে, সেখানে শালপাতাগুলো বোনা হচ্ছে। রাশি রাশি শালপাতা—ওদিকে মাঠে কাঠ কাটাই হচ্ছে করাত দিয়ে, বড় বড় মোটা শাল-গামাড়-চাঁপ-সেগুন গাছের গুঁড়িকে সাইজ মত কেটে চলেছে, ট্রাক বোঝাই হয়ে চালান যাবে।

—দাকা ভাত খাবার ছুটির আগে ওদের কাজ কিছুটা এগিয়ে নিতে হবে। টুয়াই সিগারেট মুখে হাঁক ডাক করে।

—এ্যাই মাগীগুলান ঘুমাই গেলি নাকি রে? তা কার সাথে ঘুমাইলি বল?

মুনিয়া চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম কোপে ছটকে ওঠে।

—চুপ দে বলছি বেদোটো।

খস্ খস্ শব্দ ওঠে। মুরুং করাত টানছে গাছের বুকে। মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে সবুজ অরণ্য পর্বতসীমার দিকে, বিচিত্র এই জগৎ। ওই অরণ্যের গভীরে ছায়া নেমেছে। পাখী ডাকে—বনটিয়ার ঝাঁক।

ফিকে নীল আকাশ যেন চাঁদোয়ার মত টাঙ্গানো রয়েছে আসমান জুড়ে। এই সুন্দরের রাজ্যে—সহজ মানুষগুলোর সবকিছু লুটে নিতে চায় সোনাই মুণ্ডা। অরণ্যের বনস্পতিদের গায়ে কুঠারের শব্দ ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে কঠিন শব্দটা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

যেন লুটেরার দল হানা দিয়েছে শান্ত বনরাজ্যে, গাছটা কাঁপছে কুঠারের আঘাতে। দীর্ঘ কাণ্ড বেয়ে সেই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিটা ছড়িয়ে পড়েছে গাছের শাখা-প্রশাখায়। শাখাশ্রয়ী পাখীগুলো কলরব করে, ওদের আশ্রয়ও হারিয়ে গেল। ঠোঁটে করে বাচ্চা কটাকে নিয়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করে—শুক্‌নো পাতার উপর কিসের শব্দ উঠতে চেয়ে দেখে মুরুং, একটা বাচ্চা পাখী মায়ের ঠোঁট থেকে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে চলেছে, ওর সরু ছোট্ট ঠোঁট বেয়ে এক সুতো রক্তের ধারাণি বের হয়েছে। স্তব্ধ হয়ে গেল বাচ্চাটা।

মা পাখীটা তখনও শূন্যে আর্তনাদ করে পাক খাচ্ছে ট্যাঁ—ট্যাঁ।

ঠক্-ঠক্—ঠকাস!—গাছটার নরম কাণ্ড বেয়ে আঁঠা, রস বের হচ্ছে। জীবন্ত প্রাণীর মতই ওই ক্ষত দিয়ে তার বুকের রক্ত ঝরছে। দৌড়ে পালাচ্ছিল একজোড়া হরিণ দম্পতি।

এ-হোই—হোই—রে

কারা চীৎকার করছে। হরিণ ছুটো ডাগর কালো চোখ তুলে ওই লুটেরার দলের দিকে চেয়ে থাকে। ওরা দেখছে গাছটাকে।

পরক্ষণেই লাফ দিয়ে অরণ্য গহনে হারিয়ে গেল।

এদের কুড়োলের কোপে আহত বিরাট গাছটা এবার শেষ আর্তনাদ তোলে মড় মড়—ড়, ঝু—ঝুপস্—

সারা বনতল ভরে ওঠে ওই আর্তনাদে, গাছটা ছিটকে পড়লো আশপাশের গাছের ডাল—শাখা-প্রশাখা ভেঙ্গে নিয়ে বাতাসে অন্তিম দীর্ঘশ্বাস তুলে।

বদ্ধ সূর্যের আলো দীর্ঘ বহু বৎসরের বাধা মুক্ত হয়ে, এবার নরম ভিজে মাটিতে এসে লাফিয়ে পড়েছে, কুমারী মৃত্তিকার শুচিতাটুকু দীর্ঘকাল পর ওই লোভী আলোর ঝলকে প্রকাশিত—লুণ্ঠিত হয়েছে।

অরণ্যকে ওরা শেষ করছে। ফুরিয়ে যাবে একদিন এই বনভূমি। দূরে কিরিবুরু, গুয়ার ছায়ান্ধকার পাহাড়ে ওর হানা দিয়েছে, দিগন্ত এখন শূন্য, পাহাড়টাকেও ধ্বসিয়ে ওরা লোহাপাথর বের করেছে, ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে ওদের লোভী হাতের থাবা।

এই সবুজ সারান্দার বনরাজ্যও ফুরিয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেও চমকে ওঠে মুরুং। বুড়ো বোরাই সর্দারও বলে—সিদিন ঝোরার জল ফুরাই যাবেক। বসুমতী আর ফল-ফসল দিবেক নাই। বনের জানোয়ারগুলানও শেষ হবেক—আর তুরো? পথে পথে ঘুরবি আঁত কাঁকালে করে, শুখাই দড়ি হই মরবি, তুদের মাইয়াগুলান গতর ফিরি করে খাবেক দিখুদের কাছে।

কথাটা কঠিন—নির্মম। কিন্তু মুরুং-এর মনে হয় এ যেন এই অরণ্যবাসী মুণ্ডা-হো-দের উপর কোন নিয়মিত নির্মম বিধান। বোরাই বলে—ওই সোনাই মুণ্ডাই পথ দেখিয়ে আনবেক সেই লুভী দিখুগুলানকে। পয়সার লালচ্ উর বড়ো বেড়েছে হে। উ আর মুনীমটো লুভী বাঘের চেয়েও রক্তপিচাশ!

সোনাই সেই রাতের কথাগুলো ভোলেনি। দেখেছে কুইলিকেও। তার মেয়েও যে এমনি একটা কাজ করবে ভাবতে পারেনি। ওর মা মারা যাবার পরই কুইলিও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মেয়েটাও

দেখেছে তার বাবা আর মতির বৌ ওই সোয়ীর মধ্যে সেই সম্পর্কটা। কুইলি প্রতিবাদ করতে পারেনি, মনে মনে গুমরে ওঠে—বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই তার নিঃসঙ্গ মন এগিয়ে গেছে মুরুং-এর দিকে।

আরও তাকে এগিয়ে দিয়েছে মুরুং-এর দিকে টুয়াই-এর নির্লজ্জ ব্যবহার। দেখেছে কুইলি বাবাকে বলেও ফল হবে না। টুয়াইকে বাবাও বিশ্বাস করে। আর কুইলি টুয়াইকে ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে। কুইলি কদিন বের হয়নি বাড়ি থেকে।

দেখেছে টুয়াইকে নিয়ে বাবা কি পরামর্শ করছে। দু-একবার মুরুং-এর নামও শুনেছে। কি যেন একটা চক্রান্তই করছে তারা।

টুয়াইও সেদিন কাঠমহাজনের ট্রাকে গুয়ার দিকে চলে গেল, ফিরেছিল বৈকালেই। সোনাইও খুশী হয় তার কথা শুনে।

কুইলি বাইরে লাউমাচানের ওখানে জল দিচ্ছিল। সবুজ ঘন পাতার আড়াল থেকে সে দেখেছে ওদের। টুয়াই কাজে চলে যেতে কুইলি এগিয়ে আসে। সোনাই ওকে এসময় দেখে যেন একটু চমকে ওঠে—কি করছিলি তুই?

কুইলি দেখছে বাবাকে। ওযেন কি অন্যায় করতে গিয়েই ধরা পড়ে গেছে। কুইলি শুধোয়—জল দিছিলাম গাছে। টুয়াই কি বলছিল বাপ্?

কুইলির কথায় বলে সোনাই—না কিছু না তো! এমনি কাঠ চালানের হিসেব দিচ্ছিল।

কুইলি বেশ বুঝেছে একটা ষড়যন্ত্র দানা পাকিয়ে উঠছে।

কিছুটা বুঝতে পারে কুইলি ওই দিনই।

মুরুংকে ডেকে এনেছে টুয়াই। সোনাই মুণ্ডাও রয়েছে বাইরের লম্বা চালাটায়। ওখানে কাজকাম হয়—মুনিমজী বসে আছে ক্যাস-বাক্সের সামনে, কানে খাঁগের কলম গোঁজা, মাটির দোয়াত থেকে কলমে করে কালি তুলে লাল খেরো বাঁধানো খাতায় কি সব আঁকি বুঁকি কাটছে।

মুরুং এসে দাঁড়ালো। ওই খাতাখানা দেখে এই বনঅঞ্চলের

তাবৎ আদিবাসীরাই ঘাবড়ে যায়। অনেকের অনেক সর্বস্বান্ত হবার পরোয়ানা রয়েছে ওতে। দু-চারজন আদিবাসী বসে আছে।

মুনিমজী মুরুংকে দেখে বলে—তোর বাপমারা মুণ্ডা কর্জ নিইল পনেরো কুড়ি ট্যাকা, বন্ধক ছিল নামো সোলের দুবিঘা জমি। টাকাটি সুদে আসলে ইগারো শ ট্যাকা দেড় কুড়ি হই গেল, ট্যাকা তিন দিনের মধ্যি দিবি, নাতো ই সানেই উ জমিটুন মালিক দখল লিছে। হ্যাঁ গ্যাখ পাক্কা হিসেব।

মুরুং হিসেবের অঙ্ক পড়তে শেখেনি। শুধু কালিকাগজের ওই লাল খাতায় কতকগুলো আঁচড়ই দেখে মাত্র। শুধু বুঝতে পারে ঝোবার অমৃত ধারায় পুষ্ট ধানের এই সরেস জমিগুলোও কেড়ে নিল এবার সোনাই মুণ্ডা। বুকের রক্তটুকুও শুষে নিল ওই মহাজন।

সোনাই মুণ্ডা ভাবছিল, ছেলেটা তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে আর সোনাই তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবে নিষ্ঠুরভাবে কিন্তু মুরুং তা করেনি।

মুখে ওর ফুটে ওঠে নিবিড় বলিষ্ঠতা, প্রতিবাদের কাঠিন্যে ও যেন একটি বলিষ্ঠ স্বত্তায় পরিণত হয়।

মুনিমজী বলে—কিরে জবাব দিস্ছিস না যে? শেষকালে মারদাঙ্গা করবি না তো?

ছেলেটা বলে—বাবা ট্যাকা নিল কে বলেছে হে? বলো কেড়ে লিব তুর জমি, ব্যাস। লিতে হয় লিও! মিছা বলো না হে!

গর্জে ওঠে সোনাই—মিছে কথা এসব?

মুরুং জবাব দিল না। গুম হয়ে উঠে বের হয়ে এল। তার সারা মনে যেন আগুন জ্বলছে। গর্জে চলেছে সোনাই—দেখলি ট্যাই ব্যাটার তেজ! সর্দারী ফলিয়ে গেল এখানে? এবার ওকে টিট্ করি দিব হে!

বোরাই সর্দার কথাটা শুনে চমকে ওঠে। শালগাছের ছায়ায় মাচুলি পেতে বসেছিল বুড়ো, মুরুং-এর কথায় বলে।

—ই কথাটি বললেক সোনাই? সি দুকুড়ি ট্যাকা কবে শুধে

দিছি তুর বাপ বেঁচে থাকতেই, আজ বলে জমি নাই—

মুরুং চুপ করে বসে আছে। দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে। বনে বনে ঘরে ফেরা পাখীর কলরব ওঠে। সূর্য গেড়াবুরু পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে, আকাশটায় শুধু বিদায়ী সূর্যের লাল আভা মুরুং-এর চোখে কি নিঃস্ব বেদনার আভাস আনে। সব হারিয়ে গেল তার। লুটে নিল ওই সোনাই মুণ্ডা।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল। কুইলি শুনেছে সব কিছু। এমনি একটা কিছু ঘটবে তা যেন অনুমান করেছিল সে। কুইলি জানে বাবার রাগের কারণটা। তার জন্যই আজ মুরুং-এর উপর তার বাবার এই আক্রমণ!

লতাপলাশের আগুন জ্বালা বনের ছায়ায় আঁধারে দাঁড়িয়েছে কুইলি। এগিয়ে আসে সে—আমি সব শুনেছি মুরুং। আমার জন্যেই তুকে এমনি করে ঠকালে ক বাপ্। আর সাথে জুটেছে ওই টুয়াই শয়তান টো।

মুরুং চুপ করে থাকে। কুইলি বলে।

—আজই চলে যাই মুরুং ইখান থেকে। বাইরে বড় জামদায় মহাজন আমাকে বিটি বলে—উখানেই চল দু'জনে।

কাজ কাম করে দিন কাটাবো। তু চল মুরুং।

মুরুং চাইল ওর দিকে। আজ তার স্বপ্ন সুর হারিয়ে গেছে কি কঠিন আঘাতে।

—মুরুং। ট্যাকা আমারঅনেক আছে সাথে। তোর ডর নাইরে!

—তুই ঘরকে যা কুইলি। আমার কিছু নাই—জমি জারাত সব গেছে। আমার সাথে তুর কুন কিছু থাকতে নাইরে! তু যা!

মুরুং-এর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা তারা জেগে ওঠে।

কুইলির দুচোখে জল নামে কি হতাশার বেদনায়। কুইলির হাতখানা ওর হাতে।

—মুরুং! বাপের সাথে কাম আমার নাই। উ আমার কেউ লয় তুই চল—তু আমার সব রে! ওই বোঙা জানে, বন বিবি জানলেক,

জানলেক ই বোরার শেতল বোঙা ! মুরুং !

কি যেন হাহাকার জাগে মুরুং-এর সারা মনে। এভাবে চোরের মত সোনাই মুণ্ডার মেয়েকে সে নিয়ে পালাতে পারবে না। তার সর্দার বংশের মুখে কলঙ্কের দাগ সে আনবে না। এ আঘাত তাকে সইতেই হবে।

বলে মুরুং—যদি মরদের মত পারি সাতাশীর সামনে তুকে ঘরে আনবো কুইলি, নালে লয়। চুরি করতে—চোর সাজতে তুই বুলিস না আমাকে। তুর মুখে কালি দিতে বলিস না। তু যা—যা !

কুইলি দেখছে বলিষ্ঠ ওই যুবকটিকে। হয়তো তার কথাই সত্যি। কুইলি ততদিন তার পথ চেয়েই থাকবে।

তবু বলে কুইলি—তালে তুই চলি যা মুরুং, জামদায় দিখুদের কাছে যা। ইখানে থাকলে বাপ্ তুক ছাড়বেক নাই !

গর্জে ওঠে মুরুং—আর কি করবেক ? জমি লিছে, কাজ কাম দিবেক নাই। আর কি করবেক ? জানটা লিবেক ? তার আগে মুরুং লড়ে মরবেক কুইলি। বনের বাঘকে আমি ডরাই না !

কুইলি তবু যেন বোঝাতে পারে না ওই মুরুংকে যে বাঘের চেয়েও এরা বেশী শয়তান আরও হিংস্র। সরে এল কুইলি। বনের শুক্‌নো পাতায় কিসের শব্দ ওঠে। কে ভীরু সাবধানী পায়ে পায়ে এদিকে আসছে।

কুইলি সরে এল।

ঝোপের ওদিকের কুসুম গাছের নীচে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল চকিতের মধ্যে। আবছা আলোয় চিনেছে তাকে কুইলি। টুয়াই-ও তাদের দিকে নজর রেখেছিস। গর্জাচ্ছে কুইলি। —কুকুরটো কুথাকার।

পরদিন মুরুং কাজে আসেনি, সোনাই মুণ্ডার এখানে কাজ করবে না। বনে কন্দমূল তুলে আনছে ঘাড়ে করে। হঠাৎ লোকজনের ভিড় দেখে থামলো। কে একজন বন পাহারাদার ওকে দেখে বলে।

—তুকে সাহাব ডাকছে মুরুং ! চল।

মুরুং এগিয়ে যায় ওদিকে।

ডুংরির লোকজন ভিড় করেছে সোনাই মুণ্ডার বাইরের বড় চালাগুলোর সামনে। বোরাই সর্দার হাত পা আর মাথার জটার মত চুলগুলো নাড়িয়ে কি বলছে।

তোকি বুড়িও এসে জুটেছে। বুড়ির সাদা শনমুড়ির মত চুল-গুলো হাওয়ায় উড়ছে, খ্যানখ্যানে গলা তুলে বুড়ি চীৎকার করে।

—এত বড় পাপ, ধরমকে তুশ্‌চো করা, ই সইবেক নাই। পরবের দিন শিকার করবেক নাই খ! ই মা গ!

বোরাই সর্দারও বলে—পারগাণা বোঙা, উয়ার বুন রংগোরুজি বোঙার দয়া না পেলে আদিবাসীদের সব্বোনাশ হবেক। আর সিটো দোষের হল, তু বলছিস? এ সোনাই জবাব দে কেন্ পুলিশ আইল?

সোনাই মুণ্ডা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বনে ওই হরিণ মারার খবর বাঘ শিকার করার আয়োজনের কথা নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে সরকারী বনবিভাগের কর্তাদের কানে উঠে গেছে। আর বারোশিঙ্গা বিরাট হরিণের শিংগুলো প্রমাণ হিসেবে ওই ফরেষ্ট অফিসারের হাতে কিভাবে পৌঁছে গেছে।

সোনাই মুণ্ডা বলে—এখন সরকারের বন। ওসব জানোয়ার মারা আইন নাই। মুরুং সেই আইন মানেনি। তাই ওরা আইছে হে।

ফরেষ্ট অফিসার, পুলিশ, আর গার্ডরাও জানায়

—ঠিক কথা! সোনাই ঠিক বলেছে।

বোরাই সর্দার গর্জে ওঠে, মাথার জটাগুলো নড়ছে, ও বলে।

—আমাদের ধরম থাকবেক নাই? তু কি ধরম করমও বদলাই ফেললি? তুর মা বাপ কি পারাগণা বোঙা-রংগোরুজি বোঙাকে পূজো দেয় নাই? পিতলের জলভর্তি কলসিতে সরজম দারু (শাল গাছ)-র ডাল ডুবাই চুদিকে বাতি জ্বালাই রাত কাটাইনি ডহরী শিকারের আগের রাতে? তু আদিবাসী লোস বনের? তবে

কেনে—কেনে ই কথা বলবি ?

সোনাই মুণ্ডা জানে দিনকাল এখন বদলেছে, কানুন বদলেছে। তাদের বাঁচতে হলে আগেকার আরণ্যক জীবনের পথ ছেড়ে এখন অন্য পথ নিতে হবে। বাইরের সভ্যজগতের নতুন জীবনের স্রোত এখানেও এসে পৌঁছবে, সেই তালে পা ফেলতে না পারলে এই আদিম সমাজ এই মানুষগুলো ভেসে যাবে, হারিয়ে যাবে,—মুছে যাবে। এই কঠিন সত্যটা ওদের বোঝাতে সে পারেনি, ওরা বুঝতে চায় না। তাই বোরাই সর্দার, ওই মুণ্ডা সমাজের অনেকেই ভাবে তাকে আদিম শত্রু বলে।

ফরেষ্ট অফিসার ভদ্রলোক বলেন—সরকারী আইন মেনে চলতেই হবে। বনের জন্তু জানোয়ার মারা চলবে না। বনের গাছও বিনা পারমিটে কাটা চলবে না। মায় শালপাতা, কেন্দুপাতা বিনা পারমিটে তোলা বেআইনী কাজ। এসব বন্ধ করতে হবে।

লখাই বুড়ো বলে।

—বনে বাস করি, ইখানেই মানুষ। ইখানের কিছুই যদি না পাবো তবে ছেলে পুইলে লিয়ে বাঁচবো কেম্‌নে ? খাবে কি হে ?

তাদের এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই বনের কর্মচারীর। হয়তো মনে হয় তাদের জন্য এখানেও কোন ঠাঁই নেই, ওদের যেতে হবে ঐসব কলকারখানা না হয় মাইনস্‌-এ, বাইরের ক্ষেত মজুরের কাজে, নাহয় সোনাই মুণ্ডা বা অন্যান্য কাঠমহাজনদের কাজ করেই অন্নসংস্থান করতে হবে। বনের স্বাধীন জীবনের দিন এবার ফুরিয়েছে। চুপ করে থাকে ফরেষ্টার ভদ্রলোক।

চারিদিকে জনতার ভিড় বাড়ছে। ওদের মধ্যে উত্তেজনাও বাড়ে। বোরাই সর্দার বলে—ইয়ার জবাবটো দে বাবু ?

কুইলি ওদিকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। ও বুঝেছে এসব খবর কে দিয়েছে ওদের! রাগে যেন ফুলছে মেয়েটা।

সোনাই মুণ্ডাও এসব ব্যাপার বেশীক্ষণ চলতে দিতে চায় না। ইদানিং সে দেখেছে এদের মধ্যে প্রতিবাদের একটা চাপাপড়া আগুন

ধুঁইয়ে উঠেছে, তাই সে এবার চেষ্টা করেই গোপনে এদের মধ্যে থেকে মুরুংকে সরাবার ব্যবস্থা করেছে। ওই ছেলেটাই এখানে এদের মনে এনেছে প্রতিবাদের কাঠিন্য। ওর সাহস সোনাইকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

বন অপিসের কত্তাদের গোপনে সোনাই মুণ্ডাই খবরটা দিয়েছে, মুরুং-এর সাহসই তাকে এই পথ নিতে বাধ্য করিয়েছে। তার মেয়েকেও ঐ মুরুং হাতে করেছে। সোনাই মুণ্ডা তাই মুরুংকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

তবু বলে সোনাই—আইন মত ওরা কাজ করবেক, আমরাও আইন মতই এর জবাব দিব। এ্যাই যে—এসে গেছিস মুরুং!

মুরুং এখানে ভিড় দেখে চাইল। ওরা সকলেই যেন তার পথ চেয়েছিল। ওকে দেখে ফরেষ্ট অফিসার শুধোন—তুমিই মুরুং মুণ্ডা?

মুরুং খাঁকি পোষাক পরা অফিসার তার সঙ্গের লোকজন—ত্ন'জন বন্দুকধারী কনষ্টেবলকে দেখে একটু অবাক হয়। লোকজনদের সকলেই ওকে দেখছে। মুরুং জানায়—হঁ ত কি! আমিই মুরুং—কিস্কে বটে হে?

অফিসার ভদ্রলোক বলেন

—কদিন আগে ওই বারোসিঙ্গাটাকে তুমি মেরেছিলে? একটা বাঘকেও মারার চেষ্টা করেছিলে?

মুরুং বলে ওঠে—হঁ! কুলাটো ঝাঁপাই ছিল তাই ভাল্লা ছোড়লাম—তা সিটো পালাই গেল, বারোসিঙ্গাটোকে গেঁথে গেইল বটে! আমিই গাঁথলম পরবের দিন।

—জানো বনের জন্তু মারা বেআইনী? অফিসার ভদ্রলোক পকেট থেকে আদিবাসী ভাষায় লিখিত সার্কুলারটা বের করে শোনাতে থাকেন সকলকে।

—আবহ ভারত সরকার বীর.জিয়ালি বাঞ্চাও আইন (১৯৭২) লেকাতে বায়মা লেকান বীর জানোয়ার চেঁড়ে চিলুরুৎ সেন্দরা আর গর সানাম লেকাতে বেআইনি কানিকানা মেনতে লেখাঃ আ। অন্যতে ধাঁহায়াকা নোআ সেন্দরা রেপে সেনেদঃ আ উনকুদ বীর

জিয়ালিক গর লেকোখান অনাদ নীহাঃ আইন লোকাতে দণ্ডনীয় হোয়োঃ আ।

তুমি ওই আইন অমান্য করে বারোসিঙ্গা হরিণ মেরেছো—তাই তোমাকে ওই অপরাধে এ্যারেষ্ট করা হলো।

স্তব্ধতা নেমেছে অরণ্যভূমিতে।

এই প্রথম একজনকে ওদের ডুংরি থেকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আইন অমান্য করার অপরাধে!

বোরাই সর্দার অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—না। উ যাবেক নাই। উকে লিতে পারবা নাই!

জনতাও এবার গর্জন করে—না! দিব নাই!

আদিবাসী জনতা যেন গর্জে উঠতে চায়।

কনষ্টেবল দু'জনও এবার তৈরি।

সোনাই মুণ্ডা কি বলার চেষ্টা করে। কলরব ছাপিয়ে তোকি বুড়ির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে।

—তুরা কি মরে গেছিস? তুদের ছামু থেকে মুরুংকে লে যাবেক?

মুরুং লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। একটা গোলমালই হয়ে যাবে। ওরাও বন্দুকের গুলি ছুঁড়বে! রক্তারক্তি হবে। আর তারপর ওই দিখুরা দলবেঁধে এসে এই বসতকে তছনছ করে দেবে। সর্বনাশ হবে এদের।

তাই মুরুং বলে—চুপ কর, চুপ কর তুরা!

জনতা ওর কথায় স্তব্ধ হয়। সবাই শুনতে চায় মুরুং-এর কথা। মেয়েদের মধ্যে কার চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। মুরুং বলে।

—তুরা চুপ করে থাক। আমি উদের সাথেই যাবো, আমার জন্যে ভাবিস না তুরা। গোলমাল করলে উরো গুলী চালাই দিবেক। ইসব এখন করবি নাই চুপদে তুরা।

অফিসার ভদ্রলোক দেখছেন মুরুংকে। অস্ফুট চাপা গুঞ্জরণ ওঠে জনতার মাঝে। মুরুং বলে ফরেষ্ট অফিসারকে।

—চলুন, কোথায় যেতে লাগবেক।

মুরুং সোজা গিয়ে জীপে উঠলো। ওরাও বেশীক্ষণ এখানে থাকতে চায় না। বনের পথ। আদিবাসী বসতিগুলোর খবর হয়ে গেলে গোলমাল বাড়তে পারে। ওরা জীপে তাই বনের ভিতরের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিছনে কলরব করে জনতা। কেউ এগিয়ে যায়।

ভিড় কমে আসে সোনাই মুণ্ডার বাড়ীর এদিকে। আবছা সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে বনে বনে। দুচারটে বনটিয়া কলরব করে যেন প্রতিবাদ জানিয়ে গেল।

এখানে ওখানে তবু কিছু মানুষ অন্ধকারে জটলা করছে, চাপাস্বরে কি বলাবলি করছে। ওদের সামনে দিয়ে মুরুংকে ওই দিখুরা নিয়ে চলে গেছে।

সোনাই মুণ্ডা হঠাৎ কাকে দেখে চাইল।

কুইলি এতক্ষণ চুপ করে ব্যাপারটা দেখেছে। সেও জানে ওর বাবার রাগের কারণটা। মুরুংকে আজ ধরিয়ে দেবার মূলে কে, তা কুইলির অজানা নয়। কারণ বনের হরিণ, সম্বর, কটরা, এরা এখনও মারে। বনবরাও মারা পড়ে এদের হাতে।

কিন্তু মুরুং-এর মত কাউকে ধরে নিয়ে যায়নি। এটা ঘটল আজ প্রথম। কুইলি বাবার দিকে চাইল। হঠাৎ কুইলি দৃপ্তস্বরে বলে।

—ইটা কি করলি তুই ?

কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কুইলি।

সোনাই মুণ্ডা মেয়েকে দেখে কি বলতে গিয়ে থামলো। ওর কান্না থামাতেও পারে না সে।

সোনাই মুণ্ডার মনে হয় নিজেই যেন কোথায় সে দুর্বল হয়ে গেছে। হয়তো একটা ভুলই করেছে।

তার নিজের অনেক দোষই এমনি রাত-নির্জনে নিজের স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে ওর কান্নার সামনে।

কিন্তু সোনাই মুণ্ডা তবু নিজের মনেই জোর খুঁজে পেতে চায়। এসব দুর্বলতায় টলবে না সে।

সামনে তার অনেক কাজ। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হবে।

জীপটা চলছে ঘন বনের বুক চিরে। সামনে আকাশ ছোঁয়া কিরিবুরু পাহাড়শ্রেণী, ঘন বন এখানে। ধরমপাদা অঞ্চলের বন বিখ্যাত, বুনো হাতির পাল, বাইসনের দল এখানের গভীর বনে সপরিবারে বাসা বেঁধে থাকে। জীপের শব্দে সচকিত হয়ে নেমে আসে দুতিনটে সম্বর। মেটে মেটে গায়ের রং—বোকা বোকা চেহারা। উৎকীর্ণ হয়ে বনের গভীরে লাফ দিয়ে সরে যায়।

মরুংকে যেন চোখ মেলে দেখছে ওরা।

জীপটা ধরমপাদা বন-বাংলোয় এসে থামলো। তখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। বিরাট শালগাছগুলো তীরের মত সোজা উঠে গেছে। নীচের মাটিতে ভিজে ভিজে ভাব। বুনো হাতি বাইসন-এর দল নামে পাহাড় থেকে। জিপটা সাবধানে চলেছে ঘন বনের বুক চিরে, এক ফালি রাস্তা দিয়ে।

টিলার উপর বাংলোটা। এই বিস্তীর্ণ বনের মাঝে মাঝে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ওদের বাংলো গড়ে তুলেছে কোন্ বন-অপিসকে কেন্দ্র করে।

গাছ কাটাই-এর ব্যবস্থা করা হয় এখান থেকে—আর বনে নোতুন গাছও লাগানো হয়। মধ্যপ্রদেশের লাগোয়া অঞ্চল, সেগুনও ভাল হয় এখানে। তাই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সেগুন প্ল্যাণ্টেশনও হচ্ছে।

........সামনে ধরমপাদার ছোট্ট বসতি। দু-চার ঘর মুণ্ডা-হো-ওরাঁও কয়েকজন ভুঁইহার মাহাতোও বসবাস করছে এখানে। চারিদিকে গভীর বন—আর পাহাড়। এই জায়গাটুকু যেন বাটির মত গভীর, সেই গভীরে সামান্য কিছু ক্ষেতি—জনবসত। বিস্তীর্ণ বনসীমার মধ্যে একবিন্দু বসতটুকু আগামী সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে যায়। অন্ধকার নামে, জমাট অন্ধকার। জোনাকি জ্বলে।

জীপের হেডলাইট জ্বলছে—রহস্যাবৃত বনের গভীর অন্ধকারে

জীপটা চলেছে বাংলো থেকে বের হয়ে গুয়া, বড়জামদার দিকে। একটা বড় ঝোরার জল বয়ে চলেছে।

এ নদীর নাম জানে মুরুং। কয়না এর নাম। নদীটি তাদের বসতির পাশ দিয়ে চলেছে, এর জলে ওদের জমিতে চাষ হয়। সবুজ হয়ে ওঠে বনের অনেক উপত্যকা, ধরমপাদা—তাদের বসতি এই ক্ষীরধারায় পুষ্ট।

পাথরে পাথরে জল ছিটকে চলেছে। জীপটা কোনরকমে টাল-মাটাল খেয়ে চলেছে ওপারের দিকে। হঠাৎ মুরুং-এর চোখে পড়ে উজ্জ্বল আলোর ঝলক।

আকাশের বুক থেকে থাকে থাকে নেমে এসেছে ওই আলোর মালাগুলো। স্তব্ধ বনের বাতাসে ওঠে যন্ত্রের কর্কশ শব্দ—পাহাড় বন কেঁপে ওঠে। যেন একটা দৈত্য দাঁত দিয়ে কড় মড় করে ওই লোহা-পাথরগুলোকে চিবুচ্ছে, ওর বিরাট দাঁতে এই বনের গাছগাছালি, ওই পাহাড়, পাথর সবকিছুকে পিষে কামড়ে গুঁড়ো করে দেবে।

মুরুং অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাদের বনের গভীরের সীমিত পরিবেশের বাইরে সে এদিকে আসেনি, জানতো না এমনি কর্মকাণ্ডের বিষদ সংবাদ, শুনেছিল মাত্র বনের বাইরের পাহাড়গুলোকে ফাটানোর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। তাদের ওখান অবধি কাঁপতো বনভূমি। ওরা চমকে উঠতো সেই গুরু গুরু শব্দে।

কিন্তু এখানে যে এতবড় কাণ্ড চলেছে তা ভাবেনি মুরুং। বন-পাহাড় হানা দিয়েছে কোন দানবের দল।

জীপটা এসে পাহাড়ের নীচে একটা গেটে দাঁড়িয়েছে। বনের অন্ধকার বিজলীর আলোয় এখান থেকে সরে গেছে।

এককালে ছিল আদিম অরণ্য, ওদিকে কুদরো বোঙার থানও ছিল। করমগাছটার নীচে পাথর কয়েকটা পড়ে আছে, মাটির হাতি ঘোড়াগুলো চূর্ণ—ছড়ানো। ওখানে সিমি মুরগী বলি দেয় না আজ কেউ। আদিবাসীদের ঝুপড়িগুলোও মুছে গেছে, গজিয়ে উঠেছে টিনের শেড। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে কয়েকটা বড় বড় গাড়ি

রয়েছে বুড়ো-বোঙাকে আজ ওরা হটিয়ে দিয়েছে।

ওই দিখুরা বনের এদিকটা দখল করে নিয়েছে। এককালে হাতি, বাইসন, বনের হরিণ আসতো এদিকে ডুংরির মানুষও বাস করতো, সব আজ হারিয়ে গেছে।

...উঁচু পাহাড়ের বুকে পেঁচিয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। ধাপে ধাপে ওই আকাশছোঁয়া পাহাড় থেকে নেমে এসেছে টিনের ছাউনি দিয়ে ঢাকা কনভেয়ার বেল্টটা। ওতে গড়িয়ে আসছে পাহাড়ের উপরে ক্রাশার প্ল্যাণ্ট থেকে চুরমার-করা লোহাপাথরগুলো নীচের রেল লাইনে সারবন্দী ওয়াগনগুলোয় এসে পড়েছে।

একটা তীব্র শব্দে চাইল মুরুং। লম্বা পিঁপড়ের সারের মত মাল-গাড়িতে লোহাপাথর বোঝাই হয়ে পারাদ্বীপ চলেছে, সেখান থেকে জাহাজে যাবে।

মুরুং চাইল ওর দিকে। কোথায় কতদূরে পারাদ্বীপ—সেখানে সমুদ্র হয়ে কোথায় যাবে তারই দেশের এই পাথরগুলো তা জানে না। তবু মনে হয় বিরাট একটা লোভী হাত তাদের এই বনপাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। আর ওই লোভী থাবাটার সামনে অজানা ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে এই জগৎ। ওই বিরাট যন্ত্রগুলো এগিয়ে যাবে বনের গভীরে মুরুং-এর ভালোলাগা ওই অরণ্যজগৎ—তাদের শান্ত বসতি, ফুলফোটা বনভূমি সব হারিয়ে যাবে।

একটা চক্রান্ত চলেছে তারই।

....জীপটা পাক দিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে, রাত্রি নেমেছে। বাঁ পাশে বিরাট বিস্তীর্ণ দিগন্তজোড়া বন-রাজ্য। চাঁদের আলোয় দেখা যায় সেখানে নেমেছে সুপ্তির প্রশান্তি আর বিরাট পাহাড়টার এদিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা—সেখানে অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা, দূরে—বহুদূরে দেখা যায় সেই আলোগুলো। এ যেন এক কর্মব্যস্ত জগৎ। নোতুন জগৎ!

এই কিরিবুরুর বন-পাহাড়সীমা এতদিন যেন ওই দিখুদের লোভী

হাতের থাবাটাকে আটকে রেখেছিল তার বাধাপ্রাচীর দিয়ে ; কিন্তু মুরুং দেখছে কিরিবুরুর শিখরে আজ তারা এসে আসন কায়েম করেছে।

একদিন এই পাহাড়ের মাথায় ছিল ঘন শালবন। এখানের জলায় জমা হোত বনের প্রাণীরা, মেঘগুলো এসে শালবনে সাদা কুয়াসার ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে জড়িয়ে যেতো, নামতো বর্ষার ধারা।

আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় বাংলো, বিরাট কারখানা। বিজলীবাতির আলো ঝলমল করে সাজানো। দোকানে রেডিওতে বাজে গানের উছল সুর। একদিকে ওই আদিগন্ত বিস্তৃত বনরাজ্যে ! এবার লোভী মানুষগুলো যেন যন্ত্রদানবদের নিয়ে হানা দেবে ওই শান্ত বনরাজ্যে।

এ খবর বোরাই সর্দার, তোকি বুড়ি—তাদের ডুংরির লখাই ওরা জানে। সোনাই মুণ্ডা—টুয়াই, ধূর্ত মুনিমজী তাই তারাও অন্যের সবকিছু কেড়ে নিয়ে দখল করবে জোর করে !

জীপটা চলেছে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে, ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়টা দূর পথ পাড়ি দিয়ে ওই সমতলের দিকে। মেঘগুলো এখনও পথ ভুলে কিরিবুরু পাহাড়ের গাছের মাথায় এসে হারিয়ে যায়। দমকা বাতাসে বৃষ্টি নামে। ঘনকুয়াসার আবরণে জীপটা যেন পথ হারিয়ে যায়, সামনে ওদের সাদা জমাট যবনিকা। জীপটা অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে চলেছে।

ফরেষ্ট অফিসার ওকে নিয়ে এসেছেন অফিসে।

প্রথম থেকেই ছেলেটাকে বিচিত্র লাগে তার। তিনি ভেবেছিলেন বনে হয়তো তারা বাধাই পাবে। তাই তৈরি হয়ে গিয়েছিল হাতিয়ার নিয়ে, কিন্তু অবাক হয়েছে—ছেলেটাই ওদের সব গোলমালের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজে চলে এসেছে। কোন বাধাই দেয়নি। তবু তাকে থানাতে নিয়ে যেতে হয়েছে।

থানা অফিসার সব শুনে বলেন,

—ছেলেটাকে কোর্টে হাজির করতে হবে। আরে মশাই, বনের

হরিণ না হয় মেরেছে একটা, ওসব ব্যাপার চেপে গেলেই পারতেন। অকারণ ঝুট-ঝামেলা করলেন। ওরা রেগে গিয়ে দেখুন গে এবার হরিণ সম্বর মেরে শেষ করবে—টেরও পাবেন না।

ফরেষ্ট অফিসারের এই ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া পথ ছিল না, কারণ সোনাই মুণ্ডার উপরওয়ালাদের সঙ্গেও জানাশোনা আছে, খবরটা দিয়েছিল সেইই এবং টুয়াইকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল এর বিহিত এঁরা না করলে সর্দারই বনদপ্তরের কর্তাদের খবর দেবে। এ ছাড়া ফরেষ্ট অফিসারও সোনাই মুণ্ডার কাছে নানা ভাবে কৃতজ্ঞ। তাই সোনাই-এর প্রয়োজনে এটা করতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু এসব কথা খুলে খোল্‌সা করে বলা যায় না। তাই ফরেষ্ট অফিসার জানান।

—খবর পেয়ে চুপ করে থাকি কি করে বলুন? স্টেপ তো নিতেই হবে।

থানা অফিসার কি ভেবে নিয়ে বললেন—ঠিক আছে। কাল সদরে পাঠিয়ে দেব। আজ রাতটা লক্‌আপেই থাকুক।

কনেষ্টবলের ডাকে মুরুং-এর চমক ভাঙ্গে।

—চল্ বে। উধার চল্।

মুরুং এতক্ষণ ধরে এই আলোভরা জগতকে দেখছিল। রাস্তাঘাটে লরি, বাস, জীপ দৌড়চ্ছে, ওদিকে রেললাইন থেকে ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা যায়।

সহরে দিনরাতই লোক চলে, গাড়ি যাতায়াত করে। এখানে যেন ঘুমোয় না কেউ। তাদের ডুংরিতে বনে বনে এখন জমাট আঁধার নেমেছে। আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করে। ওই তারাগুলোকে এখানে সব খুঁজেই পায় না।

মুরুং-এর মনে পড়ে বোরাই সর্দার, তোকি বুড়ির কথা। বুড়িই ছেলেবেলা থেকে তাকে মানুষ করেছে।

আসার সময় দেখেছিল মুরুং ওদের চোখে জল, মুখে ফুটে উঠেছে

কঠিন রেখাগুলো। কিন্তু মুরুং ওই প্রিয়জনদের বাঁচানোর জন্যই নিজে এসেছে এদের সঙ্গে। নাহলে এরাও বাধা দিতো, গুলী চালাতো।

···সোনাই মুণ্ডার মুখে চাপা খুশির আভাটাও দেখেছিল মুরুং। আজ বুঝেছে মুরুং এসবের মূলে কে। তাই বার বার কুইলিকে খুঁজেছিল মুরুং দুচোখ মেলে ওই ভিড়ের মধ্যে, তাকে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল মাত্র।

সেই রাত্রের নিভৃত মুহূর্তগুলো মুরুং ভোলেনি। তার জীবনে ওই কুইলি একটা পরম পাওয়ার ইঙ্গিত এনেছিল, ভালোবেসেছিল মুরুং ওই কুইলিকে। তাই তার জন্যেই আজ তাকে এভাবে দাম দিতে হয়েছে।

আসার সময় দূর থেকে দেখেছিল কুইলিকে। মেঘনানা থমথমে মুখ, দুচোখে তার জল নেমেছে। অপরাধীর মত চেয়েছিল তার দিকে কুইলি কি বেদনাতুর চাহনি মেলে। সে চাহনিতে ছিল ব্যাকুলতা, হয়তো জ্বালাও।

মুরুং কোন কথাই বলার সময় পায়নি। জীপটা তাকে নিয়ে ঘন বনের ঢালু পাহাড়ীপথে নেমে গিয়েছিল।

—হিঁয়াই রহেগা রাতমে। কনষ্টেবল ওকে বলছে।

মুরুং-এর এসব কথা যেন ভাবার অবকাশ নেই। লোকটা মুরুংকে লোহার শিকলাগানো দরজা খুলে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সেবার দেখেছিল ফরেষ্টের লোকদের বনে একটা বাঘ ধরতে। ফাঁদ পেতে বাঘটা ধরেছিল ওরা, অবশ্য মুরুংকেও সেই অভিযানে যেতে হয়েছিল। ভরজোয়ান ডোরাকাটা তাজা বাঘটাকে লুকোনো গর্তে ফেলে ধরার পর তাকে শিকলাগানো একটা খাঁচায় পুরেছিল। বন্দী বাঘটা খাঁচার ভেতর চাপা গর্জন করে, থাবা দিয়ে আঘাত করে শিকগুলোকে ভাঙ্গার চেষ্টা করে চলেছে।

সেই চাপা গর্জন যেন এখনও মুরুং শুনতে পায়। ওরাও তাকে

বন থেকে বন্দী করে এনে তেমনি লোহার শিকওয়ালা গারদে পুরে আটকে রেখেছে। বন্ধু বান্ধব, চেনা জানা কেউ নেই, এমনি, কোন নোতুন বনরাজ্যে হারিয়ে গেছে সে।

ঘুম আসে না, মুরুং বসে আছে। এখানে হাওয়া নেই, মুক্ত বাতাসও এখানে বন্দী, আকাশের তারাগুলোও দেখা যায় না। বুকচাপা জমাট অন্ধকারে বসে আছে মুরুং।

আজ যেন নোতুন করে সে ভাবছে, তার সামনেও অমনি জমাট অন্ধকার।

কনে.আসে ঝোরার ঝর ঝর শব্দ, পাখীর ডাক মিশেছে ওর সঙ্গে। পাতা থেকে ঝরে পড়ে টুপ-টাপ ছন্দে রাতের জমা শিশিরবিন্দু। দূরে পাহাড়ে একটা কটরা হরিণ ডেকে উঠল তীক্ষ্ণস্বরে। কুইলি আর মুরুং এসে দাঁড়িয়েছে ঝোরার ধারে, কুয়াসার চাদর জড়ানো বনভূমি। কটরার ডাকটা ভেসে আসছে।

কুইলি ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে—বাঘ না তো?

হাসে মুরুং, ওর হাতে টাঙ্গিটা ধরা। মুরুং বাতাসে কিসের গন্ধ নিয়ে বলে—না রে! বেচারা কটরাটা সাথীকে ডাকছে—

হেসে ওঠে কুইলি। বনের হরিণের কালো চোখের গভীরতা ওর চাহনিতে।

কুইলি বলে—ইখান থেকে চলে যাই মুরুং, হুউ কিরিবুরু গুয়া পার হয়ে পাহাড় ছাড়িয়ে দিখুদের মুলুকে। কাজ কাম করবো দুজনে, ঘর বাঁধবো—

…কি ভাবছে মুরুং। দুজনে সেখানে নতুন করে বাঁচবে। তাদের ডুংরির মদনও গেছে উদিকে কোথায়! এমন অনেকেই এখন চলে যাচ্ছে এখন এই অরণ্যবসত ছেড়ে ওই পাহাড় পার হয়ে। কুইলির চোখে কি আমন্ত্রণ—ওর নিটোল দেহের স্পর্শ যেন মাতাল করে মুরুংকে।

—এ্যাই! কুইলি ডাকছে তাকে।

হরিণের ডাকটা ব্যাকুলতর হয়ে শোনা যায়, আরও স্পষ্ট আরও তীক্ষ্ণ স্বরে। বাতাসে উঠে বনচাঁপার তীব্র সুবাস।

হকচকিয়ে ওঠে মুরুং!

…চোখ মেলে অবাক হয়!

কোথায় সারান্দার বনভূমি—ঝোরার শব্দভরা পরিবেশ! হারিয়ে গেছে সেই জগৎ তার জীবন থেকে, কুইলিও নেই।

বদ্ধ ঘরের মেঝেতেই পড়ে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গেছে রেলইঞ্জিনের তীব্র বাঁশির শব্দে। সকালের আলো দেখা যায় দরজার ফাঁক দিয়ে, একটা বেঁটে বটগাছের পাতাগুলো ঝলমল করছে সেই রোদে, কয়েকটা কাক কর্কশস্বরে ডাকছে। সে এখানে বন্দী, বনের জীবনের স্বপ্ন তার হারিয়ে গেছে আজ। এ দেশটা কত বড় কত বিরাট এই ধারণাটা ক্রমশঃ মুরুং-এর মনে জাগে।

পরদিন সকালে ওকে জীপে করে পুলিশের লোক সদরে নিয়ে চলেছে। কতদূর তা জানে না।

জীপটা চলেছে, ওপাশে দেখা যায় তখনও বনের গভীরতা, মাথা তুলে আছে কিরিবুরু বোলানী ঠাকুরানী পহাড়গুলো। এবার খেয়াল করতে পারে মুরুং ওই আকাশছোঁয়া পাহাড়ের টানা রেখার ওদিকে তাদের মুলুক। ঘন বনচ্ছায়া ঢাকা নির্জন জগৎ। তাকে ওই জগৎ থেকে আরও দূরে নিয়ে চলেছে।

যেন তার ঘর, তার বন—কুইলি, বোরাই সর্দার—তার বন্ধুবান্ধব সব কিছু থেকে তাকে ওরা টেনে হিঁচড়ে দূরে নিয়ে চলেছে।

জীপটা নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে যাচ্ছে চাঁইবাসার দিকে। ওদিকে দেখা যায় পাহাড়ের বুক থেকে ওরা তুলছে কালচে লোহাপাথর, বিরাট কলে সেগুলো এসে পড়েছে, রেল লাইনে তীব্র শব্দ তুলে একটা মালগাড়ি চলেছে।

আঁতকে ওঠে মুরুং! আদিবাসী পুলিশ বলে।

—ডরাবার কুছু নাই হে। টেরেণ বটে!

অবাক হয়ে দেখছে মুরুং—লম্বা কেঁচোর মত সার ধরে গাড়িটা চলেছে। ওর বুকে বিরাট কাঠের গুঁড়ির টাল, শালপাতার পাহাড়, বিড়ি পাতার বোরা, আর লোহাপাথর।

গাড়িতে করে সারান্দার অরণ্য পর্বত লুট করে ওরা সবকিছু নিয়ে চলেছে। ক্রমশঃ বুঝছে মুরুং ওই দিখুরা কেন তাদের জঙ্গলে পাহাড়ে হানা দেয়, ওই সব লুঠ করার জন্যেই সোনাই মুণ্ডার মত লোককেও দিখুদের দরকার।

আর তারা বাধা দিতে চায় সোনাই মুণ্ডাকে, তার কাজগুলোকে এরা সমর্থন করে না। তাই বোধহয় ওকে এমনি খাঁচায় বন্দী করার মত অবস্থায় দূরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে অন্য কোন একজগৎ-এ।

মুরুং দেখছে সবকিছুই।

সামনে একটা সমৃদ্ধ জনপদ। জগন্নাথপুর।

দোকান পশার আছে, আর এখান থেকেই মানুষের গড়া জনপদ—তাদের চেষ্টায় মাটিকে ফলবতী করার কাজ শুরু হয়েছে। ধানক্ষেত, যতদূর চোখ যায় সবুজ, স্তরে স্তরে নেমে গেছে। সোনালী, ধানের মঞ্জরী মাথা নোয়ান দিয়েছে মাঠজুড়ে।

....মুরুং দেখছে বাঁচার চেষ্টাটাকে এরা একমুখী করেছে। মাটি থেকে আহরণ করেছে সম্পদ, সেই সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ ছিল এককালে যাযাবর। বনের যেখানে শিকার মিলতো—ঝর্ণার জল মিলতো, সেখানেই ডেরা বাঁধতো। মাটিকে ফলবতী করার চেষ্টা করেনি।

মেয়েদের কেউ কেউ দুচার দানা মকাই, কদু-কুমড়োর চাষ করতো। সেটা ছিল সামান্যই।

বাঁচার জন্যে আজ তাদেরও রীতি বদলাতে হবে এই দিখুদের মতই। নাহলে ওই অরণ্য গহনে উপবাস দিয়েই তাদের মরতে হবে, আর সোনাই মুণ্ডার মত লোভী মানুষের হাতে তাদের সব হারিয়ে যাবে। মায় অরণ্যভূমিটুকু অবধি একদিন এমনি রুক্ষ, বন্ধ্যা প্রান্তরে পরিণত হবে। সেদিনের দেরী নাই।

মুরুং আজ নতুন করে দেখছে সবকিছু।

লোকালয়ে এসে একটা দোকানের সামনে জীপটা দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিনে জল দিচ্ছে, নিজেরাও চা খাবার সময় ওকে নিয়ে নেমেছে—চল, চা খাবি।

দোকানে বড়া-চপ-লিট্টিই ভাজা হচ্ছে। গরম লিট্টিই ভালো লাগে মুরুং-এর। শক্ত ছাতুর পুর দিয়ে ভাজা বস্তুটা। গোটা চারেক খেলে খিদেটা চাপা পড়ে। তাই খেয়ে চা-ও খেল মুরুং।

আদিবাসী ছোকরা কনেষ্টবলটির বাড়ি ও সারান্দার অন্যদিকের বসতিতে। সে মুরুংকে আড়ালে বলে।

—ধরা দিলি কেনে? ভারি তো একটা হরিণ মারলি পরবের দিন। পালাই গেলিনা কেনে?

মুরুং ওর দিকে চাইল। ও জানে না কেন মুরুং নিজেই ধরা দিয়েছিল। ধরা না দিলে মারামারিই বেধে যেত। তীর কাঁড় বল্লম ভল্লা নিয়ে ওরা রুখে দাঁড়ালে বসতিতে আগুন জ্বলে যেতো।

এরাও গুলি চালিয়ে মেরে ফেলতো তার জাত, জিয়াতদের। তাদের বাঁচাবার জন্যেই মুরুং ধরা দিয়েছে। একাই এ শাস্তি নিতে চলেছে সে।

কথাটা জানাতে সেও মাথা নাড়ে।

—ঠিকই করেছিস! নে।

ওর দিকে দুটো বিড়ি এগিয়ে দেয় ছেলেটি। কনষ্টেবল ছোকরার নামটাও জেনেছে মুরুং। রবি ওর নাম। কেমন ভালো লাগে মুরুং-এর ছেলেটিকে।

রবি বলে—দিখুরা এমনিই রে! তাই আমাদের কোণে ঢুকাইছে। তুকেও জেলে দিবেক।

মুরুং ওসব ভাবে না আজ। নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে কোনদিনই ভাবেনি। তবু মনে হয় এই বিরাট পরিবেশে এসে সে অনেক কিছুই দেখেছে, আরও দেখবে। হয়তো বনের বসতে ফিরে যাবে নতুন চেতনা নিয়ে, এরও প্রয়োজন ছিল।

জীপটা এগিয়ে আসে চাইবাসা শহরে। মুরুংকে একটা বড় হল ঘরে নিয়ে গিয়ে কি সব লিখে তার আঙ্গুলের টিপছাপ লাগিয়ে এবার প্রাচীরঘেরা বিরাট একটা সীমানায় নিয়ে যায়। এদিকে ওদিকে অনেক ঘর, তার একটায় আরও তিনজনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তাকে।

এর নামই বোধহয় হাজত ঘর।

রবি হো তখনও রয়েছে। সে বলে—কাল তুকে কোর্টে লিয়ে যাবেক, বিচার হবেক।

বিচার হবেক? মুরুং-এর কাছে আজ ওসব যেন পরিহাসে পরিণত হয়েছে। বলে সে।

—তাই হোক! যা খুশী করুক উরো।

রবি কঠিন ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে।

বনের গভীরে এই সবখবর পৌঁছে না। এখানে ওই পাহাড়ের সীমা পার হয়ে ঘন বনের দীর্ঘ দুর্গম-বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে বাইরের জগতে কোন চাঞ্চল্যই এসে পৌঁছে না।

ঐ জগৎ আপন স্বপ্নে মশগুল। প্রকৃতি এখানে নিজের খেয়ালে দিন রাত্রি সন্ধ্যা সকালগুলোকে সাজিয়ে তোলে। প্রথম সূর্যের রক্তিম আভাস জাগে পাখীর ডাকে, পাতায় পাতায় টুপটাপ শিশিরবিন্দু ঝরে, বনের গহনে হরিণগুলো উৎকর্ণ হয়ে শোনে ঝরাপাতার মর্মর।

গুহার মধ্যে বিরাট ডোরাকাটা বাঘটা আড়িমুড়ি ছেড়ে আবার গড়িয়ে পড়ে কি আলস্যে।

বাঁশ, বুনো কলার বনে বাতাসে ঝড় ওঠে। ঝর্ণার জমা জলে হাতির পাল নামে, শুড় কলমীর বুনো দাম—হলুদফুল সমেত টেনে টুনে মুখে পুরে চিবুতে থাকে হাতির বাচ্চাগুলো। ধাড়ি হাতিটা গায়ে তরুণ শাল গাছ ঠেকতে বিরক্তি ভরে সেটাকে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে পাতাগুলো চিবুতে থাকে।

অবাধ্য কোন তরুণ দাঁতালকে শাসায় ভারিক্কি দলপতি হাতিটা শুঁড় তুলে তীক্ষ্ণ চীৎকারের ভাষায়।

বনের গভীরে ছায়া-অন্ধকার নামে, বাতাসে ওঠে ভিজে ভিজে গন্ধ। সেই গন্ধ ছাপিয়ে হঠাৎ কি একটা উৎকট গন্ধ শুঁকছে সম্বরটা। কালো ভীত ত্রস্ত চোখ মেলে দেখছে চারিদিকে।

শিংগুলোয় সোনালী আলে কলতা জড়ানো, কচি পাতা চিবুনো বন্ধ করে চোখ তুলতেই সামনে দেখেছে বিরাট হলুদ ডোরাকাটা বাঘটাকে।

হলুদ-পিঙ্গল দুচোখ অন্ধকারে জ্বলছে, গলা দিয়ে চাপা শব্দ বের হয়—গর-র-র।

বাঘটার দুচোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ওই সম্বরটার দিকে।

ওই চোখের চাহনির তীব্রতা দিয়ে সম্বরটাকে আটকে ফেলেছে সে। হতভম্ব সম্বরটার নড়ার সাধ্য নেই। পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গভীরভাবে আটকে গেছে। মোহমুগ্ধ মৃত্যুর সামনে সেও নীরবে আত্মসমর্পণ করেছে।

হলুদ ল্যাজটা ঝাপটাচ্ছে ভিজে মাটিতে। তার পরই বাঘটা হাওয়ায় ভেসে ওঠে, চক চক করে ওর দাঁতগুলো, এক লাফে এসে পড়েছে সম্বরটার উপর, চারটে থাবা দিয়ে ওর পিঠ-কাঁধ ফালা ফালা করে গলাটা কামড়ে ধরে।

...অস্ফুট আর্তনাদটা থেমে যায়, স্তব্ধ বনের পাতায় ওঠে ধস্তাধস্তির শব্দ, মাটি পাতাগুলো রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ওই রক্তের আখরে আরণ্যক জীবনের একটি অধ্যায় রচিত হয় এই অরণ্যে।

তবু বাঁচার জন্য চেষ্টা শেষ হয় না। সব দুঃখ আঘাত সহ্য করে বিয়োগ ব্যাথাকে মেনে নিয়ে এ বনের প্রাণীবসতের মানুষগুলোও বেঁচে থাকে।

কতদিন হয়ে গেল মুরুং এখান থেকে চলে গেছে দিখুদের মুলুকে। তোকি বুড়ি কোলে পিঠে করে ছেলেটাকে মানুষ করেছিল। সেই বুড়ি এখনও ভোলেনি তাকে। মাঝে মাঝে তোকি বুড়ি বসতির বাইরে এসে বনের দিকে চেয়ে থাকে। লাল মাটির পথটা বন থেকে বের হয়ে এসেছে। দিগন্তে দেখা যায় আকাশছোঁয়া পাহাড়গুলো, ওই

পাহাড় টপকে বনের পথ ধরে কোনদিন হয়তো ছেলেটা আবার ফিরবে এই বনবসতে।

কিন্তু বুড়ির পথ চাওয়াই বৃথা হয়।

মুরুং ফেরেনি তখনও, ঘোলাটে দুচোখ ছেয়ে জল নামে।

বোরাই সর্দার জড়িজুটি, বুনো লতা খুঁজতে যায় বনের গভীরে। সেও দেখেছে তোকি বুড়িকে পথ চেয়ে থাকতে। বোরাই সর্দার বলে। —সি ফিরবে নাই রে। ওই দিখুরা তাকে ফিরতে দিল নাই খ! কান্দিস কেনে? চখের জল ফেলতে নাই।

বুড়ি চুপ করে বসতিতে ফেরে।

সোয়ী দেখছে সব ব্যাপারটা। মুরুং ক্রমশঃ যে ভাবে মাথা তুলছিল তাতে এমনি সংঘাত একটা বাধতোই। আর সোয়ীও ভয় করতো ছেলেটাকে। সে বুঝেছিল তার সঙ্গে সোনাই মুণ্ডার ওই মেলামেশাটা অনেকেই পছন্দ করছে না। দু'একদিন তোকি বুড়িও মদ গিলে এ নিয়ে চিৎকার করে অনেককেই বলেছিল। সোয়ী দেখেছিল তার অক্ষম অপদার্থ ওই বিকৃত চেহারার মরদ মতিও এনেছিল প্রতিবাদের জ্বালা।

ডুংরির অনেকেই বলতে শুরু করেছিল, সাসানীতে নালিশও করবে। শাস্তি দেবার, আঘাত করার ব্যাপারটাকে ভালো চোখেই দেখেছিল। খুশী হয়েছিল মনে মনে।

তবু একটা চালে তার ভুল হয়েছিল। কুইলিও তার পথের কাঁটা। সে চেয়েছিল কুইলি মুরুং-এর সাথে পালিয়ে যাক্। তাই সেই রাত্রে সে মুরুংকে বাঁচিয়েছিল সোনাই মুণ্ডার হাত থেকে।

কুইলি আর মুরুংকে একটা সুযোগ করে দিয়েছিল, পালাবার সুযোগ।

তাহলে সোয়ীই সোনাই মুণ্ডার সবকিছু দখল করে নেবে। কিন্তু সোনাই মুণ্ডা তার চেয়েও সাবধানী।

সেও বেশ কৌশলেই মুরুংকে বন থেকে চালান করে দিয়েছে। সোনাই মুণ্ডা অবশ্য সেই চালটার কথা প্রকাশ করেনি, কিন্তু সোয়ী

তবু মুখ বুজেহ থাকে। আর সেও গোপনে এবার অন্য পথে চলেছে!

তুপুর হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর সোয়ী জানে তাকে যেতে হবে সোনাই-এর ঘরে। যেন নিশির ডাকের মত তাকে ডাকে।

বনে বনে ছড়ানো কাঠ কাটাই-এর কূপ। বনবিভাগ থেকে শাল ধ, চাঁপ আসান সেগুন গাছের গুঁড়িতে হাম্বার ঠুকে মার্কা মেরে দেয়—সেইসব সরেশ কাঠ কেটে ফেলে, তারপর ট্রাকবন্দী হয়ে সেই লগগুলো চালান যায় বাইরে। গুয়া—বড়বিলের কাঠমহাজন বিমলাপ্রসাদজীর আড়তে ভূধর পাঠক ও নতুন মহাজন সে-ও আসা যাওয়া করে ট্রাক নিয়ে, সোনাই মুণ্ডাকে হাতে আনতে চায় সে।

সোনাই বলে—বিমলাজীকে দিয়ে যদি মাল থাকে দিব; কি হে টুয়াই?

টুয়াই এখন বনের বিভিন্ন এলাকার কাঠ চালানের কাজ দেখে। সেও সায় দেয়—তাই হবেক গো মালিক!

সোনাই মুণ্ডা ওদিকে কেন্দুপাতার চালান দেখতে চলে গেছে। মুনিমজী আর টুয়াই তুজনে কি শলাপরামর্শ করে। ভূধর পাঠক জিপ-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ধূর্ত লোকটা জানে অন্ধকারের কারবার। সোনাই মুণ্ডা কিছুদিন বনের ক্যাম্প-এ যাচ্ছে না তাও জেনেছে।

টুয়াই ধাপে ধাপে এগোতে চায়। তার চোখের সামনে পথটা সিধে হয়ে আছে। মুরুং নাই এখন, কুইলিকে তার হাতে আনতে হবে। সোনাইকেও তার উপরই ভরসা করতে হয়েছে।

মুনিমজীও জানে সেটা। ধূর্ত মুনিমজীর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। মুনিমজী বলে—পাঠকজীকে কুছ মাল দেও টুয়াই। রাস্তা হামি বাতলে দিব। মালিক ভি মালুম পাবে না। দাম পয়সা যা মিলবে আধা তুহার—আধা হম্ লেবে।

টুয়াই এখন সহজে আমদানীর পথটা দেখে অবাক হয়।

হাসছে মুনিমজী—সমঝা! সিধা রাস্তা। বোল পাঠকজীকে। আর

তুহার জন্যে কুইলিকে ভি বুঝ করাবো। ব্যস—মালিকের লেড়কীকো সাদী করলো, মালিক বনেগেলো টুয়াই!

টুয়াই যেন স্বপ্ন দেখছে। মুনিমজীই আড়ালে থেকে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

মুনিমজী বলে—পাঠকজীকে দু নম্বর ক্যাম্পে যেতে বলেছি, তু পিছু যাকে ভেট কর। বন্দোবস্ত পাক্কা বানালে। হ্যাঁ—রূপেয়া কুছু আগাম ভি লিবি। দো পান্ হাজার। হুঁসিয়ার সে কাম্ করনা।

পাঠকজী জিপ নিয়ে ক্ষুণ্ন মনেই বের হয়ে গেল সোনাই মুণ্ডাকে সেলাম জানিয়ে। তার কিছুক্ষণ পরই টুয়াইও ঘোড়াটায় চড়ে কাজ দেখতে বের হয়ে গেল।

দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে বনে। ওদিকের কাঠগাদার আড়ালে কাঁঠাল বনে ছায়া নেমেছে। বুনো হলুদ-এর সবুজ পাতায় হলুদ আভা জাগে। এসময় এদিকে কেউ আসে না। বুকভোর হলুদ গাছের আড়ালে মেয়েটা চলেছে। টুয়াই-এর ঘোড়াটাকে দেখে সে।

সোয়ী ভেবেছিল মুরুং-এর সঙ্গে কুইলিই পালাবে। ভাবসাব করে ডুংরি থেকে এমন পালানো নতুন কিছু নয়। অনেকেই পালিয়ে দিখুদের মুলুক ওই গুয়া—বড়বিল—নোয়ামুণ্ডিতে গিয়ে যেভাবে তোক দিন কাটায়। বনের সবুজে গড়ে ওঠা ভালবাসার রং ওই কঠিন জগতে গিয়ে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। দুজনে দুদিকে হারিয়ে যায়, কেউ কেউ যায় লোহাপাথর খাদানে কাজ করতে মেয়েগুলো বড়বিলের বাজারে গিয়ে পসরা মেলে বসে। মরুকগে তারা। সোয়ী চেয়েছিল মুরুং কুইলি পালিয়ে যাবে আর সেই সোনাই মুণ্ডার সবকিছু দখল করে বসবে।

কিন্তু তা হয়নি। সোনাই মুরুংকেই জেলে পাঠিয়েছে চাইবাসার সদরে। কুইলি রয়ে গেছে এখানে। কাঁটা সে তুলতে পারেনি।

তবু হাল ছাড়েনি সোয়ী। টুয়াই এবার ধাপে ধাপে উঠছে সোয়ীও দেখছে টুয়াই তাকে হাতে রাখতে চায়। মাঝে মাঝে টাকা দেয়। আজও চলেছে সোয়ী ওই কাঠ কাটাইয়ের ক্যাম্পে, টুয়াই

এসেছে ভূধরজীর সঙ্গে কথা বলতে। এসময় কুলি মজুররা বনে কাঠ সাইজ করতে ব্যস্ত। কেউ গাছ কাটছে। নিরিবিলি চালাটাতে ভূধরকে কথাটা জানাতে ভূধর খুশীই হয়। বলে সে।

—কাঠ মিলবে রূপেয়া কেনো দিবনা টুয়াই। ঠিক আছে। রাত মে ট্রাক ঘুসবে—রাতমে মাল বাহার চলে যাবে।

টুয়াই বলে ওঠে—লেকিন ফরেস্ট নাকার নফরা আছে জী!

হাসে ভূধর—উসব শোচো মৎ। আমরা ভি লগ্‌কা পারমিট আছে। আমার লগ্ না তুমার লগ্ যাচ্ছে সো ওরা পুছবে না। মুনিমজীকে ভি ঘাবড়াতে হোবে না। লেউ—কুছু রূপেয়া।

ভূধর পাঠক বেশকিছু নোট-এর বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে বলে—অব চলে টুয়াই! কাম পাক্কা—ব্যস!

জিপটা বের হয়ে গেল। একাই দাঁড়িয়ে আছে টুয়াই। হঠাৎ কাকে দেখে চমকে ওঠে। সোয়ী এগিয়ে আসে। ওর মুখে চোখে হাসির ঝিলিক। বলে সে।

—একা একাই সব খাবে নাকি গ? তুমার লেগে কতো করছি। কুইলিকে কতো বুঝ করাচ্ছি, আর উসব কাঠ লিয়ে যাবেক তার ফিকিরটা তো চাই গ।

টুয়াই যেন ধরা পড়ে গেছে। বলে ওঠে সে—কিছু টাকা রাখ। তোকেও লাগবে সোয়ী।

সোয়ী হাসে। সারা দেহে কাঁপন তুলে বলে—

তা লাগলে সাথে থাকবো গ! হাঁ করে দেখছো কি? আমার থেকে কুইলির গা গতর অনেক ডাঁটো। ভয় নাই—গ! ঠিক হাত মেল করে দিব! হ্যাঁ! শাড়ি-গয়না লাগবেক কিন্তুক!

টুয়াই ওকে হাতে আনতে চায়। ওকেও এই চক্রে জড়াতে হবে।

তাই কিছু টাকা দিয়ে বলে—মুনিমজীর সঙ্গে দেখা করিস। হাসে সোয়ী—ই দ্যাখো—উ বুড়ো খচড়াই আছে গ! তা বুলছো যাবো।

মুনিমজীই বুদ্ধিটা বাদলে দেয়। সোয়ীর কাছে এ যেন একটা খেলা। বুড়ো মুনিমজীর চোখে দেখেছে সোয়ী শিয়ালের মত লোভী চাহনি। সেখানেও কিছু টাকা হাতিয়ে সোয়ী ওই বুড়োর গায়ে নিজের আহুড় গা গতর আদরের ছলে ছুঁইয়ে বলে—

তুমার জন্যে সব কিছুই করবো গ! তা টুয়াইটা মহা বদ বলে বুড়োর সাথে তুর এত রং কেনে?

মুনিমজী চটে উঠতে গিয়েও পারে না। বলে সে—টুয়াই তো মালিকের মাইয়াটার পিছু ঘুরছে, তুর সাথে কেনে?

—তা উকেই শুধাও কেনে? সোয়ী দুচোখে কালো ঝিলিক তুলে যেন ফণাধরা কেউটের মত দুলছে ওই লোভী মানুষটার সামনে।

—যাই গ!

মেয়েটা বের হয়ে গেল।

কুইলি কয়েকদিনেই বদলে গেছে। বাবাকে দেখেছে চুপচাপ থাকতে। ওর সামনে থেকে সরে সরে থাকে। কুইলিও কিছু বলেনি দেখেছে কাজকর্ম সব কিছুই দেখছে। সকালে সেই কুলিদের বকাঝকা করে, কাযের ফর্দ দেয়।

ওর দিকে চাইতে কুইলিও দুচোখ জ্বলে ওঠে। সরে আসে সে দেখেছে সোয়ীকে। ওই লোকটার হয়ে নানা কথা বলতে। কুইলি চুপচাপ থাকে। আজ দুপুরে ঝোরার ওই ছায়াঘন জায়গায় গিয়ে বসেছিল কুইলি। ওখানে কুসুম গাছে এসেছে নতুন পাতার বেগুনী আভা। মুরুং আর সে এখানে বসতো প্রায়ই। এখানে ওই বনস্পতির নীচেই মুরুংকে সে কথা দিয়েছিল—তাকে ভুলবে না।

হঠাৎ কুইলি বনের দিক থেকে ভূধর পাঠকের জিপটা থেকে সোয়ীকে নেমে ওদিকের টিলায় গিয়ে মুনিমজীর ঘরে ঢুকতে অবাক হয়। তার একটু পরেই সে দেখেছে টুয়াইকে সেই লগবগে ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসতে। আপনমনে গান গাইছে টুয়াই—হিন্দী টকির গান!

কিযেন একটা চক্রান্তই চলেছে।

কুইলি উঠে আসে তাদের বাড়ির দিকে। ওপাশে দেখা যায় সোয়ী মুনিমজীর ঘর থেকে বের হয়ে আসছে।

…সোয়ীকে সে যেন দেখেনি এমনি ভাবেই কুইলি ওদের বাগানের মাচানগুলোর নীচে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সোয়ী কিন্তু ওকে দেখেছে। তাই ওর কাছেই আসছিল এমনি ভাব নিয়ে। সোয়ী এগিয়ে আসে কুইলির দিকে।

বলে ওঠে—বেলা পড়ে আইচে, অমা চুল বাঁধিস নাই, ময়লা চিট কাপড়টো পরে আছিস। তা ওই মুরুং ছোঁড়াটার জন্যে বিরাগী হবি নাকি? চল—

সোয়ী জোর করেই কাকুঁই আরসী ঘর থেকে এনে ওকে নিয়ে বসলো, আদর করে চুল বাঁধতে থাকে। কুইলি বলে—নিজে বেঁধে লিব, হাসে সোয়ী—দিই কেনে!

সোনাই মুণ্ডা দেখছে ব্যাপারটা। সোয়ী তবু কুইলির জন্য ভাবে এটা দেখে যে খুশী হয়েছে সেটা সোয়ীও বুঝেছে।

সোয়ী চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে।

—মুরুংটার জন্যে এত ভাবিস কেনে লা? চখের কাজল চখ্ ধুয়ে দিলেই সাফ। কান্‌লি—চখের জল পড়লো, তবে পিরীতও ধুয়ে গেল, সি ছোঁড়া দিখুদের মাইয়া লিয়েই থাকুক গে। টুয়াই রইছে। তুর বাপু সোনা বাইরে আঁচলে গিরে দিলি! সোনা ছেলে টুয়াই। তুর বাপের এতবড় কারবার দেখছে—হ্যাঁ।

কুইলি ওর কথাগুলোয় কোন জবাবই দেয় না। কেমন যেন বিচিত্র ঠেকে তার। কুইলি চুল বেঁধে ওর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সরে গেল।

কেমন যেন বিশ্রী লাগে এই আদরটা। আড়ালে গিয়ে এক টানে ওই স্বৈরিণীর বাঁধা খোঁপাটা খুলে ফেলে চুলগুলো জড়িয়ে বেঁধে নিল কোন মতে কুইলি!

সোয়ী ব্যাপারটা দেখে মাত্র। মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে সোয়ীর।

…এমনি উপদ্রব গহণ অরণ্যে হয়েই থাকে।

রাতের অন্ধকারে বনভূমি কেঁপে ওঠে চাপা গর্জনে—কাঁপছে বন পাহাড়। ডুংরির বসতির মানুষগুলো সচকিত হয়ে ওঠে। কোথায় বনে ঝড় ওঠে। পাথরে টিকারার মত পা তুলে দৌড়ে গেল বাইসন-এর একটা দল।

একটা মোষ-এর আর্তনাদ ওঠে,....বনকাঁপিয়ে ডাকটা ডুংরির মানুষ-গুলোকে জাগিয়ে দিয়েছে। জীর্ণ বসতের আগল টেনে দিয়ে ওরা টিন পিটছে, আর্ত কলরব ওঠে—বাঘ হে!

আতঙ্কের রাত্রি ভোর হয়।

খবর আসে এদেলবাও-এর বসতি থেকে একটা মোষকে পাওয়া যায়নি। রক্তের দাগ চারিদিকে। কে বলে—এতবড় বাঘ হে। সায়া বাঘ। গরু মোষ মারছে হে!

বোঙার থানে বসতির অনেকেই জুটেছে। বোরাই সর্দার ঝিম মেরে বসে আছে। কে বলে—বসতিতে মরদ নাই, কুলাটোকে শ্যাষ করবেক কে?

কানাই, ফটিকরা দেখেছিল ছাতাবুরু পরবের দিন সেই বনে মুরুংকে বাঘ-এর সামনে দাঁড়াতে। কানাই বলে—

—মুরুং থাকলে পারতে হে!

বোরাই সর্দার ঘোলাটে চোখ মেলে চাইল। ছেলেটার কোন খবরই নাই। দিকুদের জেলে পুরছে তাকে সোনাই মুণ্ডা।

বাঘটা যেন রাতের অন্ধকারে গর্জে ওঠে।

তুচারজন গাছাল দিয়েছে, কিন্তু দেখতে পায়নি। ফাঁক থেকে কটা গরুও লোপাট। কোন পাত্তা-ই নেই।

মারা মাঝি বলে—ইবার মানুষই মারবেক হে।

আতঙ্কের ছায়া নামে রাত্রির আদিম অন্ধকারে এই অরণ্যমহলে। চোখের ঘুম ছুটে গেছে।

কে বলে—তুক করো হে গুনীন! গণ্ডি দাও, ডুংরিতে, হেই বাবা কুদরো বোঙা দয়া করো।

বোরাই সর্দার গর্জে ওঠে—জুরি বুটি, গণ্ডী তুরা মানিস্? সব যাবেক ইবার। উ কুলা লয়, শয়তান বটে।

চুপ করে আছে সোনাই, তার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। সারা বনের এদিক-ওদিক কাঠ—দামী লগ ছড়ানো। বনবসত থেকে লোকগুলো পালিয়ে আসে। কাজও বন্ধ। সোনাই সেদিন বনবাবুর কথায় বলে—মারাং শিকারীকে খপর দিচ্ছি বাবু। উদিকের বনে দাঁতাল হাতি ঘুরছে—ইদিকে কুলা মানুষ খাবার জন্যে বুলছে। কুলাটাকে মারতেই হবেক হে! নালে কাজ কাম সব বন্ধ হই যাবেক।

শিবু দত্ত পেশায় ইন্‌জিনিয়ার, এই বড় জামদা অঞ্চলে এসেছে কয়েকবছর আগে। ভালোবেসে ফেলেছে সারান্দার অরণ্যকে, এযেন এক স্বপ্ন জগৎ, সবুজ গহণ প্রশান্তির রাজ্য। মানুষ ধীরে ধীরে ঢুকছে, গ্রাস করছে এই অরণ্য সবুজকে। এই অরণ্যে যেন ওকে ডাকে।

সেদিন শিবু দত্তের জিপটা এগিয়ে এসে থামলো ডুংরির চাতরে।

—কি সর্দার ভালো তো?

বোরাই সর্দার এগিয়ে আসে। শিবু দত্তকে চেনে সে। তরুণটি আদিবাসীদের সঙ্গে মেশে, তাদের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে। সেবার একটা বাইসন ক্ষেপে গিয়ে ডুংরি বসত তছনছ করে তিনচারটে লোক মারলো।

ভয়ে তটস্থ সবাই।

বনবাবুরাও ঘাবড়ে গেছে। একজন গার্ডকে শিং-এ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে গেল। এসময় এসেছিল শিবুদত্ত। দুদিন দুরাত্রি ধরে ঘুরে ওর রাইফেলের গুলিতে খতম করেছিল সেটাকে লিগিরদার জলায়। বিরাট একটা দৈত্য যেন।

কুদলিবাদের ওদিকে মানুষ খেকো হয়ে উঠল একটা বাঘ। রাতের অন্ধকারে ঝুপড়ি থেকেই মানুষ টেনে নিয়ে যায়। বনের কাজ বন্ধ।

থল্‌কোবাদ হাট থেকে একটা লোককে তুলে নে গেল। হাটও বসে না। সারা বনে নেমেছে আতঙ্কের ছায়া!

বোরাই বলে—যাস্‌নে দত্তসার, উটোয় শয়তান ভর করেছে।

শিবু দত্ত আর তার সঙ্গী বাছান মুণ্ডা সেই বাঘটাকে খুঁজে খুঁজে মেরেছিল। বিরাট বাঘ—মানুষের রক্ত খেয়ে মুখটা কালো হয়ে গেছল।

বনের বিপদে সেইই আসে প্রথম।

আজ বলে শিবু—সেই কুলাটা কেমন রে? ওটা গরু মোষ তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়, মানুষ খায় না।

সোনাই মুণ্ডার ওখানেই বসেছে ওরা। কুইলি চা নিয়ে আসে কাঁচের গ্লাসে। শিবু দত্ত বলে—তোমার মেয়ে না সোনাইজী?

মাথানাড়ে সোনাই।

সেও বিপদে পড়ছে ওই বাঘটাকে নিয়ে। ব্যবসাপাতি বন্ধ। শালপাতা তোলাও হয় না। হাজার হাজার টাকার লগ পড়ে আছে। বর্ষা নামলে পথ বন্ধ হয়ে যাবে। মাল চালান যাবে না। সোনাই মুণ্ডা বলে—একবার চেষ্টা করে ছাখো দত্তসাহেব।

শিবু দত্ত এখানের খবর রাখে। শুধোয় সে—

তোমাদের বসতিতে একটা ছেলেকে দেখেছিলাম, ভাল্লা নিয়ে বাঘের সাথে লড়েছিল ছাতাবুরুর জঙ্গলে, সে কোথায়?

চুপ করে যায় সোনাই মুণ্ডা। এযেন তারই অপরাধ। কানাই বলে—সর্দারের ভাইবেটা মুরুং, সে তো হরিণ মারলো, দিখুদের জেলে পাঠালো তাকে।

শিবু দত্ত চুপ করে থাকে। দেখছে সে সোনাই-এর মেয়েকে। কুইলির কালো কোমল মুখে বেদনার মেঘ ঘনিয়ে আসে, সেটা শিবু দত্তের নজর এড়ায়নি।

শিবু বলে—ছেলেটা থাকলে এসময় কাজ হতো সর্দার! দেখি পরে বাঘ-এর সন্ধান পাই কিনা।

জিপটা চলে গেল বনের মধ্য দিয়ে।

টিপি টিপি বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকার করে মেঘগুলো ঘিরে আসে, বনস্পতির বুকে ওঠে এলোমেলো বাতাস, বৃষ্টি নামে বনেবনে।

জোনাকিগুলো গাছে গাছে ঝুলন্ত চীহড়লতায় আটকে জ্বলছে, মেঘগুলো মাঝে মাঝে দম নেয় আবার কিরিবুরুর পাহাড় টপকে ঐদিকে অরণ্যে এসে ঝাপিয়ে পড়ে। কোথায় চাপাগর্জন ওঠে।

...বাহনার দুচোখ যেন অন্ধকার জ্বলছে। শিবু দত্ত জীপটা থেকে নেমে রাইফেল নিয়ে তৈরি। পাহাড়ের নীচে পথের রেখা দেখা যায়। অন্ধকারে কিসের শব্দ ওঠে। ডাকটা তখন বনের এদিকে উঠছে। বাহানা বাতাসে বন্য প্রাণীর গন্ধ পায়। বাঘের বিশ্রি বোটকা গন্ধ—হাতিরগায়ের মেটে তীব্র সুবাস—হরিণের মদির সৌরভ আর ভালুকের আস্‌টে গন্ধগুলো তার চেনা। বাতাসে সে শুঁকছে ওই গন্ধটা, সন্ধান করছে। কিন্তু হতাশ হয়। ডাকটাও তেমন ভারি তেজালো নয়, বনভূমি কেঁপে ওঠে না ওই ডাকে।

...তুজনে চলেছে ওই শব্দটা লক্ষ্য করে। হঠাৎ চমকে ওঠে শিবু দত্ত। ব্যাপারটা তার কাছে বিচিত্র বোধ হয়। নীচের পাহাড়ে একটা ভারী ট্রাক যেন বের হয়ে গেল ; শব্দ ওঠে।

...ডাকটা থেমে গেছে। হঠাৎ এক ঝলক জোরালো টর্চের আলোয় চমকে ওঠে শিবু দত্ত। মরা পাতা ঝোপের পাশে পড়ে আছে একটা বাঘ—বাহান চীৎকার করে—বাঘ না, বাঘের চামড়া ! উ ভাগি গেল !

বাহান অন্ধকারে ওই শব্দ লক্ষ্য করে লাফ দেয়। বাঘটা এভাবে জলে পড়ে যাবে ভাবেনি। শিবু দত্ত যে সত্যি বনে তাকে এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে পিছু নিয়ে এটা খেয়াল করেনি। ভেবেছিল ক'দিন ধরে এইভাবে কাজটা চালিয়ে আসছে। আর তু'চারদিন চালাতে পারলেই কাজ হাসিল করে নেবে।

কিন্তু ওই সাবধানী সাহসী শিকারী আর বাহান-এর মত লোক একদিনেই তাকে জালে ফেলেছে। ধূর্ত মেয়েটা তাই পালাচ্ছে।

কিন্তু পথ নেই। পালাচ্ছে সে—পিছনে লাফ দিয়ে আসছে বলিষ্ঠ সেই মূর্তিটা, কিন্তু পিছল পথে পা হড়কে গেছে আর ওই কালো বিশাল দেহটা এসে ছিটকে পড়েছে ওর উপরই। তবু ধরা দেবে

না সে।

সর্বাঙ্গে ভিজে মাটি মাখা ; শক্ত হাতে ধরেছে লোকটা—আর মেয়েটাও কামড়ে ধরেছে—ধারালো দাঁতের কামড়ে হাতটা আলগা হয়ে যায় ; মেয়েটাও গড়িয়ে ওদিকে সরে গিয়ে ঘন সেগুণ বন আর টাইগার গ্রাসের বন-এর ভিতরে লুকিয়ে দৌড়চ্ছে কাপড়টা কোনরকমে গায়ে জড়ানো। আদুড় গা—বনের অন্ধকারে যেন একটা জানোয়ার হারিয়ে গেল ওই আরণ্যক জগতে।

—সাব ! বাহনা বাঘ—হাতি—ভালুক বাইসন এসব শিকার করেছে, কিন্তু এমন কোন জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি।

দত্তসাহেবও এসে পড়েছে। মরা বাঘের চামড়া—একটা হাড়ি পড়ে আছে। ওই চামড়া গায়ে চাপিয়ে হাড়িতে মুখ রেখে বাঘের ডাক ডেকে চলেছে বনে বনে একটা মেয়ে।

শিবু দত্ত বলে—ধরতে পারলি না ওটাকে ?

বাহনা জানায়—আওরৎ সাব। এইসা কাটলো দাঁতসে ঘাবড়ে গেলাম, উ ভাগি গেল ওই ঘাসবনের অন্দর !

জোরালো টর্চের আলোয় দেখা যায় ঘন বনের জমাট অন্ধকার। ওখানে ঢোকাও মুস্কিল, আর সেখানে কাউকে খোঁজাও অসম্ভব। শিবু দত্ত বলে—তোল বাঘের চামড়াটা, আর হাড়িটা। জোর বাঘিনী ধরতে গেছলি মরদ। একটা মেয়েকে কায়দা করতে পারলি না ! ধুস !

সোনাই মুণ্ডা—কুইলি—ডুংরির অনেকেই জমেছে। মেঘঢাকা আকাশে বৃষ্টি নেমেছে। শাল-আম-মহুয়া গাছের পাতা থেকে দমকা ঝরছে বৃষ্টির জমা জলধারা।

সোনাই মুণ্ডা অবাক হয়—ই বাঘ।

হাসে শিবু দত্ত—বাঘ নয় বাঘিনীই রে ! পুরোনো চামড়া নিই গেলাম যাতে এমন বাঘ আর না বের হয়।

টুয়াইও ঘুম জড়ানো চোখে উঠে এসেছে। মুনিমজী বাঘের নাম শুনে কাঁপতে কাঁপতে এসে গর্জে ওঠে—কৌন হারামজাদ কা ক্যাম !

নফরা করছিল! গোলিসে খতম্ করে দিলেন না কাহে দত্তসাহেব?

সোয়ীও এসে পড়ে। দুচোখে তার নেশার জড়তা। যেন নেশার ঘোরেই ঘরে পড়েছিল, ওর মত্ত দেহে যৌবনের উচ্ছলতা। দুচোখে ভয়ের ঝিলিক।

—অ মা! কুন বেদো গ! অয় বাপ—ক্যামন খচড়াই করলেক! ভিড় কমে আসে।

বৃষ্টির রাত যে যার ডুংরিতে ফিরে গেছে। শিবু দত্তের জীপটা চলে গেছে বনের মধ্য দিয়ে ওই রাতের অন্ধকার যেন তাকে ডাকে ওই রূপবতী কোন অরণ্যরাজ্যে। বাতাসে ওঠে বনচাঁপা কুর্চি ফুলের ভারি গন্ধ, ঝোরাটায় কলকল সুর জাগে। এ অরণ্য রাতের অন্ধকারে মুখর হয়ে ওঠে। শিবু দত্তের ফ্লাড লাইটের সামনে চমকে দাঁড়ায় একজোড়া হরিণ, বর্ণাভা নিয়ে। ওরা থমকে দাঁড়ায়। শিবু দত্ত হরিণ মারে না—বনের জানোয়ার সে দেখে বেড়ায়। যেন ওদের চোখের চাহনীতে সে খুঁজে পায় কি প্রাণের স্পর্শ!

জীপটা চলেছে।

টুয়াই চমকে ওঠে অন্ধকারে শুধোয় সে—ধরতে পারেনি তো?

হাসছে সোয়ী—যা দাঁত বসাইছি শালা বুনোর হাতে উ সমঝে গেছে গ। তা বাপু—অনেক রোজগার করেছো। দাও দিন কিছু অ মুনিমজী!

মুনিমজী ঘাবড়ে গেছল, কে জানে ধরা পড়ে গেলে সর্বনাশ হতো। কিন্তু মেয়েটা সত্যিই কাজের। কিছু টাকা আর এক বোতল মদ দিয়ে বলে—এখন যা!

হাসছে সোয়ী—কি মানুষ গ তুমি মুনিমজী। এমনি জাড়ের রাতে ভাগাই দিবা?

মুনিমজীর নজর টাকার দিকে। শীর্ণ লোকটা জানে মেয়েটা যাবে এই রাতে মালিকের ঘরে। ওই দেহটার দিকে নজর দেবার মত সাহস তার নেই।

সোয়ী বলে—চলি গ !

সোনাই মুণ্ডা কি ভাবছে। ব্যাপারটা পুরোটা ধাপ্পা। আর দত্তসাহেবের কথাটাও ভাবছে সে। রাতের অন্ধকারে বনে নাকি ট্রাক আসা যাওয়া করে। আজও এসেছিল।

কেমন যেন সন্দেহ হয় তার।

হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে সোয়ীকে ঢুকতে দেখে চাইল, নধর নিটোল দেহ নিয়ে রাতের অন্ধকারে মেয়েটা আসে।

সোয়ীর দুচোখ নেশায় মাতন।

—এতো কি ভাবছো গ ! লাও—

সোনাই-এর ভাবনাগুলো ওই নেশার অতলে যেন হারিয়ে যেতে চায়। তবু সে আজ যেন অন্য মানুষ। বলে ওঠে সোনাই।

—কোন শালা খচড়াই করছে সোয়ী ?

সোয়ী হাসছে—কি যে বলো সোনাই গ ! তুমার মত লুকের সাথে খচড়াই করবেক কেনে ?

…ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে সোনাই, দুনম্বর ক্যাম্প পাচ নম্বর করমপাদা ব্লকের কাঠ কাটাই-এর জায়গাতে নিজেই বের হয়েছে। এর আগের খাতায় জমা আছে কাঠের হিসেবে। নিজেও দেখেছিল ছফিট-আটফিট ব্যস-এর লগগুলোকে। সেরা সেগুনও ছিল অনেক, তিননম্বর ব্লকে ছিল দামী রোজউড পিয়াশাল-এর গাছ। বহুটাকার মাল তার অনেক মালই গায়েব হয়ে গেছে।

টুয়াই গর্জে ওঠে—ওই বনচোরদের কাজ সোনাইজী, বাঘের ভয়ে ঘরে সিধালো, আর কুন শালারা সব নিয়ে ভাগ্‌লো।

বনের ভিজে মাটিতে টায়ারের দাগ, পাতা জড়িয়ে কাদায় লুণ্ঠনের গভীর চিহ্ন এঁকে ওরা সোনাই-এর অনেককিছুই লুট করে নিয়ে গেছে। গম্ভীর হয়ে যায় সোনাই। শুধোয় সে—তুই কি করছিলি টুয়াই ? তুর জবাবটো কি—বল ?

টুয়াই জবাব দিতে পারে না।

কুইলি দেখেছে সবকিছু। টুয়াই-এর ব্যবহারেও বিষিয়ে উঠেছিল তার মন। দেখেছে কুইলি ফি হাটে টুয়াই ডুংরির অনেককে মদ খাওয়ায়, সিগ্রেট দেয়। সোয়ীকেও খাওয়ায়।

ওর হঠাৎ এত টাকা আমদানি কোথেকে হয় জানে না।

টুয়াই সে হাটে একটা শাড়ি কিনেছে। কুইলিকে এদিকে দেখে এগিয়ে আসে—এ্যাই কুইলি!

কুইলি তার দিকে চাইল, টুয়াই এগিয়ে এসে শাড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলে—তুকে সোন্দর মানাবে। সর্দারও বলছিল এবার।

কুইলি দেখছে লোকটাকে। দামী জামা প্যাণ্ট পরেছে মদের নেশায় টলছে।

কুইলি বলে—পথ ছাড়! লাজ লাগে না তুর; কুথায় এতট্যাকা পাস্? এ্যাঁ।

হাসছে টুয়াই। বলে—রোজকার করি। দেখবি আমিও কাঠের মহাজনী করবো। ভূধর পাঠকের মতো জিপ দাবড়াইবো রে কুইলি।

কুইলি ওর হাতটা সরিয়ে চলে এল। সর্বাঙ্গ জ্বলছে তার। বাবাকে সেদিন কিছু বলেনি।

আজ কুইলি বাবার মুখে ওই সব চুরির খবর শুনে সে বলে—

ঘরেই সাপ রেখেছো তুমি! ওই টুয়াই এত ট্যাকা পায় কুথাকে? বলে ভূধর পাঠকের মতন কাঠমহাজন হবো, জিপ দাবড়াইবো! ইদিকে তুমার সর্বনাশ হয়। লুক চিনো না?

সোনাই মুণ্ডা ভাবছে কথাগুলো।

তাই নিজেই বের হয়েছে এবার গুয়ার প্রসাদজীর আড়তে মালের চালান কি গেল জানতে।

…বন পাহাড়-এর সীমানা পার হয়ে নতুন জগৎটাকে দেখছে সোনাই। মনেহয় তাদের নিয়েই এর জমজমা। বাতিজ্বলে-গাড়ি চলে, সুন্দর বাড়িগুলোর বাহার খোলে।

প্রসাদজীর বিরাট কারবার। সোনাইকে দেখে আজ প্রসাদজী

বলে—মাল তেমন আসছে না। যা আসছে বাজে লগ। কারবার কি হোবে সোনাইজী?

—মাল অনেক চুরি হয়ে গেল প্রসাদজী!

বিমলাপ্রসাদ এ-তল্লাটের অনেক খবর রাখে।

সেইই জানায়।—চুরি হল না আমাকে না দিয়ে ভূধরজীকে মাল দিচ্ছো সোনাই? রাতে ট্রাক মাল নিয়ে আসে মালুম পাই।

সোনাই চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

প্রসাদজী বলে—ঠিক আছে। মাল যা আছে পাঠাও। পরে বাতচিৎ হবে। লেকিন কাজকাম হোসিয়ার হোয়ে করো জী!

কথাটা এবার বিশ্বাস হয় সোনাই-এর। কোথায় একটু ভুলই করেছে! আজ মনেহয় মুরুং-এর কথা। ছেলেটা সৎ—বিশ্বাসী। তাকেই অসৎলোকের প্ররোচনায় নানা কথা শুনে চালান দিয়েছিল। তারপর থেকেই একটা চক্র তার সবকিছু তছনছ করে দিতে চায়। কুইলিও কথাটা বলেছে বারবার।

কি ভাবছে সোনাই। বিমলাপ্রসাদজীও বুঝেছে সোনাই-এর অবস্থা।

—মালাই পিও সোনাই! ছোড় উ বাত। কারবারে নাফা-নুকসান সব হোবে। লেকিন জঙ্গলের কাজকাম করো। তার সাথ সাথ করমপাদার দিকে পাহাড় কুছু লিজ লেও। আয়রন ওর—ম্যাঙ্গানীজ—চায় কপার তাঁবা পাথর ভি নিকাল যাবে। দুসরা রাস্তা ভি করো কামাই-এর।

সোনাইও ভাবছে কথাটা। বলে সে—

কিন্তু ওসব তো লিখাপড়ার কাজ।

হাসে প্রসাদজী—আমার মুন্সী সব বতলে দেবে। চাইবাসামে ভি নিয়ে যাবে।

সোনাই ভাবছে কথাটা। নতুন কিছু করারও দরকার।

আর দরকার হবে এবার মুরুংকে-ও। কুইলি যে ভুল করেনি এটা এখন বোঝে সোনাই।

গিরিজাপ্রসাদ করিতকর্মা ব্যক্তি! বিমলাপ্রসাদের জ্ঞাতি ভাই সেই নিয়ে এসেছে সোনাইকে বড় বিলের মাইনস্ অফিস এ। বিরাট এলাকা। শহর বাজার নানা কাজকারবারের ব্যস্ততা এখানে। গিরিজা তাকে নিয়ে গেল একটা হলে। সারবন্দী টেবিল চেয়ার, ওখানে একটি মহিলাকে দেখে এগিয়ে যায় সে সোনাই কে নিয়ে।

—বৈঠিয়ে! নমস্তে!

সোনাই দেখছে মেয়েটিকে। নিটোল স্বাস্থ্য, উছল যৌবন একটা বয়সের সীমানায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসীই—তবে রঙটা ফর্সা। শাড়িটায় সুন্দর মানিয়েছে তাকে।

মেয়েটি বলে—আপনার নাম শুনেছি। আদিবাসী মহলের নামী লোক আপনি। লিজ-এর ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না। বরং দরখাস্তটা করে রেখে যান আর প্লটনাম্বার, মৌজা এসবগুলো আমিই আনিয়ে রাখবো ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে। কাল আসুন, এখানের কাজ করিয়ে সদরে পাঠিয়ে দেব। ওখানে পরে একদিন গিয়ে সব ফাইন্যাল করে নেবেন।

গিরিজা প্রসাদজী বলে—কাল কেন? ওকে তো জঙ্গলে ফিরতে হবে।

সোনাই-এর অনেক কাজ বাকী। তাই সেও জানায়।

—আজ বৈকাল নাগাদ কাজ হয়ে গেলে মাঝ বেলাতেই ট্রাক নিয়ে ফিরবো জঙ্গলে। জরুরী কাজ রইছে।

হাসল মেয়েটি। হাসলে ওর নিটোল গালে টোল পড়ে। গিরিজা বলে—বৈকালেই আপনার বাসাতে ওসব দরখাস্ত সইটই করে দিয়ে আসবেন উনি। আপনি বরং এখন ওই নাম্বার টাম্বারগুলো নিয়ে রাখুন।

সোনাই বলে—অনেক উপকার হয় তাতে। কালতো রবিবার।

দুর্গা রায়ান দেখছে সোনাইকে। আদিবাসী হয়ে আজ সে বাইরের জগতে এগিয়ে আসতে চায়, সে নিজেও তাদেরই একজন। বলে সে—ঠিক আছে। বৈকালে আসুন বাড়িতে।

পাহাড়গুলো এককালে এখানে রাজত্ব করতো, ওর সারা গায়ে ছিল গহণ বন। এখন মানুষ এখানে শহর গড়েছে। নীচে দিয়ে চলে গেছে রেললাইন, বিভিন্ন মাইনস্ থেকে আইরন ওর বোঝাই বক্স ওয়াগন টেনে নিয়ে চলেছে। বড় রাস্তায় ছুটে যায়, বাস—ট্রাক—এখানে-ওখানে দোকান বাজার।

পাহাড়ের গায়ে উঠেছে রাস্তাটা, আশেপাশে বাংলো ধরনের বাড়ি এককালে এই আদিম অরণ্যে এসেছিল বিদেশী ইংরেজ। তারা তরাই আসামের অরণ্যে চা-এর সাম্রাজ্য গড়েছিল, এদিকে তারাই কাঠ কেটেছে—'স' মিল করেছে, হঠাৎ আবিষ্কার করে লোহা-পাথর ম্যাঙ্গানীজ। একজন বাঙালীও এসেছিল। তিনি প্রমথনাথ বসু তার আবিষ্কারের পর গড়ে ওঠে টাটা কোম্পানী।

তার সঙ্গে সঙ্গে আসে বিদেশীর দল। মুসাবনির পাহাড়ে আবিষ্কার করে তামা—আরও ভিতরে গিয়ে পায় আয়রন ও ম্যাঙ্গানীজের সন্ধান

তাদের অনেকে এই পাহাড় অঞ্চলে বাংলো গড়েছিল। ওদিকে মাথা তুলেছে একটা ছোট চার্চ। পাশের সমতলে আজ গড়ে উঠেছে অনেক বড় এলাকা জুড়ে স্কুল—মিশনারী স্কুলের ওপাশে বাংলোটাতে রয়েছে মিস্ দুর্গা রায়ান।

সোনাই খুঁজে খুঁজে গিয়ে বাংলোর গেট পার হয়ে যায়।

—আসুন!

দুর্গা রায়ান এগিয়ে আসে। সামনে বসার জায়গা—সোফা দিয়ে সাজানো। বনের কিছু পরগাছা টবে লাগানো রয়েছে, কিছু গাছ ফুলের বাগানও আছে। সোনাই মুণ্ডা দুর্গাকে এই পরিবেশে দেখে অবাক হয়।

এ যেন নতুন করে বাঁচার প্রয়াস।

দুর্গা বলে—আপনার দরখাস্তখানায় প্লটনাম্বার আর সব বসিয়ে দিচ্ছি। মনে হয় ওখানের রিপোর্ট ভালোই। দত্তসাহেবও রেকমেণ্ড করছিলেন আপনার নাম। উইস ইউ গুডলাক্।

সোনাই চুপ করে থাকে। মুখে চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে ওঠে

সোনাই বলে—শিবু দত্ত মারাং শিকারী ? উনি আমাকে চেনেন।

দরখাস্তটা জমা দিয়ে বের হয়ে এল সোনাই। বারবার কেন জানে না দুর্গা রায়ানের ডাগর চোখ—হাসি হাসি মুখ ওই বাড়িটা—ফুল ফোটা বাগানের কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে আর একজনের কথা। মুরুং-এর খোঁজও নিয়েছে থানায়। ওকে নাকি এবারে ছেড়ে দেবে ক'মাসের মধ্যেই। আজ সোনাই যেন নিজেকে নতুন করে গড়তে চায়। কুইলিকেও সুখী করবে সে। টুয়াই-দের মায় সোয়ীটাকেও আজ আর কেমন বিশ্বাস করে না সোনাই! সাবধান হবে সে।

সোনাই ডুংরীতে ফিরে নিজেই সবকাজ দেখতে শুরু করেছে। ধূর্ত মুনিমজীও সাবধান হয়ে যায়। খবর যা পেয়েছিল তাতে সে আঁচ করেছিল এমনি একটা কিছু ঘটবে। টুয়াইকে বলে—চোপ যা টুয়াই।

সোনাইও ভেবেচিন্তেই সেদিন বোরাই সর্দারের ঝুপড়িতে গিয়েছে। ডুংরির দু-চার জন এখনও ওর কাছে আসে। বনের গভীরে এই মানুষগুলো প্রকৃতির ভয়াল পরিবেশে বাস করে। তাদের অসুখ-বিসুখও আছে। ভালুকের হাতে বনবরার দাঁতের গুঁতোয় ওরা আহত হয়। জ্বরজারীও আছে।

বোরাই সর্দারই তখন তাদের ভরসা। তেলপড়া জলপড়া দিয়ে বনের জড়িবুটি, লতাপাতার প্রলেপ দিয়ে ওদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে। কেউ সেরে ওঠে, কেউবা চিরকালের জন্যই সরে যায় এই দুনিয়া থেকে। তাদের হয়ে অদৃশ্য কোন দেবতার কাছে চীৎকার করে প্রার্থনা জানায়।

···ছায়া অন্ধকার নেমেছে বটগাছের নীচে। লোকগুলো বসে আছে বোঙার থানে। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে একটা আগুনের মালসায় শালগাছের আঁটা ছিটুচ্ছে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আগুনটা।

হঠাৎ সোনাই মুণ্ডাকে ওখানে আসতে দেখে লোকগুলো চাইল, সোনাইকে ওরা সমীহ করে। হয়তো ভয়ও করে। জানে সোনাই

রাগলে ওদেরও মুরুং-এর মত দেশছাড়া করে দিবে।

ভয় করে না ওই বোরাই সর্দার।

সোনাইকে দেখে সে চাইল। বরাই-এর মুখখানার চামড়া কুঁকড়ে গেছে। চোখদুটো তবু যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে চাপা রাগে। মাথার চুলগুলো জটা পাকানো। চারিদিকে স্তব্ধতা নামে ওকে দেখে।

সোনাই বলে—কাল সদরে যাবো সর্দার!

সর্দার! ডাকটা শুনে মানুষগুলো একটু অবাক হয়, বোরাই সর্দারও। ওকে সর্দার বলে ডাকে না সোনাই, সেদিনের সাতাশী মাঝেও সর্দার বলে মানতে চায়নি।

আজ তাকে যেচে এখানে এসে সর্দার বলে ওকে মান্য করতে দেখে বোরাই সর্দার একটু অবাক হয়। তবু ওই বুড়োর মনের সন্দেহটা যায়নি।

বাইরের দিখুদের সঙ্গে মিলমিশ করা লোকদের তারা এমনি সন্দেহের চোখেই দেখে থাকে। বোরাই সর্দার কোন জবাব দিল না, দেখছে সোনাইকে, ঠিক যেন ওর কথাটা ও বিশ্বাস করতে পারেনি।

সোনাই মুণ্ডা যেন নিজে এসেছে আজ ওর কথাটা জানতে।

সোনাই মুণ্ডা বলে—মুরুংকে খালাস করে নিয়ে আসবো সর্দার, ওরা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, ইয়ার সওয়াল করতেই সদরে যাবো কাল।

কানাই বসেছিল ওদিকে। মুরুং-এর প্রিয় বন্ধু সে। সেও ছিল সেদিন ছাতাপূজোর দিন মুরুং-এর সঙ্গে, আজ সে সোনাই মুণ্ডার কথায় বলে ওঠে।

—সিদিন কেনে জবাবটি দাওনি সর্দার? তাহলে মুরুংকে ধরে লিয়ে যেতো নাই উরো।

সোনাই জানতো এমনি প্রশ্ন ওরা করবেই। বোরাই সর্দারও মাথা নাড়ে—ই, ঠিক কথা!

সোনাই বলে—সেদিন ওরা শুনতো কুন কথা? আর আমি

হয়তো ভুল করেছিলম সেদিন। তুমরা আমাকে দূষবা—তা আমি জানি।

চুপ করে থাকে ওরা।

বোরাই সর্দার দেখছে সোনাইকে স্থির সন্ধানী চাহনি মেলে।

বলে ওঠে বোরাই সর্দার—দ্যাখ। ছেলেটোকে শুধুমুধুই তাড়ালি তুরো। তবে তু কেনে ইখন সোনাই উকে আনতে যাবি? সিটি বলদিকি?

সোনাই চুপ করে ভাবছে কথাটা। এই প্রশ্নের সদুত্তর সে দিতে পারে না: চায় না। ওর মনের অতলের সেই গোপন মতলবটা যেন বুড়োর সন্ধানী দৃষ্টির সামনে পরিস্কার হয়ে ফুটে ওঠেছে। তবু সেসব এড়াবার জন্য সোনাই বলে—ডুংরির লুক হয়ে চুপ করে আর থাকতে লারলাম, তাই যাবো ভাবলম সর্দার।

লোকজন জুটে গেছে। কানাই মতি, দীরঘু—ওদের দলের সকলেই এসেছে। ডুংরির তোকি বুড়িও এবার এগিয়ে এসে বলে।

—সোমতি এ্যাদ্দিনে হলো তুর সোনাই?

…সোনাই দেখেছে ওদের মুখচোখের কাঠিন্যটা মুছে গিয়ে একটু বিশ্বাস ফুটে ওঠে। সোনাইও এইটাই চেয়েছিল।

তাই বলে সে—আমাকে তুমরা তো কেউ এ্যাদ্দিন বলোনি। একটা কথা তুমরা মনে লিয়েছিলে আমিই ইসবের মূল! বলো সাফ করে কথাটো।

ওরাও তেমনি কিছুই ভেবেছিল, তাই তাদের মনে ঠেলে উঠেছিল ঘৃণা, অবিশ্বাস আর রাগের একটা পাহাড়। আজ সেটা ক্রমশঃ যেন মুছে যাচ্ছে!

সোনাই বলে—তুদের জন্যেই আমার ইসব কাজ করানো, বনের মাঝে তুদের দানাপানিও যোগাবার চেষ্টা করি ইসব কাঠমহাজনি, শালপাতা—কেন্দুপাতার ডাক ডেকে। যাতে তুরাও কাজ পাস আমার খর্চাটা ওঠে।

আজ তাই তুদের কাছেই এলম—বল তুরাও ইসব কাজ চলুক তাই

চাস কি না ?

মাথা নাড়ে ওরা—হুঁ তা ঠিক বটে।

আজ তারাও বুঝেছে তাদেরও প্রয়োজন আছে। দু-পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে উঠছে। সোনাই বলে।

—ফিরে এসে কাঠের দর বাড়লে তুদেরও মজুরী বাড়াবো, দৈনিক চার আনা গড় বাড়বেক তুদের।

বোরাই সর্দার শুনছে কথাগুলো।

তোকি বুড়ি বলে—ভালো কথা বলেছিস সোনাই। দে উদিকে দুটো পয়সা দে। আর সর্দারকে বল বোঙার থানে জোহার দিতে, একদিন জাঁকালো করে পূজো দিবি মাদনা বোঙার।

সিমি দিবি—বরা দিবি।

—দিব ! সোনাই মুণ্ডাও কথা দেয়।

....আঁধারনামা পরিবেশে মানুষগুলোর মুখে কি আশার আলো জাগে। ওরা কলরব করছে। মনে হয় ওদের আরণ্যক জীবনে এবার যেন দিন বদলাবে।

কানাই বলে—খাটবো হে। পুরো কাজ করে দিব দেখবা।

...ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল টুয়াই। সে দেখে এতদিন যে পাঁচীলটা গড়ে তুলে সোনাইকে তার আড়ালে রেখে নিজেরা লাভ করছিল—সেই পাঁচীলটা আজ ভেঙে গেছে। টুয়াই দেখছে ওদের চোখেমুখে সেই চিহ্ন। আজ সোনাই তাদের আপনজন হয়ে উঠেছে।

সোনাই মুণ্ডা যে জব্বর চাল চেলেছে সেটা বুঝেছে টুয়াই।

মনে হয় তাদের দিন যেন ফুরিয়ে আসবে এবার। বোঙার থানে কলরব উঠছে। ওদের মনের সহজ আনন্দ আর বিশ্বাসের সুর জাগে বাঁশীতে, মাদল, ধামসা এসেছে।

...সোনাইও মদের খরচটা ধরে দেয়। তোকি বুড়ি শালপাতার দোনায় বেদম মদ গিলে চিৎকার করছে।

নাচের সুর ওঠে।

ছেলেমেয়ে মদ্দ সকলেই আজ সেই উতরোল নাচের ছন্দে যেন নিজেদের বিলিয়ে দিতে চায় কি আনন্দের প্লাবনে। ওদের দাবী বেশী নেই—চাওয়াও বেশী নয়।

তাই আনন্দের ভাঁড়ারে তাদের হাত পৌঁছতে সময় লাগে না। ওরা নাচছে।

…কুইলিও এসেছে ওই আনন্দের আসরে।

সোনাই মুণ্ডাও আজ যেন অনেক দিন পর সেই ছেলেবেলার খুশীর সবুজ দিনগুলোর মাঝে ফিরে যায়।

নাচছে ওরা।

ধামসা—রেগড়া টেমাক-এ বোল বাজছে।

ডান্‌সা পটম্ তাম্ গুড় গুড়!

ডান্‌সা পটম্—

ঝড়ে কাঁপা শালবনের খুশী ছড়িয়ে পড়ে ওই অরণ্যের মানুষগুলোর বাধামুক্ত মনে। একফালি চাঁদ অনেকদিন পর শালগাছের ফাঁক দিয়ে ওই মানুষগুলোর খুশীর নাচ দেখে চলেছে।

…সোয়ী আসেনি। এই আসরে সে আসতে পারেনি।

মনে হয়েছে ডুংরির সব মানুষগুলোই যেন আজ তাকে ঘৃণা করে, আর সেই ঘৃণাভরা চাহনি আজ তাকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

সোয়ী দাঁড়িয়েছিল দূরে ঝোরার ধারে।

হঠাৎ টুয়াইকে দেখে চাইল। টুয়াইও আসছিল এদিকে। আজ তার সারা মনে একটা ভাবনার ছায়া নেমেছে।

মুরুং এখানে ফিরলে সোনাই মুণ্ডাও জোর পাবে। আর আজ সোনাই যে চালটা চেলেছে তাতে টুয়াই-এর এতদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা পাঁচীলটা ভেঙ্গে পড়বে।

এবার সোনাই মুণ্ডা আগের মতই বনে বনে যাবে, ওদের সঙ্গে ঘুরবে তার ফলে টুয়াই মুনিমজীর দমকা রোজগারটাও বন্ধ

হয়ে গেছে।

···কি ভাবছে টুয়াই।

সোয়ীকে দেখে চাইল। আজ ওরা তুজনে ওই আনন্দের জগৎ থেকে নির্বাসিত জীব।

সোয়ী বলে,—সোনাই মুণ্ডা জব্বর চালটোই দিছে গ।

টুয়াই জানে এটা সোনাই-এর কৌশলই। শেষ অবধি দেখবে সে। তাই বলে,

—ঘাবড়াবি না সোয়ী। ইয়ার জবাব আমরাও দিব। শুধু তুই যদি একটু চেষ্টা করিস।

সোয়ী দেখছে টুয়াইকে। টুয়াই ওকে কাছে টেনে নেয়।

নৃত্যউচ্ছল পরিবেশ চলেছে ওই দূরে।

ধামসা—রেগড়া—টেমাক—বাঁশীর সুর ওঠে। বনের গভীরে এই তুটি জীব তাদের মনের পুঞ্জীভূত জ্বালাটাকে প্রকাশ করার জন্যই যেন আজ একত্রিত হয়েছে।

মুনিমজীও এসেছে। বুড়ো লোকটা বকের মত লম্বা গলা বের করে ঘাড় নেড়ে বলে—ঘাবড়াও মৎ টুয়াই।

সোয়ী দেখছে লোকটাকে। ও যেন টুয়াই-এর থেকেও বেশী শয়তান, ধূর্ত। ওর শীর্ণ কাঠি কাঠি হাত দিয়ে সোয়ীর মাংসল দেহটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে—গোপন সাবধানী স্পর্শে।

সোয়ী প্রতিবাদ করে না।

মুনিমজী বলে—আনে দেও মুরুংকো। হম্ সব সিধা কর দেগা।

সোনাই মুণ্ডাকো টাইট কর দেগা—হিসাবকা নক্সা সে। সমঝা সোয়ী!

সোয়ীকে সেই সর্বনাশটা সমঝে দেবার জন্যই যেন লোকটা তার লোভী হাত দিয়ে ওর গায়ে হাত বোলাচ্ছে। আতুড় গা পিঠে সেই ছোঁয়াটুকুতে বুড়ো সব সাধ মিটিয়ে নিতে চায়!

সোয়ী আদর করে মুখ ঝামটে ওঠে।

—কি করছো গ মুনিমজী সুড়সুড়ি লাগে যে গ।

হাসছে বুড়ো খিক্ খিক্ করে।

বনের নীরবতার মাঝে ওই ধামসার গুরু গুরু শব্দ ওঠে। যেন এদের তিনজনের অন্ধকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বনের বসত থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় বনে বনান্তরে।

গুম্—গুম্—গুম্।

বনের এই জীবনকে প্রায় ভুলে গেছে মুরুং।

চাইবাসার জেলে ক'মাস কেটে গেছে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা কেমন বিচিত্র বোধ হয়েছিল তার। কোথায় কোন্ বনে একটা হরিণ মেরেছিল, তার জন্য ওই দিখুরা তাকে ধরে এনে হাজির করেছিল কত দূর পথ পার হয়ে এইখানের পাঁচীলঘেরা জায়গাটায়।

তারপর দু'একবার তাকে পাহারা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে শহরের রাস্তা দিয়ে বড় একটা বাড়িতে। এমন শহর তার আগে তেমন দেখেনি মুরুং। দেখেছে ঝকঝকে কালো রাস্তা, যন্ত্র দিয়ে সেই রাস্তা তৈরি হয়। কালো কি তরল বস্তু কাঁকরের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তায় ঢেলে বিরাট একটা পাথরের চাঁই-এর মত যন্ত্র দিয়ে চাপ দিয়ে তৈরি করে রাস্তাটা।

ওরা বলে পিচের রাস্তা।

তার ওপর দিয়ে বড় বড় গাড়ি ঠাস বোঝাই লোক নিয়ে দৌড়ে যায়। পাহাড়ের মত গাড়িগুলো তেরপল ঢেকে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে। মটর বাইকে—ঝকঝকে ছোট গাড়িতে করে লোকজনকে কত যাতায়াত করতে দেখে। কোথায় বহুদূরে চলে যায় তারা। টাটানগর, কলকাতার নামও শুনেছে।

তাদের বনের মত শান্ত—ঝিমিয়ে চলা জীবন এ নয়। সবাই যেন দৌড়চ্ছে। আর হর্ণ, সিটি বাজে।

দোকান পসারে কত জিনিস, মেয়েছেলে, লোকজন সবাই-এর পোষাকও সুন্দর। ওরা হেসে কলরব করে পথ চলে, এ এক অন্য জগৎ।

মুরুং-এর মনে হয় লোকগুলো তার দিকে চেয়ে আছে। ওরা তাকে চেনে না, তবু মনে হয় তারাও খারাপ নয়। মা—ছেলেকে দেখছে। কোন মা কোলে করে নিয়ে চলেছে দামাল ছেলেদের।

মা-বাবা-ভাইবোন সকলে মিলেই বাস করে তাদের ডুংরির মতই। দেখেছে মুরুং স্বামী-স্ত্রীকেও। একসঙ্গে অফিসে চলেছে। ওরাও মূলতঃ তাদের মতই বাস করে ঘর বেঁধে। তাদের বাঁধন হয়তো বেশীই।

তাই মুরুং-এর ওদেব চিনতে ভুল হয় না। এক সুরেই তারা কোথায় বাঁধা। তফাৎ বাইরের খোলসটায়, আর তার জন্যই তাদের তুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যটা বেড়ে উঠেছে মনে।

সেই বড় বাড়িটায় চেয়ারে বসে থাকেন এক ভদ্রলোক। কালো কোটপরা উকিল মোক্তাররা কি সব জানায় তাকে। তিনি চুপ করে শুনে যান।

মুরুংকে একবার শুধোন তিনি—হরিণটা তুমিই মেরেছিলে ?

মাথা নাড়ে মুরুং—হ।

কালো কোটপরা সাহেব বলে চলেছে—এইভাবেই বনের জন্তুদের হত্যা করা অন্যায়।

ভদ্রলোক তাঁকে ইঙ্গিতে থামতে বলে কাগজে কি খস্ খস্ করে লিখে জানান মুরুংকে—তোমার একবছর জেল হল এই অপরাধে।

মুরুং চুপ করে শোনে কথাটা।

কি বলতে চাইল সে, কিন্তু একজন কনেষ্টবল তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায় কাঠগড়া থেকে।

তারপর এই পাঁচীলবন্দা জায়গাটাতেই রয়েছে মুরুং। এ খানের ছকবাঁধা জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

সকালে উঠে লাপ্সীর মত কি খেতে দেয়—তারপর দলবেঁধে সামনের বাগানে কাজ করে। এ কাজ মুরুং-এর কাছে সামান্য! মাটি কোপানো চাষ করা, জমিতে জল যোগানো এসব সামান্য কাজই তার কাছে।

মাঠে তারা সবুজ কপির চারা লাগিয়েছে। বেগুন, কপি, মুলোর চাষ করে। জেলার সাহেবও চিনে গেছেন তাকে।

ওই লোকটিকে ভালো লাগে মুরুং-এর। মুরুং অন্য কয়েদীদের মত চুরিচামারি করে না সে। লুকিয়ে বিড়ি গাঁজা মদ নিয়েও গোলমাল করে না। চুপ করে কাজ করে যায়। জেলার সাহেব সামনে এলে একগাল হেসে সেলাম জানায়।

সেদিন ওয়ার্ডার মুরুংকে কাজে যাবার মুখে বলে—আজ তুই এখানেই থাকবি। জেলার সাহেব·তোকে দেখা করতে বলেছে।

মুরুং একটু ঘাবড়ে যায় সাহেবকে দেখে। এর আগে একলা ওকে এত কাছে থেকে কখনও দেখেনি সে সাহেবকে। সাহেব ওকে দেখছেন।

কি ভেবে বলেন—তুই আমার ওখানে কাজ করবি। এখানে ওদের দলে কাজ করতে হবে না তোকে। রাজী ?

মুরুং দেখছে সাহেবকে। ওই দলের লোকগুলোর মধ্যে খুনী, দাগী চোর, মদ চোলাই-এর কারবারী, ছিচকে চোর সবই আছে। ওরা কাঁচা খিস্তী করে, খারাপ কথা বলে। মুরুংকে একজন যা তা কথা বলেছিল, মুরুং সেদিন আর একটু হলেই তাকে দু ঘা বসিয়ে দিত। কিন্তু তা করেনি।

ওই লোকগুলোকে সে দেখতে পারতো না। কোনদিন গোলমালই বেধে যেতো।

আজ ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেন বেঁচে গেছে মুরুং। এবার শান্তিতে থাকতে পারবে সে। তাই জেলার সাহেবের কথায় মাথা নুইয়ে জানায়—হ্যাঁ।

জেলার প্রথমবাবুও ওর পরিচয়টা জেনেছেন তার মুলুকের লোক সেই আদিবাসী কনেষ্টবল রবি-র কাছ থেকে। রবি হো-ও জানিয়েছে তাঁকে যে ওই ছেলেটি বনের আদিবাসী সমাজের সর্দারের বংশ।

প্রথমবাবুও দেখছেন কিছুদিন মুরুংকে।

খুশী হয়েছেন ওর কাজে, ব্যবহারে। মনে হয় রবি হো মিথ্যে কথা বলেনি। তারপরই এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি। একটা হরিণমারার

দায়ে জেলবাসী ছেলেটার সঙ্গে তিনিও যেন একটা ভালো ব্যবহার করতে চান।

জেলের পাঁচীলের লাগোয়া সুন্দর বাংলো। সামনে বাগানবাড়ির বারান্দায় টবে ঝুলছে অর্কিড, ফুলের টব সাজানো। ওদিকে একফালি জমিতে কিছু শব্জীর গাছ। বাংলোয় গিয়ে ঢুকলো মুরুং।

মুরুং এখানে এসে গিন্নীমাকে দেখে জোহার করে। বয়স্কা মহিলা দেখছে ছেলেটিকে। নিটোল স্বাস্থ্য—মুখের কমনীয় ভাবটা সহজেই চোখে পড়ে! চোর, পেশাদার বদমাইস জেলঘুঘুদের কোন ছাপই ওর মুখে চোখে নেই।

বাসন্তী স্বামীকে বলে—ছেলেটাকে জেলে রেখেছো?

হাসেন প্রথমবাবু। বাসন্তী শুধোয়—কি করেছিলি রে তুই—যে জেলে এসে ঢুকলি?

মুরুং ঠিক বাংলা বুঝতে পারে না। তবে হাব ভাবে বোঝে। প্রথমবাবুই মুণ্ডা ভাষায় কথাটা জানাতে মুরুং বলে ওঠে ভাঙ্গা বাংলায়—বনের হরিণ মারলো একটো, দিখ্ সাহাবরা জেলে পুরলো আমাকে মা।

বাসন্তী বলে—হরিণ শিকার করলি কেন?

মুরুং কথাটা বুঝেছে। সে শোনায়—হরিণ তো মারতে চাইনি, বড় বাঘটা এসে লাফ দিলো, হামি ভল্লা চালালাম—উটো ভাগি গেল, হরিণটো ভাগছিল উ গিঁথে গেল। মারতে গেলম বাঘটোকে—তা হল নাই।

—বাঘ মারতে গেছলি তুই? বাসন্তী ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে!

বাংলোর বারান্দায় এসে হাজির হয়েছে বাংলোর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা। মুরুংকে দেখছে ললিত, মুনমুন, চন্দ্রা। ললিত এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। ওরা মুরুং-এর কথা শুনে অবাক হয়। দেখছে ওই সাহসী ছেলেটাকে।

বাসন্তীর কথায় মুরুং বলে—একটো বড়ো বাঘ আগে মেরেছি। চিতাও মেরেছি। আমাদের জঙ্গলে উসব আছে। বাঘ—বাইসন—ভালু—

ললিত শুধোয়—হাতি দেখেছো তুমি? এলিফ্যাণ্ট, হাতি! হাতি আছে ও বনে?

মাথা নাড়ে মুরুং—উতো বহুত আছে। ধানক্ষেতে, বাজরাক্ষেতে ওরা নামে, আমরা টিন বাজিয়ে মশাল জ্বেলে উদের কুদাই এ দিই। বড় বড় দাঁতাল—মাকনা—সব হাতি আসে। বহুৎ হাতি আছে. বাইসন. বনবরা—হরিণ সম্বর—কটরা ময়ূর সব আছে উ মুলুকে।

ললিত-মুনমুনের চোখে বিস্ময় জাগে।

মুরুং কোন্ এক স্বপ্ন রাজ্যের জগৎ থেকে যেন এখানে বন্দী হয়ে আছে। বাসন্তী দেখছে ওকে।

মুরুং-এর মনে পড়ে সেই ফেলে আসা সবুজ বন পাহাড়ের কথা, সেই মানুষগুলোর কথা। ক'মাস পরে সে যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

একটা গেলাসে করে চা আর দুটো পাঁউরুটি এনে দিয়েছে রান্নার লোকটা। মুরুং অবাক হয়।

বলে সে—খেয়ে এসেছি মা জী!

হাসে বাসন্তী, প্রমথবাবুর দিকে চেয়ে বলে—ওখানে তো লাপসী দেয় সকালে। নেংচা পাঁউরুটি খেয়ে নে।

মুরুং-এর লজ্জা করে। সহজে কারো কাছে কিছু নিতে চায় না ওরা। প্রমথবাবু সেটা বুঝে বলেন।

—মা জী বলছে খেয়ে নে।

মুরুং বলে—কি কাজকাম করতে হবে বলে দিন মাজী। উ বাগানটা পহলা সাফ করি দিব। নালে গাছে ফুল আসবে না। সাফ্ সুতরা করছি বাগানটো।

নিজেই টাংনা হাতে নিয়ে বাগানে নেমে পড়ে। আর খাটতে

পারে অসুরের মত। বিরামহীন গতিতে কাজ করে চলেছে বাগানে বলিষ্ঠ ছেলেটা।

বৈকালে প্রমথবাবু অপিস থেকে বাংলোয় ফিরে অবাক হন। মুরুং কাজ শেষ করে ওয়ার্ড-এ ফিরে গেছে। সারা বাগানের হাল বদলে গেছে। প্রমথবাবু বলেন—এতবড় বাগানটাকে সাফ করে গেছে মুরুং ?

বাসন্তী বলে—ছেলেটা সতি৷ ভালো গো। ওকে বন থেকে ধরে এনে জেলে পুরে রেখে ঠিক করোনি তোমরা।

প্রমথবাবু বলেন—আমি তো হুকুম তামিল করি ললিতের মা। তবু ছেলেটা ভালো বলেই এখানে কাজ দিয়ে রেখেছি। তুপুরে খেতে দিয়েছিলে ?

বাসন্তী বলে—ও খাবে না। কোথায় যেন সম্মানে বাধে ওর। বলে ওখানেই খাবো।

প্রমথবাবু বলেন—সর্দারের বংশ কিনা ওদের মধ্যে ও তাই আলাদা। ওদের ব্যবহারও সব অন্যরকমের।

কদিনেই মুরুং এ বাড়ির লোকদের সঙ্গে মিশে গেছে। কাজকর্ম তেমন কিছুই করতে হয় না। ললিতও ওর কাছে শোনে বনের বিচিত্র গল্প, আর তাকে তার ছাত্র করে নিয়েছে ললিত। ইংরাজী, বাংলা হরফ চিনিয়েছে, শ্লেটে-এর মধ্যে এক-তুই লিখতে শিখেছে।

মুরুং-এর কাছে এই দিনগুলো কি যেন মুক্তির আশ্বাস আনে। এখানে সারাদিন সে আনন্দেই থাকে। জেলের পরিবেশ থেকে সকালেই বের হয়ে এসে ঢোকে এই বাংলোয়। টুকটাক কাজ করবার ফাঁকে বই নিয়ে বসে, ইংরাজীও শিখছে।

মনে হয় মুরুং-এর এজগতের একটা অন্য রূপ আছে। আজকের তাদেরঅরণ্যের মাঝে ওই জীবনটাকেও বদলানো দরকার। দিখুদের এই বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে ওই অরণ্য জীবনের অভাব কষ্টকে দূর করা যায়। নাহলে ওই বন্যজীবন নিয়ে আজ বাঁচা যাবে না।

সোনাই মুণ্ডার কথা মনে পড়ে। আজ সে নতুন করে ভাবছে। ওই লোকটা তবু কিছু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার চেষ্টার চেয়ে লোভটাই বেশী। তাই এগোতে পারেনি। হয়তো বাইরের জগতটাকে চেনেনি, তাই ঠকেছে।

…ললিত মুরুংকে শোনায়—বীরসা মুণ্ডার কাহিনী। সেই বিদ্রোহের ইতিহাস।

ওই অরণ্যের গভীরে লড়াই-এর কথা শুনেছিল মুরুং তাদের বোরাই সর্দারের কাছে। ওই মাটি—বন পাহাড়ে তাদের দখল কায়েম করার জন্যই লড়েছিল বীরসা মুণ্ডা। ওই অরণ্যের দুর্দম মানুষগুলো। বিদ্রোহের নাগরা বেজেছিল সেই পাহাড়ে।

কিন্তু বিদেশী সাহেবরা তাকে ধরে এনে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছিল, সব আন্দোলনকে স্তব্ধ করেছিল তারা।

মুরুং শুধোয়—সেই সাহেবগুলান কুথায় রইছে ?

হাসে ললিত—ওরা এদেশ থেকে চলে গেছে। এ এখন আমাদের দেশ। আমরা স্বাধীন জাতিরে। …ঠিকমানে বোঝে না মুরুং।

মুরুং-এর এসব কথা বিচিত্র ঠেকে।

ললিত বলে—এ দেশের সব সম্পদ এখন দেশের মানুষের। ওই সব পাহাড়ে আছে আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানিজ ওর, আরো অনেক কিছু। এসব খনিজ পদার্থ, ওই অরণ্য সম্পদ এখানের মানুষের।

…মুরুং-এর মনে হয় কোথায় একটা হিসাবে ভুল হয়ে রয়েছে। তার বোঝার সাধ্য নেই।

তবু সেই অরণ্যের কথাই মনে পড়ে। এত কাজের মধ্যে এই দূর প্রবাসে ভোলেনি একজনকে। সে কুইলি। ও যেন তার জীবনের একটি সুর। বাতাসের মৃদু সুবাস। তাকে দেখা যায় না, তবু তার অস্তিত্ব জেগে থাকে বাতাসে, নিঃশ্বাস বায়ুর মতই। কুইলির ডাগর চোখ দুটো যেন তারা হয়ে জেগে থাকে মুরুং-এর সামনে।

…বাসন্তী সেদিন বলে—খালাস পেলে কোথায় যাবিরে মুরুং ?

মুরুং এখন বাংলা বলতে পারে। সে বলে ওঠে।

—মুলুকে যাবো মাজী ! ওই বনপাহাড়ের মুলুকে—

—কেন এখানে থাকবি। পড়াশোনা কর। সেখানে বনপাহাড়ে গিয়ে আবার হরিণ মারবি, জেলে ঢুকাবে তোকে !

বাসন্তির কথায় কি ভাবছে মুরুং। ওর খালাস পাবার দিন এসে গেছে। সত্যিই ভাবনায় পড়েছে সে। এখানে থাকা ভালোই। লেখাপড়া শিখবে। আবার মনটা হু হু করে সেই অরণ্য সবুজের জন্য।

কুইলির জন্য। বোরাই সর্দারকে কদ্দিন দেখেনি।

সারান্দার অরণ্যভূমি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

মুনমুন বলে—আজ কিন্তু গান গাইতে হবে, তোমাদের গান।

চন্দ্রা স্কুলে সেদিন ফাংশনে আদিবাসী নাচ নেচেছিল। মুরুং ওকে বাড়ীতে সেই নাচ নাচতে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে। অবাক হয় মুনমুন, ললিত।

—হাসছিস কেন এ্যাই মুরুং।

বাসন্তীও বলে—কিরে ? কি হল ?

মুরুং বলে—ওকি নাচ গো ? একদিন দিখাবো নাচ !

সেই কথাই রাখতে হবে তাকে।

মুরুং-এর জন্য ললিত হাট থেকে একটা বড় বাঁশের বাঁশী কিনে এনেছে। অবাক হয় মুরুং বাঁশীটা দেখে। ফুঁ দিয়ে সুর বের করে। উদাস বিচিত্র এক চেনা—বহু সুখ-দুঃখের দিনরাত্রির স্মৃতি-বিজড়িত সেই সুর। ওতে মিশে আছে সারান্দার অরণ্যভূমির শাল মহুয়া ল্যাক্টার্নো, বনচাঁপার সুবাস, মিশে আছে ঝর্ণার সুর, কুইলির গানের ভাষা !

—তুলতুলিবে হায়রে দা ইন লালকান।

কুদো ছড়িয়ে তিরিয়ো সাড়ে এন্।

বিচিত্র ওই সুরে কোনো ঝর্ণার ধারে প্রেমিকের কথা ফুটে ওঠে। মুরুং যেন সারান্দার অরণ্যগভীরে শাল-বনছায়ায় ফিরে গেছে। পাখী ডাকে—ঝর্ণার সুর ওঠে।

…হঠাৎ কার হাততালির শব্দে ওরা সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে।

বাসন্তী ঘরেই ছিল। ললিত, মুনমুন, চন্দ্রাও মুরুং-এর গানের রে যেন অজানা দেশে গিয়ে পড়েছে।

…মুরুং ফিরে গেছে নিজের সেই অরণ্য বসতে।

কিন্তু ওই হাততালির শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে। ঘরে কে ওদের গানের আসরে সামিল হয়েছে একটি তরুণ। প্রভাত গিয়ে আসে।

প্যান্ট সার্টপরা বলিষ্ঠ চেহারার একটি যুবক।

বাসন্তী অবাক হয়—তুই! হঠাৎ কখন এলি রে প্রভাত? বোস। ভাত ওর ছোট ভাই। ভূতত্ত্ব—খনিজ সম্পদ নিয়ে চাকরী করে রত সরকারের ওই দপ্তরে। ভারতের অরণ্য-পর্বতে তাকে ঘুরতে নানা খনিজ পদার্থের সন্ধানে। ধূমকেতুর মতই এসে পড়েছে প্রভাত।

সারা বাড়িটা যেন ওর উপস্থিতিতে ভরে ওঠে। মুরুং দেখছে ওই াহেবকে।

প্রভাতকে ঘিরে ধরেছে ললিত, মুনমুন। মুরুং চুপ করে দেখছে ওকে সলজ্জ চাহনি মেলে। প্রভাত লক্ষ্য করেছে সতেজ ওই মুণ্ডা তরুণকে। প্রভাত শুধোয়।

—ওটিকে কোত্থেকে জোটালি ছোড়দি? কি নাম তোর?…ঘর কোথায়?

মুণ্ডারি ভাষাতেই কথাটা বলে প্রভাত। বনেপাহাড়ে ঘুরে লনসই ওই ভাষাও শিখেছে সে।

মুরুং ওর মুখে তাদের ভাষা শুনে অবাক হয়। প্রভাতের কথায় জানায়।

—বাংলা জানি স্যার। আমার নাম মুরুং। সারান্দার বনবসতে আমার ঘর। ওই কুসসা বস্তিতে। করমপাদার উদিকের বনে।

—চমৎকার! প্রভাত ওকে খুশিভরে জানায় কথাটা—বাস! মেঘ না চাইতেই জল!

বাসন্তী অবাক হয়—কিরে? কি ব্যাপার?

প্রভাত বলে—সব শুনবে পরে। এখন সিধে জামসেদপুর থেে
জীপ চালিয়ে আসছি। আই নীড্ এ কাপ অব হট্ টি! প্লীজ।

আর ওই মুরুংকে একটু দরকার। পরে যেন দেখা করে! কি ে
কথাটা বুঝলি?

মুরুং ঘাড় নেড়ে বের হয়ে গেল চা বানাবার জন্য।

প্রভাতের কথাটা শুনে খুশী হন প্রমথবাবু। মুরুং-এর উপর ত
মায়া পড়ে গেছল। বাসন্তীও খুশী হয়।

বলে সে—ছেলেটা এই সপ্তাহেই ছাড়া পেতো, তবু একটা গা
হবে ওর। শুনেছি ও কোন মুণ্ডা সর্দারের ভাইপো।

প্রভাত রায়ের সামনে বিরাট একটা প্রজেক্ট।

তাকে এখন যেতে হবে সারান্দার এদিকের অরণ্য পর্বতে, সেখা
বিরাট আয়রন ওর ডিপোজিট-এর সন্ধানে কাজ হবে। তাকেই ‹
প্রোজেক্টের চার্জ নিতে হবে।

প্রভাত বলে—ছেলেটা কাজের রে ছোড়দি। বাংলা-ইংরি
শিখিয়ে নোব আর একটু। ওই দিকের সর্দারের বংশ। ওকে ত
সঙ্গে পেলে কাজ হবে। আদিবাসীদের কাছে এ্যাপ্রোচ করা সঃ
হবে।

মুরুংও শুনেছে কথাটা।

এই সপ্তাহেই সে চলে যাবে এখান থেকে সারান্দার বনে, ত
আবার সেই ফুল ফোটা শালবনে ফিরে যাবে সে। কুইলি আ
তার পথ চেয়ে। এবার যেন নতুন করেই নিজেকে গড়বে মুর
মন টানে. আর ভালো লাগে না এই শহর। দিনরাত যেন ক
বাজে সেই সুর, বনপাখীর ডাক।

দিন গোনে সে, এখান থেকে মুক্তির দিন।

ঃ কত মাস পর সে চলেছে আবার ওই বনপাহাড়ের দিকে। প্রভ
রায় জীপটা চালাচ্ছে। সামনে দেখা যায় নীল পাহাড় রেখা। ‹

বনে ঢাকা ওর বুক।

মুরুং বলে—হুইটো ঠাকুরানী পাহাড়—ওই পিছনে আরও উচা, উটা কিরিবুরু, ডানদিকে টাকঁটো গুয়া পাহাড়।

ওই অরণ্যভূমির ওদিকে তার ঘর—ওখানেই তার সব কিছু। বাতাসে আজ উঠেছে শালফুলের সুবাস, লাল ধুলো ওড়ে চন্দনের মত সর্বাঙ্গে লাগে মুরুং-এর। মাটি মা যেন তার ঘরে ফেরা দামাল ছেলেকে চুপি চুপি নিবিড় ছোঁয়া দিয়ে আজ কাছে টেনে নেয়।

জীপটা চলেছে ওই পাহাড়ের দিকে।

সন্ধ্যা নামে।

আজ ওরা গুয়া ফরেষ্ট বাংলোয় রাত কাটিয়ে কাল জঙ্গলে ঢুকবে। অবশ্য সেই জঙ্গলের শুরু হয়ে গেছে আগে থেকেই।

দূরে গুয়া পাহাড়ের মাথায় মাইনস্-এর আলো জ্বলে, অন্ধকারে আকাশের বুকে তারার মত ঝিকিমিকি তোলে কিরিবুরুর আলোগুলো। ওদিকে সারান্দার গহন তমসাবৃত অরণ্যভূমিতে কুয়াশার চাদর জড়ানো। চাঁদের আলোয় সুপ্তিমগ্ন অরণ্যের দিকে চেয়ে থাকে মুরুং।

প্রভাত রায় দেখছে অরণ্য পর্বতকে। সে খুঁজছে ওর বুকঠাসা সম্পদকে। ওই পাহাড়ে আছে অনেক কিছু, মুরুং তার সন্ধান জানে না সে দেখছে সবুজ অরণ্যকে।

সোনাই মুণ্ডা অনেক আশা নিয়েই সদরে এসেছে। মুরুংকে তার দরকার। খালাস হয়ে গেছে বোধহয়। সকালেই তাই চেনা উকিলবাবুকে নিয়ে জেল অপিসে গেছে।

...জেলার সাহেবকে সেলাম করে সোনাই মুণ্ডা কথাটা জানায়। মুরুংকে নিয়ে যেতে এসেছে সে।

প্রমথবাবু খাতাপত্র দেখছিলেন। হেডক্লার্কবাবুই জানায়—সে তো পরশু খালাস পেয়ে গেছে।

চমকে ওঠে সোনাই—তাহলে গেল কোথায় স্যার?

প্রমথবাবু জানান—সরকারী চাকরী নিয়ে সে এখান থেকে চলে গেছে সারান্দার ওদিকে কোন্ বনপাহাড়ে। এখানে সে নেই।

চমকে ওঠে সোনাই মুণ্ডা—ওদিকেই চলে গেছে?

তার সব চেষ্টা এমনি ব্যর্থ হয়ে যাবে তা জানে না।

মুরুং-এর যোগ্যতা আছে তা জানতো, কিন্তু তার হাত থেকে এভাবে ছেলেটা বাইরে চলে যাবে এত শাগ্গীর সেই যোগ্যতার জোরে এটা ভাবতে পারেনি সে। সোনাই তবু আশা ছাড়েনি। মনে হয় যেভাবে হোক খুঁজে বের করবে তাকে।

আজ নিজের প্রয়োজনেই তাকে দরকার।

…"চাঁদের আলোভরা অরণ্যের বাইরে গিরিশিরার উপর বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুরুং দেখছে আজ সারান্দাকে নতুন করে।

যে মানুষটা ওখান থেকে বের হয়ে এসেছিল সেদিন, আর আজ যে ফিরছে ওখানে এ দুটোর মধ্যে অনেকটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

তবু ওই অরণ্যভূমি আজও তাকে ঘরে ফেরার আনন্দে মন ভরিয়ে দিয়েছে।

তার সামনে এক নতুন শপথ, নতুন জগৎ। জানে না মুরুং আজকের সারান্দা—তার মানুষ ওকে কিভাবে নেবে

মুগ্ধ বিস্মিত চাহনি মেলে সে দেখছে আজকের সুপ্তি মগ্ন অরণ্যানীকে।

টপগীয়ারে জুঙ্গা জিপখানাকে পাহাড়ী পথ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে যেন তুলছে শিবু দত্ত। নিটোল পেটা চেহারা, সারাদেহে একরত্তি চর্বি নেই, চোখ দুটো যেন ঘন অরণ্যের গাছ-গাছালির জটলা ছাড়িয়ে বহু দূরে বিস্তৃত।

জিপটা কঁকাচ্ছে—অবাধ্য ঘোড়াকে যেমন নিপুণ সওয়ার চাবকে নিয়ে যায়, শিবু দত্তের হাতে জিপটা তেমনি আর্তনাদ

করে বাধ্য হয়ে পাহাড় ঠেলে উঠেছে। এ পারে চড়াই-এর সীমার ওদিকে সিধে নেমে গেছে পাহাড়টা, ঘনবনের বুক থেকে ওপাশের পাহাড়ের কালচে নীলাভ স্তব কেটে বের হয়েছে নদীটা। ঘোলা জল, বর্ষার শেষ, তবু উপরের পাহাড় অঞ্চলে মাঝে মাঝে মেঘ নামে বৃষ্টি হয়, তাই জলটা এখনও লালচে। উদ্দাম বেগে সোনা নদী বের হয়ে আসছে পাহাড় অরণ্যের নিভৃত জগৎ থেকে মানুষের জগতে।

জিপটা থেমেছে পাহাড়ের মাথায়। শাল গাছগুলো এখানে ছোট খাটো। পুরানো শাল মহুয়া গাছগুলো কেটে ফেলেছে। জিপ থেকে নেমেছে বাগান মুণ্ডা, বাতাসে কি শুঁকছে সে, মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে।

—সাব্।

শিবু দত্তও নেমে পড়েছে, ওর হাতে এক্সপ্রেস রাইফেল, দুটো ব্যারেলেই বুলেট পোরা, ফোর সেভেন ফাইভ হেভি রাইফেলটা তৈরি, ওদিকে গাছের ডাল কয়েকটা ভাঙ্গা, নাড়ানো।

শিবু দত্ত বলে—ব্যাটা এদিকেই এসেছে।

ওদের নিশানা এখন হাতিটার দিকে। দাঁতাল হাতিটা ক'মাস ধরে রোগ হয়ে গেছে। দলছুট অবস্থায় সেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই অঞ্চলে। সারান্দার গহন অরণ্যে তার ডেরা। কিন্তু বন থেকে বের হয়ে হাতিটা এই মাইনস্ অঞ্চলেও ঘুরছে। এর মধ্যে আটদশটা মানুষ মেরেছে। দুটো জিপকে আরোহী সমেত পাহাড় থেকে টপ্‌কে দিয়েছে। ও যেন এখন এ অঞ্চলের মূর্তিমান আতঙ্ক। তাই বনবিভাগ থেকে ওকে আইনতঃ 'রোগ' ডিক্লেয়ার করে ওকে মারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিবুদত্ত বেশ কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল, তখন নোয়া মুণ্ডি থেকেই শুরু হয়েছে গভীর অরণ্য। চারিদিকে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। এদিকে ঠাকুরাইন, ওদিকে বোলানী হিলস—ঘন অরণ্য। পাহাড়ী পথে রেললাইন বসিয়ে বার্ন কোম্পানী গুয়ার পাহাড়ে ব্লাষ্টিং করে আয়রন ওর তুলছে।

ক্রমশঃ দেখা যায় এ অঞ্চলের পাহাড়ে অরণ্য সম্পদই নয়, ওঃ আকাশছোঁয়া পাহাড়ের বুকভর্তি লোহাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ওর, কো কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। আর লোহার যুগে এতবড় সম্পদে আবিষ্কার এই আদিম অরণ্যভূমির মানচিত্রই বদলে দিয়েছে।

বনপাহাড়ে এসে হাজির হয়েছে হাজারো মানুষ, কিন্তু বাধ দিয়েছে প্রকৃতি। দুর্গম বনরাজ্য, তার পাহাড়ে কোথাও মানুষ এসেছে লোহাপাথর তোলার জন্য, হানা দিয়েছে বুনোহাতির পাল হিংস্র বাঘের থাবায় মরেছে অনেকে। অনেকে গেছে কালাজ্বরে কবলে, পিছু হটেছে অনেক বর্ষার পাহাড়ী ঢলে।

আবার এসেছে অন্য দল।

নতুন রেললাইনের ধারে ছোট্ট ইষ্টিশান হয়েছে, রাতে অন্ধকারে কেবিনম্যান নেমেছে সিগন্যাল দিতে, তাকে আর পাওয় যায়নি। ধূর্ত বাঘ ওঁৎ পেতে থাকে শিকারের আশায়। মানুষ তার কাছে সহজতম শিকার। রাতের অন্ধকারে গেটম্যানকে তুলে নিয়ে উধাও। পরপর তিনজন গেটম্যান ওদের শিকার হতে অরক্ষিত পা থাকে রেল গেট, ওর নামকরণ হয়ে গেছে বাঘ গেট।

...তবু ভীরু লোভী মানুষ এসেছে, ষ্টেশনের আশে-পাশের ব কেটে বসত গড়েছে। রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বালে, কাঠের অভা নেই। গুঁড়িগুলো জ্বলে গনগনে আগুনের উত্তাপে প্রহর গুনে এ একটা রাত্রি কাটায়।

দিনের আলোয় আবার অভিযান চালায় বনপাহাড়ে। এমনি দি এসেছিল শিবনারায়ণ দত্ত নামে তরুণ একটি যুবক। বেপরোয়া আ সাহসী।

...পাহাড় বনের মধ্যে দিয়ে দিনান্তে একখানা ট্রেন আসে আবা বৈকালেই সেটা ফিরে যায় গুয়া থেকে। ওই ট্রেনে নেমেছিল শিবু দত্ত

...কয়েকজন মাত্র যাত্রী নামে, ওদিকে বিমলা-প্রসাদজীর কাঠের আড়ত, করাত কল বসেনি তখনও। হাত দিয়ে বড় করাত টেনে তারা কাঠের লগ ফাঁড়ছে। রাস্তা ওই একফালি, দুপাশে কিছু

দোকান পশার, ওদিকে পাহাড়ের নীচে একটা গির্জা—থানার বাড়িটা, ছোট হাসপাতালও রয়েছে। দুটো তিনটে রাস্তা সমান্তরাল হয়ে ওদিকে পাহাড়ের ধারে গিয়ে মিশেছে, খোয়া ঢালা রাস্তাটি ওই গভীর বনপাহাড়ের দিকে চলে গেছে, হারিয়ে গেছে।

স্টেশনের ধারে দু-একটা চা-তেলেভাজার দোকান, আর করাত কল, ভূধর পাঠকের চূনাভাটির মজুরদের জন্য সেখানে রুটি শব্জীও মেলে, আর আছে ওদিকে ঝর্ণার ধারে শাল মহুয়া পাহাড়ী জামগাছের কাঠফাঁড়া বাতিল ছালট দিয়ে তৈরি কুলিদের আস্তানা। মদের ভাটিখানা—জলে কাদায় দাঁতাল শূয়োরের দল ঘুরে বেড়ায়।

ওই গাছগাছালির ঘেরা ফাঁকা জায়গায় হাট বসে হপ্তায় দুদিন, এই নিয়েই বড়বিলের জনবসতি। সন্ধ্যার পরই ওই বনপাহাড় অঞ্চলের আদিম জীবনের অন্ধকারে যেন এই বসতটুকুও হারিয়ে যায়।

…বিমলাপ্রসাদজীই টাটানগরে এনেছিল শিবুবাবুকে। লোহাকারখানার কাজ বাড়ছে। নতুন কারখানা গড়ে উঠবে এবার দেশের নানা ঠাঁই-এ। বিমলাপ্রসাদ বলে, চলিয়ে উস্ মুলুকমে দত্ত-সাব। পুরা পাহাড় লিজ লেগা। যিতনা আয়রন ওর চাহিয়ে মিলেগা, নসীব খুশ্ হোবে তো ম্যাঙ্গানিজ ভি মিলেগা।

…শিবুবাবু এসেছিলেন সেই আদিম বড়বিলে। রাতের অন্ধকারে দেখেছিল বিমলাপ্রসাদের বাড়ির বাইরে ঝোরায় নেমেছে বাঘ। অন্ধকারে নীল চোখ জ্বলে, বাতাসে ওঠে বিশ্রী বোট্কা গন্ধ।

শিবু দত্তের সন্ধানী চোখে ওটা আগেই ধরা পড়ে।

বিমলাপ্রসাদজী বলে—হামেশাই ওরা ঘুমছে এখানে, তিন-চারটে গেটম্যানকো ভি খতম্ কিয়া।

শিবু এর আগেও তরাই-এর জঙ্গলে দুচারটা বাঘ মেরেছে, এখানের বাঘ ও ওই জানোয়ারগুলো এখনও বাধা পায়নি। দেখেছে শিবনারায়ণ ওই জঙ্গল পাহাড়ে কাজ শুরু করতে গেলে ওদের সঙ্গেও লড়তে হবে, নাহলে হাতির পাল, বাইসনের দলই এখানে থাকবে, মানুষ কোন প্রবেশ অধিকারই পাবে না এই অরণ্য পর্বতে।

বিমলাপ্রসাদজী ওর কথায় চাইল, শিবু শুধোয়।

—বন্দুক আছে আপনার বিমলাপ্রসাদজী ? রাইফেল—

অবাক হয় বিমলাপ্রসাদ। নিরীহ ধর্মভীরু লোক সে, কারবার করে কিছু পয়সা করেছে, তাই এবার শিবনারায়ণবাবুর ভরসায় পাহাড় ইজারা নিয়ে আয়রন ওর তুলবার কথা ভাবছে। কিন্তু ও রাইফেল, বন্দুকের কথা শুনে অবাক হয়।

—ওসব দিয়ে কি করবেন দত্তসাহেব ?

শিবু বলে,—ওদেরও এবার মারতে হবে বিমলা প্রসাদজী, নাহলে কাজ করতে পারবেন না এখানে। ক্যাম্প বানাতে দেবে না বনে, মজদুর লোককে থাকতে দেবে না। এখানে এসে হানা দিচ্ছে। ওরা আর বাড়বে। এই বাঁচার লড়াইএ ওদের হঠাতে হবে।

বিমলাপ্রসাদও ভাবছে কথাটা। বলে সে—

রাইফেল নেহি, সট্‌গান একঠো আছে গুদামমে।

শিবু বলে—ওই দিয়েই দেখতে হবে। আর রাইফেলের লাইসেন্স এর জন্য দরখাস্ত দিচ্ছি। ওটা দারোগাবাবুকে বলে রেকমেণ্ড করিয়ে দেবেন।

দুরাত্রি ঝোরার ধারের একটা গাছে বসে থাকার পর বাঘটাকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে দোনলা বন্দুক দিয়েই খতম করেছিল শিবু। বিরাট বাঘটার দুচোখের মধ্যে লেগেছিল বুলেটটা, ঝোরার কাদাজলে ছিটকে পড়েছিল সে।

বড়বিলের উপনিবেশে এই প্রথম শিকার, সভ্য মানুষের দিক থেকে এবার প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। শিবু দত্ত তখন থেকে পরিচিত, রাইফেলও পেয়েছিল। ঠাকুরাণী পাহাড়ে তখন সবে ঘন বন কাটাই হচ্ছে, বুনোহাতির পালও হানা দেয় ওদের ক্যাম্পে আগুন জ্বেলে মশাল জ্বেলে নয়, এবার প্রতিরোধ শুরু হয় বন্দুক রাইফেল দিয়ে।

বহান মুণ্ডাকে এর মধ্যেই সাকরেদ করে নিয়েছে শিবু। তর

মুণ্ডা ওই সারান্দার গভীর বনের মানুষ। ওর নাকে আসে বন্যপ্রাণীর গন্ধ। বাতাসে ও টের পায় তাদের গতিপথের খবর। বাঘগুলোও যেন বাহনকে চেনে, বুনোহাতির পাল চেনে বাহানের কণ্ঠস্বর। জানে এরপরই গুলীর প্রচণ্ড শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠবে, ছিটকে পড়বে তাদের দলের কোন হাতি, কাতর আর্তনাদে ভরিয়ে তুলবে আকাশ বাতাস।

…ওরাও টের পেয়েছে যে এবার লোভী দুপেয়ে জানোয়ারগুলোও এগিয়ে আসছে বনপাহাড়ে। ওদের হাতে আছে আগুনের গোলা, বিরাট হাতিটা ছিটকে পড়ে ওই আগুনের গোলার আঘাতে, পাহাড়ে যেন ঝড় ওঠে।

পাথরের খুরের গুরু গুরু শব্দ তুলে দৌড়াচ্ছে জমাট পেশীবহুল দেহ নিয়ে বাইসনের দল। হাতির চীৎকারে কেঁপে ওঠে বনরাজ্য, সাবধানী ডাকে দলের হাতিগুলোকে হুঁশিয়ার করে যুথপতি হাতিটা নামছে দলবল নিয়ে উঁচু পাহাড় টপকে সারান্দার বনগভীরে। ওরা মানুষের সঙ্গে লড়াই এ হার মেনেছে, চলেছে অরণ্যগভীর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

…শিবু দত্ত এই লড়াই-এর যেন সেনাপতি। বিমলাপ্রসাদজীও খুশী হয়—শেরকা বাচ্চা উ বাঙালীবাবু।

ঠাকুরাণী পাহাড়ের বন সাফ করে গড়ে তুলেছে লেবার হাট টিনের ছাদ দেওয়া আপিস ঘর বুলডোজার এনে ব্লাষ্টিং করে এবার আয়রন ওর তুলেছে, ক্রাশিং প্লান্ট বসানো হচ্ছে, সাইজমত লোহা পাথরগুলোকে গুঁড়িয়ে ট্রাকে করে চালান যাচ্ছে, বিমলা-প্রসাদজীও তদ্বির করছে। এখান থেকে রেললাইন বসেছে ওই পাহাড় অবধি, সোজা মালগাড়ীতে করে লোহাপাথর চালান যাবে দুর্গাপুর বার্ণপুরের কারখানায়।

আশপাশের পাহাড়ে অন্য দু একটা কোম্পানি এগিয়ে আসছে, বার্ড কোম্পানীর মত বিরাট প্রতিষ্ঠানও আসার কথা ভাবছে

সমাজের, দেশের রূপবদলের সঙ্গে সভ্যতার ঝড়ো হাওয়া এসে হানা

দিয়েছে সারান্দার এই অরণ্য জগতে। মানুষের লোভও বেড়েছে তাই এখানেও এসে হানা দিয়েছে সে।

সেই থেকে শিবু দত্ত এই অরণ্যকে চিনেছে, ভালোবেসেছে।

—সাব্।

বাহান মুণ্ডার ডাকে চাইল শিবু। হাতিটাকে ধাওয়া করে এসেছিল এত দূরে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সেটা। ওদিকে চেয়ে অবাক হয় শিবু।

একটা জিপ দাঁড়ানো। ওদিকের নদীতে নেমেছে দুজন, কি যেন পাথর তুলছে তারা। ওরা জানে না বুনো রোগ হাতিটার খবর।

চীৎকরে করে শিবনারায়ণ—ওখানে কে?

বাহান চীৎকার করে—হুঁসিয়ার হো, পাগলা হাথি নিকলা।

ওই হাঁকে চমকে ওঠে প্রভাত রায় আর মুরুং।

মুরুং লাফ দিয়ে নদীর জল থেকে একটা টিলার উপর উঠে হাত নাড়ছে এদের দিকে। দেখছে সে এদিক ওদিকে।

মিঃ রায়ও উঠে এসেছে। ওর হাতে পাথর সংগ্রহের থলিটা। জিপখানা উপরে রেখে তারা দুজনে টিলা বেয়ে নীচে নেমে এসেছিল। নামার সময়ে বুঝতে পারেনি, এখন মসৃণ পাথরের গা বেয়ে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারে কাজটা সত্যিই কঠিন। ওদিকের বনে কোথায় 'রোগ' হাতিটা ঘুরছে, তবু মনে হয় ওরা দুজন যখন এখানে এসে পড়েছে রাইফেল নিয়ে, চালাক হাতিটাও সরে গেছে এ অঞ্চল থেকে।

মুরুং বলিষ্ঠ হাতে প্রভাত রায়কে টেনে তোলে টিলার উপর। শিবনারায়ণ, বাহানও এসে পড়েছে। মুরুং দেখছে দত্তসাহেবকে।

বলে ওঠে মুরুং—মারাং শিকারী!

জোহর করে দত্তসাহেবকে। শিবনারায়ণ দেখছে ছেলেটাকে। বলিষ্ঠ গড়ন, কালো পাথর কুঁদো চেহারা, হাসে দত্তসাহেব।

—আমাকে চিনলি কেমন করে? এখানের কুথাকে ঘর তোর?

মুরুং বলে—চিনলাম সাহেব। আমার ঘর সারান্দার বনে ধরম-

পাদ বসতির ওদিকে কস্‌মো টিলায় বটে! বোরাই সর্দারের নাম শুনিস নি?

হাসে দত্তসাহেব ওই অরণ্য গভীরের সব অঞ্চল তার নখদর্পণে। ঘর অরণ্যের বুকে অনেক রাত্রি নিশীথে সে ঘুরেছে ম্যানইটার বাঘের সন্ধানে। কোন বনের শিলাপটে তার রাইফেলের গুলীতে নিহত প্রাণী রক্তের অক্ষরে নীরব ইতিহাস রচনা করে গেছে। সেইদিনও গেছল ওদের বসতিতে।

দত্তসাহেব বলে, সোনাই মুণ্ডাই বসতির বট্টিস তুই-না? হরিণ মারার জন্যে পুলিশে দিল তোকে?

মুরুং চাইল দত্তসাহেবের দিকে। অতীতের সেই বেদনার্ত স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে। এক বছর আগে সে ওই পাহাড় অরণ্য জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল ওই সোনাই মুণ্ডার জন্যই। আজ তার নাম শুনে মুরুং গম্ভীর হয়ে উঠে।

শিবনারায়ণ দত্ত বলে, আমি ওটাকে চিনিরে! তুর নামও শুনেছি!

প্রভাতের দিকে চেয়ে শুধোয় দত্তসাহেব—আপনি?

প্রভাত রায় নিজের পরিচয় দেয়।

ভূতাত্ত্বিক, এখানে সরকারী কাজে এসেছে মিনারেল ডিপজিট-এর সন্ধানের ব্যাপারে। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে এদিকে এসেছিল।

বলে মিঃ রায়।

—মনে হচ্ছে এদিকে ভালো কোয়ালিটির ম্যাঙ্গানীজ কিছু আছে। এই নদীর ধারের রিজগুলোয়। এখানে স্পেশাল সার্ভে করানো দরকার।

শিবু দত্ত এই অরণ্য পাহাড়ের কোণে কোণে ঘুরছে শিকারের সন্ধানে, নাহয় এমনি খেয়াল বশেই। নিজেও এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। তাই নিজের পরিচয় দিতে মিঃ রায়ও খুশী হন—সত্যিই আপনার নাম শুনেছি এখানে এসে, কিন্তু পরিচিত হবার সময় পাইনি। যাক্ নাটকীয়ভাবে পরিচয়টা হয়ে গেল।

শিবু দত্ত বলে—

এখানে থাকলে আমার সঙ্গে টক্কর লাগবেই কোনদিন। যাক্ চেনা শোনা হয়ে গেল, এখন ওটা এড়িয়ে চলতে হবে মশায়। আপনি বনে বনে সন্ধান করেন মিন্যারেলস্, আমিও বনে বনে ঘুরি এমনই। অবশ্য কাজ-এর ফাঁকে ফাঁকে।

প্রভাত রায় হাসছে! দত্তসাহেব বলে—একদিন আসুন, ঠিক আছে আমিই নিয়ে আসবো।

বাহান মুণ্ডা এদিকে ওদিকে চাইছে।

মুরুং বলে ওঠে—উধার! ওহি নীচে দেখো সাব্।

পাহাড়ের নীচে দূরে দেখা যায় বিশাল হাতিটা সোনা নদীর জল পার হয়ে পাহাড় বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। হাসে শিবু দত্ত —ব্যাটা শয়তান কাহিকা। একদিন তোকে খতম্ করবোই। চলুন মিঃ রায়, ফিরবেন তো ক্যাম্পে?

•

বড়বিল এখন পরিণত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ সহরে। রেল লাইনের শাখা-প্রশাখা বের হয়েছে এখান থেকে দূর দূরান্তের পাহাড় বনের দিকে। চারিপাশের আগেকার সেই আদিম অরণ্যের এখন রূপ বদলে এক কর্মব্যস্ত জগতে পরিণত হয়েছে। স্টেশনের এলাকা বেড়েছে, ওদিকের পাহাড়ের বুক কেটে থাকে থাকে উঠেছে সুন্দর বাড়ি, বাংলো বাগান। এদিকে বিরাট এলাকা জুড়ে বাজার, নিওন বাতি জ্বলে, সিনেমা হলে ওঠে হিন্দী গানের সুর; বাজারের দোকানের শোকেসে এখন রেডিও, ফ্রিজ, রুমকুলার এমন কি এ্যামব্যাসাডার গাড়িও মেলে।

....ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে, ওদিকে বিরাট কোল্ডস্টোরেজ। এখানে বনে পাহাড়ে ছড়ানো উপনিবেশের দু' তিন হাজার মনসবদারদের চাহিদা মাফিক ফল শব্জী, আর এখানে উৎপন্ন অনেক কিছুই জমা থাকে। পিচঢালা রাস্তায় ছুটে চলে জিপ—ট্রাক মালপত্র নিয়ে।

দিশী বিদেশী গাড়িগুলো কেওনঝড়, রাউরকেল্লা, জামসেদপুরের

াদকে যাতায়াত করে। কোথাও ফোনের ঘন্টি বাজে। বার্ণপুর, জামসেদপুরের নাহয় এখানকার মহাজনরা আজকের রেজিংফিগার জানতে চান, পাটনা থেকে কোন মন্ত্রী তার ভাতিজাকে ফোন করে এখানকার হালের খবর নিচ্ছেন।

রাত্রির রূপ এখানে আলাদা! চারিদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের বাধা প্রাচীর। মাঝখানের উপত্যকায় এই জনপদ, চারিদিকের অরণ্য দুর্গমে আজ বিজলীর বাতি জ্বলছে মালার মত—বাতাসে ভেসে আসছে ক্র্যাশার প্ল্যাণ্টের গর্জন। কোন দৈত্য যেন এই পাথরগুলো ধারালো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসে ওঠে বয়লারের গর্জন ট্রেনগুলো আয়রন ওর বোঝাই ওয়াগন টেনে নিয়ে আসছে। আদিম অরণ্য তাদের সন্ধানী হেড লাইটের আভায় ঝল্‌সে ওঠে। দূরে কোন পাহাড় বাংলোয় বিজলী বাতি জ্বলে।

প্রভাত রায় বড়বিলের একটা টিলার গায়ে তাদের ক্যাম্প করেছে। টিলার নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে কারো নদীর জলধারা। দু-চারটে বিরাট শালগাছ অতীত অরণ্যের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে ওঠে মহুয়া ফুলের মদির সুবাস।

দত্তসাহেব বলে—এখানেই আমি সেবার একটা বুল বাইসন মেরেছিলাম, আজ চারিদিকে দেখছেন বিজলী বাতি, কারখানা, মাইনস্‌! সব কিছুতেই মানুষ যেন দখল গাড়ছে। জায়গাটা তখনই যেন সুন্দর ছিল মিঃ রায়।

মিঃ রায় তরুণ জুয়োলজিষ্ট। অনেক অরণ্য পর্বতে ঘুরেছেন, ঘুরেছেন দণ্ডকারণ্য—বয়লাডিলা চান্দা জেলার পাহাড়ে। আসামের মার্গারিটায় কয়লার সন্ধানে, হাজারীবাগের অরণ্যে বক্সাইটের সন্ধানে, বিন্ধ্যপর্বতের দূর দুর্গমে! বলেন তিনি।

—মানুষ প্রকৃতিকে এইভাবে কাজে লাগিয়েছে।

দত্তসাহেব শুনছে কথাটা। এই অরণ্যভূমিকে সে যেন ভালোবেসে ফেলেছে। ভালোবেসেছে, চিনেছে এই জগৎ, এখানকার মানুষকে।

দত্তসাহেব বলে—প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েছে না লুট করে চলেছে

কে জানে ? আর মনে হয় এখানকার এই লুণ্ঠন পর্বে আমিও জড়িয়ে গেছি। যেভাবে এগোচ্ছে এদের লোভী হাত সেটা কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে ?

ওই পাহাড় বনের কোলে ডুংরি, এখানের আদিবাসী মানুষ, তাদের জীবনযাত্রার ধারা দেখলে মনে হবে এরা লুঠ করতেই এসেছে। এসব কিছুকে এরা শেষ করে দেবে। এই কারো নদীর ধারের অরণ্যে একদিন কি অপূর্ব শোভাই না ছিল। আজ ! আজ সেখানে রুক্ষ মাটি আর এই ইট কাঠের শেড গড়ে উঠেছে। এদিকে বনে চৈত্র মাসে ফুটতো পলাশলতা, পলাশ, গোলগোলি ফুল, বনে বনে যেন আগুন লাগতো, ডুংরিতে উঠতো মাদল ধামসা বাঁশীর সুর। সহজ সরল আদীবাসীদের জীবনে নামতো বসন্তের সাড়া ! আজ !

মুরুং চুপ করে দত্ত সাহেবের কথাগুলো শুনছে। মনে হয় অনেককিছুই হারিয়ে গেছে। সেই সবুজ—সেই ঝোরার জগৎ, দেওথানের মহিমা। সেই মানুষগুলোও আজ এখানে বসিয়েছে লুঠেরার আসর। ফুল গন্ধে সেই পাখীর ডাক শোনা যায় না। নীচের ডুংরি থেকে মাতাল কণ্ঠের চীৎকার অশ্রাব্য খিস্তির শব্দ ওঠে, একটা মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। তাকে ধরে কোন পতিদেবতা নাহয়, উপপতি-প্রবরই পিটছে মদের ঘোরে। কে গর্জাচ্ছে—খুন করেঙ্গে, চলা যাও—ভাগো হিঁয়াসে।

রাত্রির অন্ধকারে ওই বিচিত্র বসতির দিকে চেয়ে আছে মিঃ রায়। হয়তো দত্তসাহেবের কথাটা সত্যিই। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর কথা মনে পড়ে। নাড়া বইহয়া—লবটুলিয়ার শান্ত সবুজ অরণ্যেও মানুষের লোভী হাত পড়েছিল। সেখানে জুটেছিল শস্যলোভী কিছু মহাজন, কিছু চাষী। যারা অরণ্যভূমিকে নিঃশেষ করে জনবসত গড়ে তুলেছিল, যমুনাকুণ্ডীর জলে তারা পদ্মফুল ফোটাতে চায়নি ; সেই জলে হয়তো চাষবাস করে মাটির বুক থেকে ফসল আহরণ করেছিল।

কিন্তু এরা !

এরা আরও লোভী, আরও নির্মম। ওই বিশাল পাহাড়গুলোকে ফাটিয়ে তার বুক দীর্ণ করে ধসিয়ে পাহাড়গুলোর অস্তিত্ব মুছে তার বুক ক্ষত-বিক্ষত করে লোহাপাথর তুলছে। অরণ্যভূমি আর পাহাড় নিশ্চিহ্ন করে এখানকার প্রকৃতিকে লুপ্ত করে দিতে চায়, এখানকার মানুষকেও।

…মুরুং মুণ্ডা শুনছে ওদের কথাগুলো।

নিজের দেশ মুলককেও সে চেনেনি এভাবে। তার সীমানা ছিল ডুংরি আর আশপাশের বনভূমি না হয় কুদলিবাদ থলকোবাদ হাট অবধি। গুয়ার নামই শুনেছিল, তু' একজনের মুখে গল্প শুনতো গুয়া বড়বিল সহরের। রেলগাড়ীর গল্পও শুনেছিল। কিন্তু অনেক পাহাড় বন পার হয়ে সেই আলোভরা জগতে সে আসেনি।

আজ মুরুং দেখছে অনেক কিছু !

ওদিকে চালায় রান্না হচ্ছে। কাঠের উনুনে কড়াই চাপিয়ে মাংস তৈরি হচ্ছে ! ক্যাম্পের তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আলোর নিশানাছোঁয়া পাহাড় অরণ্য জগৎ। নীচেকার ডুংরির মিটি মিটি আলোগুলো নিভে আসছে। বাতাসে ওঠে ঝর্ণার ঝর ঝর শব্দ, একটা বাঁশীর সুর ওঠে বাতাসে। দূরে কোন আদিবাসী বস্তির কোন ছেলে আনমনে হারানো পাহাড় অরণ্যের স্মৃতিটুকুকে বাঁশীর সুরে মুখর করে তোলে।

হঠাৎ নীচে ওদিকে কলরব ওঠে। বনের ধারে চীৎকার ওঠে—হাথি নিকলা ? হাথি—

মশাল জ্বলে ওঠে, টিন ক্যানেস্তারা পিটানোর শব্দ ওঠে। সাইকেলের পুরানো টায়ারে আগুন জ্বেলে তারা আস্মানে ছুঁড়ছে, গাছপালা ভেঙ্গে একটা গর্জন ওঠে, তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায় হাতিটার। রাগে গজরাচ্ছে সে।

দত্তসাহেব ক্যাম্প টুলে বসেছিল, উঠে পড়েছে সে।

রাইফেল তার সঙ্গেই থাকে। দত্তসাহেব বলে—চলি মিঃ রায়, পরে দেখা হবে। ব্যাটা 'রোগ' হাতিটা বোধহয় ওদিকেই এসেছে অন্ধকারে! একবার দেখে আসি।

জিপটা হেডলাইট জ্বেলে নেমে গেল বেগে। তখনও শান্ত রাত্রির অন্ধকারে শোনা যায় হাতার চীৎকার, মানুষের কলরব, আদিম আরণ্যক জীবন যেন বাধা পেয়ে কি দুর্বার আক্রমণ রচনা করতে এসেছে এই মানুষগুলোর উপনিবেশে, ওই হাতিটা যেন এখানকার পরাজিত প্রকৃতির মতই নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত হানতে চায় এই জীবনকে।

সকাল থেকেই মেঘগুলো ঠাকুরাণী পাহাড়ের মাথায় এসে আটকে গিয়ে ওখানেই নিঃশেষ হয়ে ঝরে পড়েছে, বাতাসে ওঠে বৃষ্টির গর্জন। টিলার ওদিকে বোলানী, কিরিবুরু পাহাড়ের সবুজ আকাশসীমা ঢেকে গেছে মেঘের যবনিকায়।

মরুং চেয়ে থাকে ওই বৃষ্টিঢাকা সহরের দিকে। এমনি বৃষ্টিমুখর দিনে তারা ডুংরির মাঠে নামতো, নরম মাটি পাখনা দিয়ে ধান পুঁততো, মাঠে গানের সুর ওঠে, করমথানের ছায়া অন্ধকার পরিবেশে ওঠে বৃষ্টির ধারাস্নানের সুর। সোনাই মুণ্ডার ঘরবাড়ির টানা চালাগুলোয় বৃষ্টির ঝাঁট বাঁচিয়ে মেয়েরা শালপাতা বুনে চলে। এসময় অরণ্য জগতের কোন যোগসূত্রই থাকে না ঝোরাগুলোয় পাহাড়ী ঢল নামে। কয়নার উপর সানবাঁধানো ব্রিজ তখন জলের তলে। আর গাছ কাটাই বন্ধ, কোন ট্রাকও আসে না। রাস্তা বন্ধ।

...বৃষ্টির জলের চোটে বাঘ দু চারটে বের হয়, বুনো হাতির পাল শুঁড় তুলে ভেজে ওই বৃষ্টিতে, বাইসনগুলো লাল কাদা মেখে সবুজ কচি শাল মহুয়ার পাতা ভরা সদ্য গজানো ঘাসের বনে ঘুরে বেড়ায়। কালো ডাগর চোখ মেলে বনের হরিণ সম্বরগুলো বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ময়ূরের পেখম মেলা দেখে, সারা অরণ্যে নির্জনতা নামে। অভিসার সাজে সেজে ওঠে ওই প্রাণীজগৎ!

হয়তো কুইলি ভিজছে বৃষ্টিতে। ডুংরির সকলেই পাহাড়-এর ঢালে উপত্যকার সমতল ক্ষেতে ধান রুইতে নেমেছে। কালো

মেঘ ঝরা বৃষ্টির ঝাপটে কাঁপছে বনভূমি।

তাদের ডুংরির রূপ বদলে গেছে।

সোনাই মুণ্ডার চকমিলানো ক্ষেতে নেমেছে ডুংরির মজুরের দল। মেয়েদের গানের সুর ওঠে।

...মুরুং। এই মুরুং।

মুরুং হঠাৎ চমকে ওঠে, রায়সাহেব ডাকছেন তাকে। বৃষ্টির জন্য আজ ওরা কাজে বের হয়নি ওয়ার্ক সাইডে। ওদিকের অফিস টেণ্টে বসে সাহেব কি কাজ করছিলেন। মুরুং এগিয়ে যায়, তার সেই ডুংরির স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

—স্যার!

প্রভাতবাবু বলেন—কি রে বৃষ্টির দিনে বনপাহাড়ে এসে কবি হয়ে গেলি নাকি? শোন, একটু কফি বানা। ও-বেলায় হাটে গিয়ে কিছু রসদপত্র আন, পেট তো মানবে না।

মাথা নাড়ে মুরুং—যাবো স্যার।

কফি নিয়ে টেণ্টে ঢুকে দেখে সাহেব বড় টেবিলে ছবি আঁকা কি মস্ত কাগজ মেলে দেখছেন নিবিষ্ট মনে। বাইরে বৃষ্টি কখনও থামছে, কখনও ঝির ঝির করে বাড়ছে।

কফির মগটা নামিয়ে দিয়ে চাইল ওই ছবিটার দিকে। সবুজ-লাল-হলুদ নানা রং-এ চিত্র বিচিত্র একটা মস্ত টেবিলজোড়া কাগজ। সাহেব বলেন।

—এই দিকটা চিনিস? ত্যাখ তো? এই কিরিবুরু আর এটা সারান্দার বনের মুখে বোমাইবুরু গেট, এইটা কিরিবুরু গুয়া রোড। তারপরই শুরু হল তোদের এই ছাতাবুরু পাহাড়।

ঝুঁকে পড়ে দেখছে মুরুং। এমনি ছবিওয়ালা দেশের নানা কাগজ দেখেছে মুরুং ললিত ভাই-এর কাছে চাইবাসার জেলারের বাসায় ফালতু খাটার সময়। তখন থেকেই ললিত ওকে পড়তে লিখতে শিখিয়েছিল। সেই বইপত্র আর তু-চারখানা বই পড়ে সঙ্গেই এনেছে, অবসর সময়ে পড়ে।

তাই ম্যাপে বড় বড় করে লেখা ইংরাজী অক্ষরগুলো পড়ে চমকে ওঠে সে, সা রা ন্দা !

—কিরে ইংরাজীও পড়ছিস দেখছি ?

মিঃ রায় ওর দিকে চাইলেন, সলজ্জভাবে হাসে মুরুং ! বোমাইবুরু থেকে একটা লাল দাগ চলে গেছে পাহাড় বনের মধ্যে দিয়ে, ছাতাবুরু ডাইনে ফেলে।

মুরুং-এর এজগৎ চেনা, এপথের গাছ গাছালি মারাং বুরু-মেঘনাবুরু-কয়না নদীর ধারা, শাল সাগোয়ানা বন পথে বহুদিন ঘুরছে সে।

সেই সোদা ভিজে বনকুটির গন্ধমাখা পথে যেন হারিয়ে গেছে ছেলেটা।

ওই পথরেখা সে চেনে। অরণ্য গহনে শাল সেগুনের ঘনবন, বাতাসে ওঠে বনের নিজস্ব একটা ভিজে ভিজে পাতাপচা—ফুল-ফোটার গন্ধ মেশা আমেজ। কোথায় বাজবৌরী, নীলকণ্ঠ, ধনেশ, বনটিয়া, ময়নার ডাক শোনা যায়। গাছের ডাল কাঁপিয়ে একটা ময়ূর বিচিত্র পেখম মেলে উড়ে যায় অন্য ডালে।

...এ পথটা এসে নেমেছে কয়নার জলে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে মিঃ রায় দেখছে মুরুংকে। মুরুং বলে ওঠে।

—এইটা ধরমপাদা।...

গহন বনের মধ্যে একটি ছোট্ট বিন্দু, তার ওদিকেই তাদের বসতি।

বলে ওঠে মিঃ রায়—এদিকেই যেতে হবে এবার। তা হাতি বাঘ, বাইসন আছে নাকি রে ?

চমকে ওঠে ছেলেটা—উখানে যেতে হবে ? তা বাঘ হাতি বাইসন থাকুক না কেনে উরা কিছু বলবেক নাই।

আশা ভরে ছেলেটা শুধোয়—কবে যাবো সিখানে

মিঃ রায় কি ভাবছে। ছেলেটা যেন ওই বনগহনে যাবার জন্য অস্থি হয়ে উঠেছে। ওর মুখচোখে কি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে

মিঃ রায় বলে—শীগগীরই যাবো এবার।

সোনাই ডুংরিতে ফিরে তার নতুন কারবারের কথা জানায়নি, চাইবাসা যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। এবার চাইবাসা থেকে ফিরছে। মুরুং-এর কোন খবরও পায়নি। ভেবেছিল মুরুংকে নিয়ে এসে কুইলিকে মকে দেবে। কিন্তু তা হয়নি।

এবার সোনাই মুণ্ডা কুইলিকে সে জামদা-বড়বিলের ইস্কুলেই পড়াবে, দেখেছে তাদের স্বজাতি অনেক আদিবাসী মেয়েরা পড়ছে। দুর্গা রায়ানকেও দেখেছে। একটি মেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে। ডুংরির এই জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে এইবার কুইলিকে।

কুইলিও শুনেছে মুরুং খালাস পেয়েছে। জেলে থাকার সময় নাকি জেলার সাহেবের দয়ায় লেখাপড়া শিখেছে। এই বনপাহাড়ের দিকে সরকারী কাজ নিয়ে এসেছে।

সোনাই মুণ্ডা বলে—তার খপর পাবো রে!

কুইলি চুপ করে থাকে।

বৃষ্টিনামা অরণ্য, ডুংরির মানুষগুলো দিনভোর মাঠে খেটেই সাঁঝ-বেলাতেই শুয়ে পড়ে। বনে বনে গাছে পাতায় ওঠে বৃষ্টির শব্দ, ঝারাগুলোর যেন মাতন বেড়েছে।

বোরাই সর্দার এবার হার মেনেছে। খবরটা পেয়েছে সেও। তবু মুরুং এখনো ফেরেনি। খালাস পেয়ে দিকুদের সঙ্গে চাকরী নিয়ে চলে গেছে।

বোরাই সর্দার ঝিম মেরে থাকে। বলে সে'—ই হবেক সোনাই। একবার যে সারান্দার বনপাহাড়-এর উদিকে যায় দিকুদের নিশায় পড়ে সে। তাই আমাদের জেতের উদিকে পাহাড় টপকাতে মানা ছিল। সেদিন গুণা লাগবেক। বন হাসিল হয়ে যাবেক, ঝোরার ধারা ফুরাই যাবেক, বসুমতি ঝাঁইপোড়া হবেক।

সোনাই এর ভালো লাগে না ওই কথাগুলো। নিজে দেখেছে কিভাবে বনের অন্ধকারে পড়ে পড়ে হারিয়ে যেতে হবে ওদের, বাইরের

ঝড় এগিয়ে আসছে ওই পাহাড় বনের প্রহরা পার হয়ে, সেই ঝড় এদের এতদিনের সংস্কার, শান্ত সুন্দর জীবনধারাকে শেষ করে দেবে। বোরাই সর্দার যেন সেই রহস্যময় আরণ্যক জীবনের শেষ প্রহরী !

সোনাই ঘরে ফিরেছে টিপ্ টিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। ঘরে ঢুকে ওদিকে সোয়ীকে দেখে চাইল। ক্ষারে কাচা কাপড়টা টানকরে পরা, মাথায় হাটে কেনা কড়া গন্ধওয়ালা ফুলের তেল দিয়েছে। মেয়েটাকে দেখে আজ সোনাই থমকে দাঁড়ায়, সহরে দেখা সেই দুর্গা রায়ান-এর কথা মনে পড়ে।

সোয়ী বলে—কি গো সর্দার ! বাদলায় ভিজে এলা টুকচেন খাবা নাই ? কাল ঘরে তোলাইছি তাজা মৌ গো।

বোতলটা বের করে। সোনাই বলে—শরীরটা ভালো নাই, খাবো নাই।

সোয়ী দেখছে ওকে। চতুর মেয়েটা বলে ওঠে।

—সহর থেকে ফিরে এলে দেখি আর লজর ধরে না। কিগো ! নতুন দিখুদেরনাইয়ার লিশা লেগেছে নাকি ? অয় বাপ !

সোনাই ধমকে ওঠে—থামবি তুই ! যা দিকি আজ !

সোয়ী বের হয়ে এল।

সোয়ীর মনেহয় সোনাইও বদলে গেছে ক্রমশঃ। আবছা অন্ধকারে ওদিকের কাঁঠাল গাছের অন্ধকারে মুনিমজীর ঘরের দিকেই এগোলো মেয়েটা। রাতের অন্ধকারে ও যেন কোন ছায়ামূর্তির মতই ঘুরছে কি আরণ্যক বুভুক্ষা নিয়ে।

মতি মুণ্ডার ঘুম আসেনি।

লোকটা দেখেছে অনেকদিন ! ক্রমশঃ সব কিছু সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তার। তোকি বুড়ি বলে—কুথাকে যায় বৌটো রাতভোর ?

মতি ইদানিং লেংচে লেংচে চলে, একটা হাত অকেজো হয়ে গেছে, তবু বাঁ হাতের জোরটা বেড়েছে। কুঠার চালায়—কাঠ কাটে

ওই বাঁ হাতে কাৎ মেরে। বনবাবুদের ফাইফরমাস খাটে। বনবাংলায় সাহেবরা এলে খিদমৎগিরি করে।

…কদিন ধরেই মতি দেখছিল ব্যাপারটা।

ওই টয়াই মুনিমজীদের সঙ্গে বনের আনাচে কানাচে ফিস্ ফিস্ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে ওদের গায়ে, দেখেছে বুড়ো মুনিমজীর শীর্ণ কাঠিমত হাতের আঙ্গুলগুলো ওই মেয়েটার সর্বাঙ্গে কি খুঁজে বেড়ায়, বেসরম জানোয়ারটা হাসে।

আজও বৃষ্টির রাতে বের হয়েছে মতি। বনবাংলো থেকে ফিরছে, হঠাৎ হাসির শব্দ সে চেনে। সারা শরীরে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। সোয়ীর নধর নিটোল দেহটা কি নেশা জাগাতো—আজ সেই নেশা মাদকতায় পরিণত হয়েছে নিবিড় হিংস্রতায়। যেন একটা হাত দিয়েই ওই স্বৈরিণীর টুটি টিপে ধরবে! শেষ করে দেবে ওই শীর্ণ লোকটাকেও।

…জোরে বৃষ্টি নামে। ঝড়ো হাওয়ায় ছাতা মেলা আমগাছের একটা ডাল ভেঙ্গে পড়লো, মেঘ ডাকছে। চাপা হুঙ্কারের মত শব্দটা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

লোকটা সরে এল। ঘরের দিকে চলেছে লেংচে লেংচে। তবু রাগটা গুমরে ওঠে কি নিষ্ফল আক্রোশে। একদিন সে এর জবাব দেবেই।

…চাষবাষ শেষ হয়েছে। উপত্যকায়—পাহাড়ের ঢালু জমিতে ধানগাছগুলো ঘন সবুজ হয়ে আসে। সোনাই চলেছে শহরের দিকে। চাইবাসায় গিয়ে এবার পাহাড়ের ডিডটা নিয়ে আসতে হবে।

বিমলাপ্রসাদজীও ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সেখানেই দত্তসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। শিবু দত্তও সোনাই-এর কথা শুনেছে। খুশি হয় সে। জানায়—খুব ভালো কাজ করেছো সোনাইজী। বাইরের লোক এসে বনপাহাড় লুঠে বড়লোক হয়ে গেল। এ মাটির লোক তোমরা—তোমরাও এগিয়ে এসো। অবশ্যি লাভ আমারও।

সোনাই শুধোয়—কেনে দত্তসাহেব?

শিবু দত্ত বলে—তোমার মাইনস্ হোক, আমার যন্ত্রপাতি কি বিক্রী হবে। চালিয়ে যাও সোনাইজী! আমি আছি।

সোনাই মুণ্ডা বলে—চেষ্টা করছি দত্তসাব্!

দুর্গারায়ান-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। চিঠি দেবে ও কা সর্দার।

সোনাই মুণ্ডা পাহাড়ের গায়ে বাংলোয় গিয়ে ঢুকেছে। পুরা দু একটা আমগাছ সিলভার ওক এখনও সেখানে অতীতের কো বিদেশী অতিথির চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গা রায়ান এগিয়ে আ —আপনি! আসুন! আসুন!

সোফায় বসতে ইতি উতি করে। দুর্গাও বুঝেছে সেটা। ব সে,—বসুন! চা আনাতে বলি!

বৈকাল নেমেছে পাহাড় বনে। ওদিকের পাহাড়ে সারবন্দ আলো জ্বলে, নীচের উপত্যকায় দেখা যায় আলোর মালা, বড় বি শহর ওদিকে নোয়ামুণ্ডির পাহাড়ে আজ মানুষ গড়ে তুলেছে তাদে প্রতিষ্ঠা। ওদিকে সারান্দার গহনেও এবার এগিয়ে যাবে এদে হাতটা।

দুর্গা রায়ান বলে—এ হবেই সোনাইজী। আগে এখানেই ছি এমনি বন, এখন শহর। আমাদেরও দিন বদলাবে।

সোনাই ওকে যেন ভরসা করতে পারে। বলে সে।

—ভাবছি মেয়েকে এবার এখানেই আনবো। স্কুলে ভর্তি ক দিই!

কুইলির কথা এবার নতুন করে ভাবছে সে। মুরুংকে ভু যাক—এবার ও ডুংরি থেকে মেয়েকে এনে এই জগতের মতই মানু করবে।

দুর্গা বলে—তাই করুন!

সোনাই অসহায়ের মত বলে—মা মরা মেয়ে, এখানে আসে কখনও, নতুন জায়গা।

হাসে দুর্গা—আমরা তো আছি।

সোনাই আজ যেন কি আশ্বাস খোঁজে ওই মেয়েটির কাছে। তাই ভরসা করে ওই টিলার ওদিকেই কিছুটা জায়গা কিনেছে। একটা আশ্রয় এখানেই তৈরি করবে।

দুর্গা রায়ান বলে,—ভালই হবে। মেয়েকে আনুন। আমিই ওকে ফাদার লেভির স্কুলে ভর্তি করে দেব। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

সোনাই চেয়ে থাকে ওর দিকে। আজ তার অজানতেই সোনাই ওই মেয়েটিকে যেন অনেকখানি সহজ করে নিতে পেরেছে। হয়তো সব কাজই সহজ হয়ে যাবে।

ভয়ও হয় সোনাই এর। তাই বলে—এতবড় কাজে হাত দিচ্ছি, কি হবে জানি না।

দুর্গা রায়ান দেখছে ওই মানুষটিকে। মাটির গন্ধ, বনের কাঠিন্য নিয়ে এসেছে সে। এখানে যাদের দেখেছে এ তাদের মত নয়। দুর্গার এতগুলো বছরের জীবনটা অনেক বেদনা আর আঘাতে ভরা। জীবনের ইতিহাসও তার কিছু রহস্যময়। কোন ডুংরি থেকে তার মা এসেছিল সেদিনের বিদেশী কোন সাহেবের বাংলোয়।

আজ ফাদার লেভি না থাকলে দুর্গা রায়ান কোথায় অন্ধকারে হারিয়ে যেতো। জীবনে সে পেয়েছে বঞ্চনা আর দুঃখ। তার মাঝে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে সে।

দুর্গা বলে—আমিও অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছি সোনাইজী, কষ্ট করে সৎ পথে থাকলে সব কাজই হয়। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

সোনাই মুণ্ডা হাসে।

—ব্যবসার পথটা যে সোজা নয়, সৎও নয়। তাই ভয় হয়।

দুর্গার কাছে সে আজ আশ্বাস পেতে চায়। এগিয়ে যাবার ভরসা চায়।

…চাইবাসা কোর্ট থেকে গিরজাপ্রসাদজীই ওকে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করেছে। সেইই বলে—একটা জিপও নিতে হবে প্রসাদজী,

নাহলে বনপাহাড়ে খাদানের কাজ, কাঠ এর-ব্যবসা এসব করবেন কি করে ?

ওটার দরকার। ওসবদিক ভেবে রাজী হয়েছে সোনাই। পুরোনো একটা জিপ দেখেশুনে কিনে ফেলে পরদিনই। সোনাই মুণ্ডা যেন ধাপে ধাপে এবার উপরে উঠেছে।

খুশিমনে ফিরছে তারা ওই জিপ নিয়ে। সোনাই মুণ্ডা বলে—নিজেই চালাতে শিখবো ইবার জিপটা !

গিরজা বলে—তাতো হবেই।

সোনাই মুণ্ডার ছবিটা ভাবতে ভালো লাগে। নিজে জিপ চালিয়ে ডুংরিতে যাচ্ছ। এবার ডুংরির ছোট খাটো মহাজনও নয়, নিজেই খাদান করবে। সহরে হবে ছোট একটা বাড়ি। কুইলিকেও সে দুর্গার মত করে লেখাপড়া শিখিয়ে নতুন করে গড়বে।

ভূধর পাঠকও সব খবরই রেখেছে সোনাই-এর। ধূর্ত লোকটা শুনেছে সোনাই-এর ওই মাইনস ইজারা নেবার ব্যাপার। কদিন ধরে খুঁজেও পায় না তাকে। হঠাৎ আজ ওই জিপ নিয়ে ফিরতে দেখে ভূধর পাঠকও এগিয়ে আসে ওই আস্তানায়।

কাঠ, ফালতু কাঠের ছালট দিয়ে তৈরি একটা ঘর কাঠ-এর গোলার ওপাশে। সোনাই ওখানেই রয়েছে। নতুন জায়গাটায় বাড়ি তোলার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বিমলাপ্রসাদজীর লোকই কাজটা করে দিচ্ছে, সোনাই এবার হিসেব করতে বসে একটু ঘাবড়ে যায়, নানা কাজে অনেক খর্চা হয়ে গেছে। জমানো টাকার অনেকটাই বের হয়েছে, টাকার আরও দরকার।

হঠাৎ ভূধরকে আসতে দেখে চাইল।

—রাম রাম সোনাইজী। এখন তো রহিস আদমী হয়ে গেলে !

সোনাই মুণ্ডা আগেকার মতই সরল রয়ে গেছে। ভূধরজীও তার মহাজন, তাই সোনাই বলে—কি যে বলেন পাঠকজী ?

ভূধর পাঠক বলে—অনেক ব্যবসা তো ফাঁদলে সোনাই, টাকা

কিছু নগদা কামাই করো ; এসব ব্যবসা তো গাছ পোঁতার মতই। সময় নেবে ফল ফলতে, লেকিন এখন খর্চাই করে যেতে হবে।

তব্ রূপয়া তো চাই।

কথাটা সত্যি। সোনাই কি ভাবছো।

ভূধর পাঠক অনেক রকম ব্যবসাই করে। তাই ভয় হয় সোনাই-এর ওর সঙ্গে দিল দোস্তি করতে। কিন্তু টাকার ব্যাপারটাও ভাবতে হচ্ছে।

ভূধর বলে—কোন ঝামেলা হবে না সোনাই। কারবারে সব খর্চা আমার। শুধু বনের বহুৎ ভিতরে কোন পাহাড় গুহা হলে ভালো হয়। তোমাদের লিগিরদার ঐদিকে কোথায় পাহাড়ে শুনেছি বহু বড়া বড়া কেভ পাথরকা ছায়ি ছয়ি চটান আছে না ?

সোনাই দেখেছে সেই বোঙা বুরুর চটান—আর পাথরের গুহা প্রসাদগুলো। এখন সেখানে গভীর জঙ্গল, পথও তেমন নেই। লিগিরদার জলা হাতি—বাঘের আস্তানা, তার ওদিকে ঘন চাঁহড়—শাল—আসান বনের ওদিকে গুহাগুলো রয়েছে। এককালে ওখানে ছিল আদি পুরুষ মুণ্ডাদের কোন রাজার প্রাসাদ।

এখন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ। মানুষজনও যায় না। কোন এক রহস্যময় সেই ঠাঁই ওদের বোঙার আসন বলেই গণ্য হয়ে আসছে।

সোনাই মুণ্ডা দেখছে পাঠকজীকে।

ভূধর পাঠক বলে—ওখানে কিছু কাজ কাম করবো। মাল তৈয়ার হবে, আমার ট্রাক, লোকজন, মাল আসবে। জঙ্গলের মহুয়া গাছ মকাই সব কিনে দিব।

সোনাই অবাক হয়—মদের ভাটিখানা খুলবে ওখানে ?

হাসছে ভূধর পাঠক। ব্যাগ থেকে হাজার কয়েক টাকার নোটের তাড়া বের করে বলে—লাইসেন থাকবে সোনাই। শোচোমৎ। ওখানে কাঁটা মাল মিলবে, সস্তায় মাল তৈয়ার হবে। আর মালুম উ পাহাড়ের ঝর্ণার পানিতে সরেশ মাল তৈয়ার হোবে। আরে বিলাইতি স্কচের এত্না নাম কাহে মালুম ?

এসব তত্ত্বকথা সোনাই জানে না। ভূধর পাঠক বলে।

—স্রিফ উস্ মুলুককা ঝোরাকা পানি এইসা—যে পিবেতো নিশা হোয়ে যাবে। তুমাদের উস্ পানিভি এইসা হ্যায়।

লেও! রাখো। রুপেয়া। মাল যা হোবে—চার আনা নাফা তুমার। পাঠকজী ইমানদার আদমী, জরুর ঠকাবে না তোমাকে।

সোনাই মুণ্ডা কি ভাবছে। বলে সে।

—শেষকালে বিপদে পড়বো না তো?

হাসে পাঠকজী খিক্ খিক্ করে। বলে সে।

—তুমাকে শোচতে হোবে না। তোমার মুনিমজী টুয়াই হুঁশিয়ার আদমী। ওরাই দেখ ভাল করবে। তুমি মুফৎসে—মাহিনা মে তুতিন চারহাজার রুপেয়া কামাই করবে!

চলো—কালই যাবে জঙ্গলমে তুমার সাথ! কাজকাম শুরু করে দিই গণপতিজীর পূজো দিয়ে। হ্যাঁ।

পাঠকজী চলে গেছে।

তখনও কি ভাবছে সোনাই। টাকাগুলো সামনে রয়েছে। তাড়া তাড়া নোটের বাণ্ডিল। ওগুলোর দিকে চাইতে যেন ভয় পায় সোনাই। মাসে তিনচার হাজার টাকা আসবে। এখনই হাতে এসে গেছে অনেক টাকা। সোনাই বদলে যাচ্ছে।

…মনের সেই সবুজ স্নিগ্ধতাটুকু যেন কি উত্তাপে কঠিনতর হয়ে ওঠে। দুর্গা রায়ানের নিটোল দেহ—তার ডাগর দুচোখের হাসি সেই থমকে যাওয়া যৌবন—সবমিলিয়ে সোনাইকে ডাক দেয় কোন অজানা জগতে। বনের শ্যামল নির্জনকে সে ভুলে যেতে চায়, অরণ্যের অন্ধকার থেকে আসতে চায় আলো ঝলমল এক স্বপ্নময় জগতে।

শীতের কন্‌কনানি তখন বনে বনে জাঁকিয়ে বসেছে। শাল, মহুয়া সেগুন গাছের পাতাগুলো দমকা বাতাসে উড়ে চলেছে দল বেঁধে! পত্রহীন গাছগুলো পাহাড়ের বুক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর মধ্যে এসেছে শালগাছে নতুন পাতা. শালফুলের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে বাতাসে, পত্রহীন মহুয়া গাছের ডালে ডালে এসেছে

থগাবন্দী ফুলের কুঁড়ি। দিনমানে ওদের সাড়া মেলে না। রাতের অন্ধকারে মহুয়া ফুলগুলো চোখ মেলে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় যৌবন-মদির সুবাস।

রাতভোর অরণ্যের অভিসারে ওরা ক্লান্ত হয়ে ডুরখা ইপিল ওঠার পানে চেয়ে থাকে, পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে মুক্ত নীল আকাশের আঙ্গিনায় হিম ঝরে, কুয়াসার চাদর জড়িয়ে আসে নাচনীর দল, আবার উজ্জ্বল শেষ রাতের শুকতারা জেগে ওঠে। ডুরখা ইপিল ওঠে—আর রাতভোর মুসায়েরা সেরে মহুয়ার দল এক রাত্রের পরমায়ু শেষ করে মাটিতে ঝরে পড়ে। ওদের বিষাদভরা ম্লান সুবাস বন ডুংরিকে ভরিয়ে তোলে। ভালুকগুলো শেষরাতে ভরপেট মহুয়া খেয়ে এবার ঘনবনের গভীরে হারিয়ে যায়।

ভোরের আলোয় ডুংরির মানুষগুলোর ঘুম ভাঙ্গে, বনভূমি তখন বনটিয়া, ময়না—খঞ্জন ময়ূরের ডাকে ভরে ওঠে, দু একটা হরিণ ভোর রাতে জল খেয়ে পাখীর কলরবে বিরক্ত হয়ে লাফ দিয়ে অরণ্য গহনে হারিয়ে যায়।

সুরু হয় ডুংরির মানুষগুলোর দিন।

কুইলি, রূপা, গৌরী, ফুটকি আরও অনেক এসেছে মহুয়া কুড়োতে। সাদা ফুলগুলো গাছের তলা বিছিয়ে পড়ে থাকে, ঝোরার ধারের মাঠগুলোয় ওরা মকাই বোনার জন্য চাষ দিচ্ছে, গদলুর খেতে হলুদ আভা এসেছে। লাল টক ট্যাড়সের গাছগুলো সবুজ অরণ্যে যেন রক্তের ছোপ আনে। এবার ফুটতে সুরু হয়েছে পলাশ ফুল।

....কুইলি তবু আনমনে চেয়ে থাকে ওই লাল কাঁকর ছড়ানো পথের দিকে। পথটা ডুংরির দু চারটে ঘর ছাড়িয়ে মাঠের সীমা পার হয়ে ঘন দীঘল শালবনের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ওই পথ দিয়ে একদিন মুরুংকে সিপাই পুলিশের দল তুলে নিয়ে গেছল। আর ফেরেনি সে। কতোদিন হয়ে গেল। বর্ষা এসেছিল আকাশ ছেয়ে,

শরৎ এল—ধানপাকার পরব এল, এল কন্‌কনে শীতের রাত, তারপরও পাতাঝরা বনে এল মহুয়া ফোটার পালা, পলাশ গোলগোলির আবীর ছড়ালো বনে বনে, কচি ঢোলা ঢোলা হাতীর কানের মত সেগুন পাতায় কতো শিশির ঝরে গেল।

মুরু আর ফেরেনি। তবু মেয়েটা ওই বনের দিকে পথ চেয়ে থাকে।

গৌরী, বুধিয়া পাখী আরও মেয়েরা কেন্দুপাতা তুলছে, কচি বেগুনে গোলাপী আভা আনা পাতাগুলো তুলছে তারা। মাসখানেক ধরে এই কেঁন্দুপাতা তোলার মরশুম, তারপর এ পাতাগুলো শক্ত হয়ে যায়। এখন ভেলভেটের মত নরম আর মসৃণ। ওরা শ'দরুণে পাতা তুলে গোছ করছে। গৌরা বলে—হাঁ করে কি ভালছিস লা ?

বুধিয়া নিটোল কোমর বুক দুলিয়ে গেয়ে ওঠে—

মনের কাথাঞ এই আনা হরাধন।
মান মানম্ উইজার হারাধন॥
নাগর—মনের কথা কই তোমাকে গো.
মনে মনে তুমি বই আর জানি না!

হেসে ওঠে মেয়েরা। কুহলি চমকে ওঠে। মনে হয় তার মনের অতলের সেই যন্ত্রণা—ভালোবাসার কথা বোধহয় এরা জেনে ফেলেছে। ধমকে ওঠে কুইলি—থামবি এ্যাই বুধি! কে আমার নাগর রে?

—এ্যাঁ।

বুধিয়া কিছু বলার আগে গৌরী চাইল ওর দিকে। মুরু-এর সঙ্গে ওর মনের গোপন ভালোবাসার সে নীরব সাক্ষী!

গৌরী বলে ওঠে—শুনলাম বটে মুরু খালাস হইছে। তা যখন এল নাই তার জন্যে ভাবিস কেনে লা? বনের পাখীর জন্যে পীরিত! অমন পীরিতের মুখে মারি ঝাঁটা!

হাসছে মেয়েরা। হঠাৎ টুয়াইকে দেখে চাইল ওরা। টুয়াই এখন সোনাই মুণ্ডার বনের কাজকর্মের ম্যানেজার। একটা ঘোড়াও কিনেছে। অবশ্য তেমন তেজী কিছু নয়, টুয়াইও লম্বা লিকলিকে—এ বনের বসতে

দুধ, মুরগী আণ্ডা খেয়েও গায়ে গত্তি লাগেনি। ঘোড়াটাও তেমনি, বুকের পাঁজরাগুলো গোনা যায়। আর শান্ত, বোধহয় নড়াচড়ার সাধ্য তেমন নেই। টুয়াইও ওই ঘোড়ায় চড়া নিরাপদ ভেবেই লম্বা দুখান ঠ্যাং দুদিকে •লগির মত বের করে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য ঘোড়ায় চড়ার জন্যে তার মেজাজটা এখন বীরপুরুষের মতই হয়ে ওঠে। ধমকায় সে।

—হাসছিস কেনে? এ্যাই মাইয়াগুলান? পাতা তুলগে যা!

হাসে বুধিয়া। বলে—

—হাসছি তুমার ঘোড়াকে দেখে গ। দ্যাখো ঘুমাই গেছে নাকি গ! অয় বাপ্—ঘোড়ায় চড়ে যা মানাইছে তুমাকে। বাহারের কিন্তু!

ওদের প্রশংসায় টুয়াই একটু থমকে যায়। কুইলির দিকে চেয়ে থাকে। টুয়াই ওই ক'মাসে কুইলির দিকে এগোবার অনেক চেষ্টাই করেছে, ঘোড়া সওয়ার হওয়া ওই জন্যে।

মেয়েরা পাতা তুলছে। কুইলি বসতির দিকে ফিরছে।

...হঠাৎ ওদিকে একটা কুল ঝোপের পাশে টুয়াইকে দেখে চাইল।

টুয়াই এর মধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে যায়।

কুইলি পথে ওকে দেখে বলে—সরো ঘরকে যাবো।

টুয়াইএর শীর্ণ মুখে হাসির আভাস আসে। কুইলির মনে হয় একটা বুড়ো বাঁদর যেন হাসছে। হাসলে টুয়াই-এর শীর্ণ মুখের রেখাগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। টুয়াই বলে—

—ঘরকে যেয়ে কি হবেক? তার চেয়ে চল লিগিরদার জলার ধারে ঘুরে আসি। কাঠ কাটাই হবেক উখানে মালগুলান দেখে আসবো।

কুইলি বিরক্ত হয়ে বলে—কাঠ কাটতে আমি যাই না।

—তবে কি পড়া লিখা করবি হে? টুয়াই শুধোয় ওকে।

কুইলি বলে—আমার খুশি!

হাসছে টুয়াই—মুরুং নাকি জেহেলে থেকে লিখাপড়া শিখেছে?

তা গেল কুথা সিটা? দিখুদের উখানে কুথাকে ভেগেছে। আর বেশ জানে সে, ইবার ইখানে ফিরলে তাকে খতম করে দেবে। তাই আসে নাই!

কুইলি ভাবছে কথাটা।

—কুইলি!

টুয়াই যেন ব্যাকুল স্বরে ওকে ডাকছে। কুইলি চমকে ওঠে। টুয়াই-এর হাতখানা ওর হাতে, ওর সারা শরীর জ্বলে ওঠে। টুয়াই বলে।

—মুরুং জেলখালাস হই ফিরবেক নাই। তালে কেনে ওর জন্যে মন খারাপ করবি? আমি কমতি কিসে? তুর বাবার সব কাম দেখভাল করি। ইসব কারবার বজায় থাকবে।

কুইলি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—তুইতো মাইনে করা নোকর! খপরদার আমার গায়ে হাত দিবি না!

বের হয়ে আসছে কুইলি।

নোকর! টুয়াই ওর কথায় জ্বলে ওঠে। মনে হয় মেয়েটার উপর লাফ দিয়ে পড়বে। হঠাৎ ঘোড়াটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। মেয়েটা নয় ঘোড়াটা কাছে এগিয়ে আসে। গলা বাড়িয়ে দেয়।

কুইলি নয় ঘোড়াটা যেন ওর আদরের যোগ্য। বিরক্তি ভরে ওই জানোয়ারটার কাঁধে একটা থাপ্পড় মেরে হঠিয়ে দেয় টুয়াই।

—চল। হঠ্‌বে।

কুইলি হেসে ফেলে—কেনে রে! ওকেই একটু আদর কর। বড় প্যারের কিনা। তোর প্যারের মর্ম ওই বুঝবে! হঠ্‌।

হঠাৎ একটা গুরু গুরু শব্দে বনের বাতাস ভরে ওঠে। দূরের আকাশছোঁয়া শালবন সীমায় কয়েকটা পাখী ডাল ছেড়ে উঠে পড়ে। কোথাও বিরক্ত হয়ে কয়েকটা হনুমান গুরু-গম্ভীর শব্দে অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করে।

জিপ্-এর শব্দ।

চমকে ওঠে কুইলি।

মুরুংকে সেবার ধরে নিয়ে যাবার সময় ওরা এই জিপে এসেছিল। আজ হয়তো তাকে ফিরিয়ে দিতে আসছে। ফিরছে তার মুরুং।

—কুইলি! ডাকছে টুয়াই!

ওর ডাকে সাড়া দেবার সময় নেই।

কুইলি চলেছে ওই রাস্তার দিকে। ছুটে বের হয়ে আসে টিলার বন থেকে রাস্তার দিকে। একটা নতুন জিপ গাড়ি বনের গভীর থেকে বের হয়ে ওদিকের ঘরের পেছনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে লালধুলো উড়িয়ে। জিপে রয়েছে সোনাই আর কে একজন!

—বাবা! এ বাবা!

কুইলিও চীৎকার করে ওঠে। সোনাই মুণ্ডা নতুন জিপ নিয়ে ডুংরিতে ফিরছে। পিছনে দৌড়চ্ছে কুস্‌মা বস্তির আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা। জিপটা থেমে গেছে।

ভূধর পাঠক জিপটাকে থামতে দেখে চাইল। সোনাই মুণ্ডা বলে ওঠে—আয় কুইলি!

এর মধ্যে মালিককে দেখে টুয়াই টিলার উপর থেকে ঘোড়াটাকে চাব্‌কে প্রাণপণে দৌড় করিয়ে এদিকে আসছে। নীচু পাহাড়ী পথে হঠাৎ ঘোড়াটা চাবুকের ঘায়ে গতিবেগ বাড়াতেই ছিটকে পড়ে টুয়াই, অবশ্য লগির মত দুখানা পা দুদিকে দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ঘোড়াটাও দুই ঠ্যাং-এর নীচে দিয়ে স্যাৎ করে গলে দৌড়ছে, আর ছিটকে পড়েছে টুয়াই।

হাসছে কুইলি। মেয়েরাও।

বুধি বলে—ধরে তুলবো নাকি গ সাহাব!

টুয়াই তখন কোনরকমে হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে যায় সে মালিকের দিকে। ভূধর পাঠকও এসেছে ওর সঙ্গে জীপে।

সোনাই মুণ্ডা পরিচয় করিয়ে দেয়—আমার মেয়ে, জোহর কর কুইলি পাঠকজীকে। আমার মিতে বটে! মস্ত লুক রে!

হলদে মোটা কাপড় পরনে। উর্ধ্বাঙ্গে একটা জামা অবশ্য পরেছে কুইলি। মাথার চুলগুলো টান করে বাঁধা। কালো চুলে টকটকে লাল

গোলগোলি ফুল গুঁজেছে—যেন আগুনের ফুল্কি একটা। সভ্যতার মেকি পালিশ নেই, কিন্তু ওর উদ্দাম দেহ ঘিরে একটি সজীব কমনীয় লাবণ্য সহজেই চোখে পড়ে, রসের স্নিগ্ধতায় ভরপুর।

সোয়ীও এসেছে। ডুংরির সকলেই দেখছে সোনাই মুণ্ডার জিপটাকে। আর সোনাইকেও। ভূধর পাঠক সঙ্গে থাকার জন্য সোনাই মুণ্ডা তার নিজের প্রতিষ্ঠা দেখাবার জন্যই যেন ওদের সঙ্গে কথা বলে না।

মতিও এসেছে লাঠিতে ভর দিয়ে। সেও দেখছে সোয়ীকে দূর থেকে।

সোনাই বলে—ঘরে অতিথ আইছে কুইলি তু যেয়ে জলখাই কর। আমরা একটু বন থেকে ঘুরে আসছি।

জিপটা চলে গেল সোনাই আর পাঠকজীকে নিয়ে। ভেবেছিল সোয়ী সোনাই তাকে নতুন গাড়িতে চড়াবে। কিন্তু সোনাই ওদের ধমকে ওঠে—হঠে যা তুরা। দূরকে যা।

সোনাই ড্রাইভারকে বলে—সিধা চলো হে—হুই বনের দিকে।

জিপটা গভীর থেকে গভীরতর বনের মধ্যে এসেছে।

অরণ্য এখানে গভীর। দুপুরের পর আর রোদ ঢোকে না। গাছগুলোর বুকে ঘন চাইড় লতার ঝোপ, নীচের দিকেও আগাছার জঙ্গল। পাতা ঝরে ঝরে স্তূপ হয়ে আছে। বনের গভীরে আচমকা এক জোড়া সম্বর পথের সামনে থমকে দাঁড়ালো। এদের গাড়িটাকে দেখে এবার লাফ দিয়ে সরে যায়।

গাড়ি ছেড়ে ওরা হেঁটে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল কেটে। ঘনবনের মধ্যে ওদিকে বিরাট চাতাল, পাথরের বিশাল গুহাগুলো দেখে ভূধর পাঠক খুশি হয়। এমনি জায়গাই খুঁজছিল সে। সবদিক থেকে দুর্গম, নিরাপদ।

পিছনে একটা ঝোরা বয়ে চলেছে পাহাড়ের গা থেকে। জলেরও অভাব নেই। চারিদিকে পাথরের উঁচু উঁচু চাঁই উঠে জায়গাটাকে

ঘিরে রেখেছে। বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না যে ওখানে কিছু ঘটে থাকে।

ভূধর পাঠক বলে,—বহুৎ আচ্ছা জায়গা সোনাইজী। তুম হিয়াই বন্দোবস্থ করো, বাত পাক্কা। চলো রুপেয়াকা বাত্ চিৎ ভি কর লেগা।

সোনাই মুণ্ডাও খুশী হয়, এবার মাসে মাসে একটা বাঁধা আমদানির ব্যবস্থা হয়ে গেল।

প্রশান্ত, পবিত্র, কুমারী আদিম অরণ্যের বুকে ওরা যেন এবার মনের অতলের লোভ লালসার বীজকেও অঙ্কুরিত করতে শুরু করেছে। এতদিনের শুচিতাকে এবার তারা নিঃশেষ করে দেবে।

কোথায় শান্ত অরণ্যে একটা কাঠঠোকরা পাখী শক্ত ঠোঁট দিয়ে কোন বনস্পতির বুকে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে, ওই কঠিন ছন্দময় শব্দটা স্তব্ধ অরণ্যে যেন কুড়োল মারার মত শব্দে ছড়িয়ে পড়ে।

একটা শিয়াল আবছা অন্ধকারে নীল চোখ মেলে সরে গেল।

কুইলি বাবার কথা শুনে চুপ করে থাকে। কথাটা সে মনে মনে ভাবছে। মুরুং চলে যাবার পর থেকেই যেন বদলে গেছে যে। আজ সে আর ফেরেনি। কুইলিও কঠিন হয়ে ওঠে। সেও এবার সহরে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে। মুরুংকেও দেখিয়ে দেবে সে না এলেও কুইলি নিজের পথে বাঁচতে পারে। বাবার কথাগুলো শুনছে কুইলি। বলে সোনাই—দিখুদের ইস্কুলে লিখাপড়া শিখবি। ইখানে তুকে বসে থাকতে হবেক নাই।

কুইলি চুপ করে ভাবছে কথাগুলো। এখানে তার মন আর বসে না। সেই ভালোলাগার স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে মুরুং চলে যাবার পর থেকেই। মনে হয় বাইরে অন্য জীবনেই চলে যাবে সে।

সোনাই মুণ্ডা বলে—কিরে? হ্যাঁ না বল কিছু?

সন্ধ্যা নামছে ডুংরিতে। বাতাসে ওঠে শাল মহুয়া ফুলের মদির

সুবাস। ঘরে ফেরা পাখীগুলো কলরব করে। কুইলির যেন আজ সব হারিয়ে গেছে।

টুয়াই-এর কথাগুলো মনে পড়ে। লোভী ওই জানোয়ারটা নেকড়ের মত তার পিছনে লেগে আছে, যে কোন সময় কামড়াতে পারে। কুইলি এখান থেকে চলেই যাবে।

বাবার কথায় কুইলি বলে,-ঠিক আছে। তু বলছিস যাবো উখানে। লিখাপড়াই শিখবো! ভাল না লাগে চলে আসবো।

হাসে সোনাই মুণ্ডা। ও জানে, নিজেও বুঝেছে এই বয়সের কোন ছেলেমেয়ে ওই জগতের আনন্দ-উত্তেজনা ছেড়ে এই জঙ্গলে ফিরে আসবে না। সে নিজেও অনুভব করেছে সেটা। শুধুমাত্র পয়সার জন্যই আসতে হয় এখানে। কিন্তু মুকুং ফেরেনি, ওই জগতের নেশায় কোথায় হারিয়ে গেছে। কুইলিও এই ডুংরির জীবনে আর ফিরবে না।

সোনাই মেয়েকে আশ্বস্ত করে—ঠিক আছে। ভালো না লাগে থাকবি নাই উখানে।

একটা দায় উদ্ধার হলো সোনাই মুণ্ডার। সকাল থেকে নানা ঝামেলা গেছে। ভূধর পাঠকের ব্যাপারটাও ফয়সালা হয়ে গেছে। এবার ওই গুহার মধ্যেই যন্ত্রপাতি কিছু বসিয়ে ওরা চোলাই শুরু করবে। খাঁটি মহুয়ার তৈরী গ্রেড-এ ওয়ান মদই হবে এখানে। ভূধর পাঠক আরও করিতকর্মা ব্যক্তি। সে ভাবছে নামী দামী কোম্পানীর বোতল লেবেল যোগাড় করতে পারলে তাতে ওই মাল পুরে তাকে সেই দরেই বিক্রী করতে পারবে।

ভূধর পাঠক ফিরে গেছে বৈকালেই সব কথাবার্তা পাকা করে। মুনিমজীকে নিয়ে পড়েছে সোনাই মুণ্ডা। হুঁসিয়ার লোকটাকে দিয়ে কাজ হয় তার। তাই তার ওই লিগিরদার পাহাড়ের কাযের ব্যাপারটা নিয়ে পড়েছে। মুনিমজীও মনে মনে খুশি হয়। বুদ্ধিটা সেইই দিয়েছে পাঠকজীকে, অবশ্য সেটা আর বলে না। আজ মুনিমজী কাঁচা টাকার গন্ধ পেয়ে গেছে। জানে মুনিমজী, মালপত্রও এসেছে আজ।

মুনিমজীও টের পেয়েছে আসল ব্যাপারের। লম্বা নাকে যেন সবকিছুরই গন্ধ পায় সে, মুনিমজী বুঝেছে অনেক টাকার ব্যাপার। তারও হাতে বেশ কিছু আসবে।

মুনিমজী বলে—সব ঠিক হো যায়েগা সাব। সমুচা জঙ্গলকা যিতনা হাটিয়া হ্যায়—সব হাটসো ট্রাক ট্রাক মহুয়া—গহু মৌল লেবে। মাল যিত্‌না চাহিয়ে মিলেগা। কাম্‌ ভি হোগা। কাল সে শুরুকর দেগা কাম।

সোয়ী অন্য দিনকার মত আজও এসেছে। তার দেহে বয়সের ছাপটা এবার ফুটে উঠেছে। রাত্রি নেমেছে ডুংরিতে। সারাদিনের ধকল গেছে সোনাই মুণ্ডার দেহের উপর দিয়ে, তবু মনটা আজ তার খুশি খুশি লাগে। সব কাজই ঠিকমত হয়ে চলেছে। কুইলিকেও বাইরে পাঠাবে। আর সামনে ওই ভূধর পাঠকের কারবার, তাছাড়া তার নিজের খাদানও চালু করবে এবার লাইসেন্সটা হয়ে গেলে। ক্লান্ত দেহে মদ নিয়ে বসেছে সে। আজ আর দিশী নয়, সোনাই হঠাৎ সোয়ীকে ঢুকতে দেখে চাইল।

মেয়েটা এমনি সময় প্রায়ই আসে। হ্যারিকেনের বাতির লালাভ আলোয় সোয়ীর দিকে চেয়ে থাকে সোনাই। ওর যৌবন যেন ওর দেহে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। চাপল্য নেই—আছে থমথমে রহস্যময়তা। কাপড়খানা তার উদ্ধত দেহের বিদায়ী যৌবনকে এখনও সামলাতে পারে না। ওর দুচোখে বনের আদিম মাদকতা। হাসছে সোয়ী।

সোনাই-এর মনে হয় ওকেই এখন তার দরকার। সোনাই ডাকে —আয়। নে—গলাটা ভেজা।

একটা গেলাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দিতে সোয়ী সারা দেহে লহর তুলে বলে—অ-মা! এতক্ষণ চিনতেই লারলা, ইখন রাত দুপুরে লিশা করে গতরটা ধামসাবার লেগে এত সুহাগ করে ডাকছো, লয়গো সর্দার!

সোনাইয়ের দেওয়া মদটা গলায় ঢেলে সোয়ী ওর গা ঘেঁসে বসে

বলে.-লুক তুমি বাপু সুবিধের লও ! তা লোতুন কলের গাড়ি কিনলা একদিন চড়াও বাপু। চলো কেন্নে মনোহরপুরে টৌকিবাজি দেখে আসি। কত লাচ গান করে উয়ারা।

সোনাইয়ের নেশাগ্রস্ত দুচোখের সামনে হঠাৎ দুর্গা বিশ্বাসের পালিশ করা ধারালো মুখ, তার চাহনি—সাজানো সুন্দর দেহটার কথা মনে পড়ে। ওরা অন্য জগতের মানুষ। কামনা-লালসাকে ওরা মুখর করে তুলতে পারে নানা কৌশলে। সোয়ীর সেই চটক কৌশল জানা নেই। মাংসল একটা দেহ শুধু জৈবিক ক্ষুধার মুহূর্তেই তার পরিণতি। ওদের পরমায়ু সেই মুহূর্তগুলো অবধি।

সোয়ী সোনাইকে কাছে টেনে নেয়। ক'দিন সে অনুপস্থিত ছিল এই রাতের উন্মাদনার আসরে। মনের অতলে যেন অন্য মন আজ ওই মাতাল বেবশ মেয়েটার ডাকে সাড়া দিতে চায় না। কিন্তু মদের নেশায় ওর চোখে আজ সোয়ী পরিণত হয়েছে সভ্য জগতের সেই দুর্গা বিশ্বাসের ছবিতে। ওকে কাছে টেনে নেয় সোনাই মুণ্ডা। যেন সব চেষ্টা সামর্থ প্রতিষ্ঠা দিয়ে সোনাই নোতুন অন্য জগতের সব সম্পদকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তাকে দখল করতে চায়। লোকটার নিবিড় বাধনে হাঁপাচ্ছে সোয়ী। সোনাইয়ের এই দিশাহারা উন্মাদনা. তার কামনার তীব্রতার কোন কারণ সে জানে না। জেনেছে ওর দুর্বার চাহিদাটা। খুশি হয় সোয়ী। ক্লান্ত বিধ্বস্ত স্বরে বলে সোয়া —ছাপ্ খেয়ে ফেলাবা নাকি গ' সর্দার !

সোনাই দুরন্ত আবেগে ওই অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায়। সোয়ীর কি আবেশে দুচোখ বুজে আসে।

রাতের অন্ধকারেই ট্রাকটা এসেছে। ভূধর পাঠক জানে সময় নষ্ট করা চলবে না। মুনিমজী—টয়াই আর ট্রাকের কিছু কুলি মজুররা মালপত্র তুলে এক ক্ষেপ রেখে এসেছে ওই গুহায়, আজ রাত থেকেই মদ তৈরীর কায শুরু হয়েছে। ওরা রাতের অন্ধকারেই মাল নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ সোনাইএর বাড়ির ওদিকে কয়েকটা বন করবী শিউলি

ঝোঁপের পাশে কাকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখে ওরা চমকে ওঠে।

মুনিমজী হেডলাইট নিভিয়ে অন্ধকারে মাল তুলছিল। বলে সে —হুঁসিয়ার ; উধার কে ছিপাকে আছে দেখ!

লোকগুলো সাবধান হয়ে যায়। কে এগিয়ে যায় গুঁড়ি মেরে। কে জানে কোন জানোয়ারও হতে পারে। গোয়ালের কাছে ওঁত পেতে আছে হয়তো শিকারের আশায়।

মতি মুণ্ডা সেদিন পারে না সোয়াঁকে ধরতে। আচমকা তোড়ে বৃষ্টি নামতে আর মেঘের হাঁক ডাক শুনে চলে গিয়েছিল ভয়ে। লোকটা ধীরে ধীরে বুনো মোষের মত ক্ষেপে উঠেছে। দেখছে নষ্টা মেয়েটাকে, সারা জীবনটা তার জ্বালিয়ে দিল। ও যেন এই ডুংরির একটা স্বৈরিণী, তাদের সমাজে ওই মেয়ের ঠাঁই নেই। তার লজ্জা যে সে অক্ষম একটা পুরুষ। তাই তিলে তিলে রাগটা জমে উঠেছে মতি মুণ্ডার মনে

আজ রাতেই সোয়া বের হতেই সেও পিছু পিছু এসেছে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। বাহাতে শক্ত করে ধরেছে কুঠারটা। আজ এত দিনের ওই নোংরামির একটা হেস্ত নেস্ত করবে সে।

রাতের অন্ধকারে তোকি বুড়ি ছেলেকে বের হতে দেখে শুধোয় —কুথাকে যাবি ?

বৌটা আগেই বের হয়ে গেছে। ঘরে কখন থাকে না থাকে সোয়া, বুড়ি তা জানে না। ছেলেকে বের হতে দেখে চীৎকার করে।

—রাত বিরেতে যাস্ নাই ক!

মতি শোনে না। চলেছে সে।

আজ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সে। দেখছে সোয়া ঢুকেছে ওই সোনাই-এর ঘরে। আজ সে শেষ করবে মেয়েটাকে। জোনাকি জ্বলে, বন পাহাড়ে আঁধার ঘন হয়ে ওঠে। কোথায় একটা কটরা কেঁউ কেঁউ করে ডেকে চলেছে।

হঠাৎ ওই রাতের অন্ধকারে একটা ট্রাক এসে দাঁড়ায়। কার মালপত্র তুলছে। মতি ওই পলাশ ঝোপের আড়ালে বসেছিল, মশার

কামড় অনেক সহ্য করে আছে। অন্ধকারে পায়ের কাছে কি একটা সরে গেল। চমকে ওঠে মতি।

হঠাৎ এমনি সময়ই ওরা দেখে ফেলেছে মতিকে।

এগিয়ে এসে ধরে ফেলেছে তাকে। গর্জন করে মুনিমজী

—এখানে কি করতে এসেছিস, জবাব দে?

মতি অস্পষ্ট গোঙানির স্বরে কি বলতে চেষ্টা করে।

তার আগেই ওই লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে টুয়াই।

—শালা লুকিয়ে কি দেখছিলি? চোরির মতলব!

চোর—শয়তান কাঁহিকা।

দু চার ঘা মারতে ছিটকে পড়ে লোকটা। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, মতি অব্যক্ত গোঙানির স্বরে কি বলার চেষ্টা করে, চোর সে নয়। তার ঘরেই সিঁদ দিয়েছে এরা। তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে কথা কানেও তোলে না তারা।

লোকজন জুটে যায়।

তার আগেই ট্রাকখানা রাতের অন্ধকারে লিগিরদার ঘনবনে গিয়ে ঢুকেছে। কানাই-মারো মুণ্ডা—ফটিক—অনেকেই এসে জুটেছে। তোকি বুড়িও এসে চীৎকার শুরু করে—অয় বাপ! মেরে শ্যাষ করে দিবি তুরা? দে উ পাপটোকে শ্যাষ করে দে। ও বাঁচুক। এমনি করে মারবেক, ইয়ার বিচার হবেক নাই? দ্যাখ তুরা।

গোলমালের মুখেই ধূর্ত মেয়েটা অন্ধকারে সরে গেছে সোনাইএর ঘর থেকে। বনশিয়ালের মত রাতের অন্ধকারে কুর্চি কেঁলেকোড়ার বন দিয়ে সোয়ী ঘরে পৌঁচেছে। সোনাইও বের হয়ে আসে।

তখন বুড়ি ওই রক্তাক্ত আহত ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। গর্জায়—ইয়ার বিচের করাবোই! এমনি করে মারবেক: উঁর বরাত!

সোয়ী চুপ করে দেখছে।

আহত রক্তাক্ত মতি মুণ্ডা একটা জানোয়ারের মত ধুঁকছে। তোকি বুড়ি গর্জে ওঠে সোয়ীকে দেখে—আর কত খাবি লা? ইবার উটাবে

খেয়ে গুয়ার বাজারে যেয়ে নটিন সেজে বস্‌গা। এত পাপ হেই বোঙা ইয়ার বিচের করো। এখনও দিনরাত হচ্ছে, সূরয উঠছে ইয়ার বিচের হবেক নাই ?

সোয়ী চুপকরে থাকে।

গর্জাচ্ছে মতি—চুপ দে তুই। ইয়ের বিচের আমিই করবো একদিন।

কানাই মুণ্ডা একটু ডানপিটে, সে জানে সব খবরই। ওই সোনাই মুণ্ডা, মুনিমজী টুয়াইদের স্বরূপ সে চেনে, ওদের কাজ কম্ম বড় একটা করে না। মুরুংএর সেই ছিল প্রাণের বন্ধু। দুজনে বনে বনে ঘুরতো। নিজেদের জমিতেই কাজ করতো।

সেই মুরুংকে যেদিন থেকে সোনাই জোর করে পুলিশে দিল, কানাইও রেগেছিল। দু'একবার টুয়াইকে সেও শাসিয়েছে, মুনিমজীকেও ধরেছে কাঠের হিসাব চুরি করতে। ওরাও তাই কানাইকে এড়িয়ে চলে।

বনে কাঠ কেটে পাতা বুনে কানাই হাটে কিছু রোজগার করে, অন্যসময় জমিতেই থাকে। ভেবেছিল সে, মুরুং ফিরবে। সেও সঙ্গীকে ফিরে পাবে! কিন্তু মুরুং ফেরেনি। দিখুদের ওখানে কাম করছে। কানাইএর মনে হয় সেও চলে যাবে এই ডুংরি ছেড়ে। এখানের সেই সহজ সুন্দর জীবনটাও ফুরিয়ে আসছে।

কিন্তু পারেনি।

বোরাই সর্দারকে ফেলে যেতে চায়নি সে। ওই অসহায় বৃদ্ধ স্থবির মানুষটাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। ও যেন এই বনের সেই স্বাধীন মুণ্ডা-হো সমাজের প্রতিভূ। দূর পাহাড় বনের দিকে চেয়ে থাকে বোরাই, দূরে লিগিরদার পাহাড়ে ছিল তাদের প্রাসাদ, মুণ্ডা বংশের দেবস্থান।

বোরাই বলে—ই বন, ই মাটি ছেড়ে যাস্‌নে কানাই। মুরুং ও আসবেকই। দিন আসবেক, দশদিক আলো করে বনে বনে সব পাপ এর ভার পুড়ে ছাই হবেক। বৃষ্টি নামবেক, শীতল হবেন বসুমতী। আবার মুণ্ডাদের বোঙাদের জোহার করবি! ই বন-ই বসুমতী, তুদের বাঁচাই রাখবেক রে।

কেন জানেনা কানাই সেই দিনের আশাতেই সে পড়ে আছে এখানে। আজও রাতে মতিকে চোর সাব্যস্ত করে মারতে দেখে সেইই এগিয়ে যায়। টুয়াইকে বলে।

—চোর উ লয়। মারিস না। ছেড়ে দে উকে।

টুয়াই গর্জে ওঠে—চোর।

—না! মুণ্ডারা চোর লয়, চুরি করেনা। তু মুণ্ডা লোস তু বুঝবি নাই। চুরি করেছিস তুরা।

টুয়াই চাইল ওর দিকে। অন্য কেউ হলে টুয়াই তাকেও ছাড়তে না। কিন্তু কানাই এর দাপট সে দেখেছে এর আগে। কোন মুণ্ড মেয়ের গায়ে হাত দিতে সেদিন করমপাদার বনে, ওর টুঁটি টিপে ধরেছিল। কোনমতে বেঁচেছিল। টুয়াই আজ তাই চুপকরে গেল।

ব্যাপাটা এসে থামায় সোনাই মুণ্ডা। সে বলে।

—যা, ঘরকে যা! মতিকে দশটা টাকা দিতে আসে।

বলে কানাই—না। ট্যাকা উ লিবেক নাই! যারে মতি।

সোনাই চাইল ওর দিকে।

কানাই দেখেছিল ওদের ট্রাক এর ব্যাপারটা। তারও মনে হয়েছে অন্ধকারের কোন ব্যাপার আছে।

দু'একবার ওদের মুখে লিগিরদার নামও শুনেছিল। ট্রাকটাকে এতরাতে ওই দিকে যেতে দেখেছে সে। কানাই রাতের অন্ধকারে কুড়ুল আর ভল্লাটা নিয়ে বের হয়ে যায় বনের পথে।

শিশির ভিজে পাকদণ্ডী বেয়ে চলেছে সে। রাতের অন্ধকারে এবার বনভূমির শান্ত ঘুম ঘুম রূপটাকে দেখেছে কানাই, অন্ধকার তারাজ্বলা আকাশে রাতের ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করে, বাতাস ওঠে, বন চাঁপা ফুলের তীব্র জাগর সুবাস। শালফুল ফোটা অরণ্য-কোথায় একটা হরিণ ডেকে ডেকে ফিরছে, নাচে লিগিরদার জলায় ল্যাণ্টা ফুলের মেলা বসেছে। একপাল সম্বর সরে গেল।

এ অরণ্য তার চেনা, রাতের এই বাতাসে যেন অতীতের সেই যুগ জেগে ওঠে। এ বনে ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের রাজ্য, জলায়

নেমে জল কাদা মাখছে হাতির দল। তাদের চীৎকার ওঠে। সবনিয়ে এ এক শান্ত নোতুন জগৎ। ফিকে চাঁদের আলোয় কাঁপছে জলার ধারের কাশবন। থমকে দাঁড়ালো কানাই মুণ্ডা।

ওপাশে পাহাড় গুহায় সেই অতীতের প্রাসাদ গুহায় আলো জ্বলছে, শোনা যায় কাদের কথার শব্দ। ফুলফোটা বাতাসে ওঠে তাজা চোলাইএর বিশ্রী গন্ধ। বনের সব প্রশান্তি পবিত্রতাকে ওরা শেষকরে দিয়েছে। চোরের মত এসে দখল করেছে আজকের লোভী মানুষগুলো তাদের পূর্বপুরুষের পবিত্র তীর্থকে। পাহাড়ের উপর থেকে মনে হয় তীর ছুড়েই শেষ করবে হু'একটা ছায়া মূর্তিকে। কিন্তু তীর ধনুক আনেনি কানাই।

পায়ে পায়ে সরে এল। কি রাগে ফুঁসছে কানাই। এর বিহিত সে করবেই।

তোকি বুড়ি সারারাত ঘুমোয় নি। মতি কাত্‌রাচ্ছে। এরাত্রিও ভোর হয়। তারাগুলো মুছে গেছে, জেগে উঠেছে দিনের প্রথম আলো। পাখীদের কলরব জাগে। ঝোরার জলের ধারে ছাতারে শালিখ পাখীদের মেলা বসেছে। বড় শাল মহুয়া সেগুণ বনের মাথা টপকে সকালের আলো এসে পড়েছে।

বোঙার থানের কুসুম-শাল-পিয়াশাল-বটগাছের ঘনছায়ায় দিনের আলোয় লোকগুলো জমা হয়। তোকি বুড়ি তুলে এনেছে আহত মতিকে। বোরাই সর্দার জরি বুটি লতাপাতা ছেঁচে ওষুধ দিচ্ছে।

তোকি বুড়ি চীৎকার করে—ইয়ার বিচের হবেক নাই? কেনে ঘরের বৌটা ভাগি যাবেক উদের ঘরে, কেনে ঘয়ের লুককে মারবেক উরো? ধরম্ নাই—ডাক সোনাইকে বলুক দশের ছামুতে। বিচার যদি লা করতে পারিস তবে সাতাশীর সর্দার বংশ কি করতে আছে? কেনে আছিস তু!

বোরাই দেখছে তোকি বুড়িকে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে বুড়ি কাঁপছে, চোখতুটো পিচুটিতে ঢাকা, অনাহারে শীর্ণ জীর্ণ ধ্বংসপ্রায় একটা আর্তনাদ মাত্র।

আর বোরাই জানে সেও অমনি একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আজ নামেই সর্দার বংশ, রাজার বংশ। সব সম্বল সামর্থ চলে গেছে, সোনাই আজ সারান্দার বনসমাজেরই কর্তা। তার টাকা ব্যবসা, দিখুদের সঙ্গে মেলামেশা সবনিয়ে সে আজ এক নোতুন সমাজ গড়েছে, আর অতীতের সমাজ বন্ধন—সব নীতি বিবেককে ওরা শেষ করে দিয়েছে।

তোকি আতনাদ করে—চুপকরে রইলি কেনে? লষ্টা মাগীর বিচের হবেক নাই? মারবেক তার বিচের হবেক নাই ই ক্যামন সাতাশী?

বোরাই কাশছে। শীতের ধমকে জীর্ণ বুকের খাঁচাটা কেঁপে ওঠে। ছেঁড়া দোলাইটাও জীর্ণ! বোরাই বলে ওঠে অসহায় কণ্ঠে —না। সাতাশী আজ নাই। তুদের বোঙা আজ মরে গেইছে। তুরাও এমনি করে গলে পচে মরবি! ই বনকে বিষিয়ে দিছে উরা। এ সাতাশীর সমাজকেও। তবে কেনে বিচের? কিসের বিচের? কে কে করবেক বিচের? সর্দার তুদের নাইরে, সে ঢেক দিন আগে মরে গেইছে। বেঁচে আছে শুধু তার লাশখান্-কুন ক্ষ্যামতা আর নাই!

কি অসহয়ে আর্তনাদের মত ওই আর্তকণ্ঠস্বর ভরিয়ে তোলে এই বোঙার থানের পরিবেশটাকে। অনেকেই এসে জুটেছিল, আশপাশের বস্তির মানুষও। কিন্তু নির্মম এই সত্যকে তারা আবিষ্কার করে কি বেদনায় যেন হাহাকার করে ওঠে। কেউ এর জবাব দিতে পারে না।

কানাইএর কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে।

—মুণ্ডাদের বোঙার পাহাড়ের চাতালে ওরা মদের কারখানা বসাইছে, যিখানে পূজা দিই-জোহর করি সেখানেও এইসব করবেক তবু সাতাশী কেনে-সারান্দার মুণ্ডা কিছু বলবিনাই? বীরসা মহারাজের থানএর মাহাত্ম্যও মুছাই দিবেক দারুর হররা ছুটাই? বল—ইয়ার কি হবেক?

সচকিত হয়ে ওঠে জনতা।

ওই দুর্গম বন পাহাড়ের গুহায় এককালে বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহের

ইতিহাস রচনা হয়েছিল। ওই নিরাপদ আশ্রয় থেকে মুণ্ডা—হো—আদিবাসীর দল জেহাদ হেঁকেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, সেই জেহাদ—সেই মুক্তস্বর তেলপত্র হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়েছিল সাতাশী পাহাড়ের দেশ এই দুর্গম সারান্দার কোণে কাণে। নাগরার ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পাহাড় বনের মানুষের রক্তে এনেছিল কি মত্ততা!

আজ সেই নাগরার নাম তারা ভোলেনি। ছোট নাগরার বনবসতে সেই বিদ্রোহের নাগরা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। সব যেন আজ শীলাভূত-দারুভূত তবু একক কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনিত হয় আজও।

—বল! তুরা কিছু করবি নাই?

পায়ে পায়ে এসে পড়েছে অনেকেই। হাট বসাতে গিয়েও বসেনি। ওরা পশরা ফেলে আজ বোঙার ছায়াঘন থানে এসে ভিড় করেছে, মুখে চোখে জেগে ওঠে একটি প্রশ্ন!

বোরাই সর্দার দেখছে ওই জনতাকে।

জনতা চীৎকার করে—হবেক!

খবরটা পৌঁছে গেছে সোনাইএর কাছেও। সোনাই গর্জে ওঠে—এতবড় সাহস ওদের? আবার কানাইটাকেও শেষ করে দিব।

মুনিমজী বলে—মৎ শোচিয়ে মালিক। হম্ দেখতা।

ও নিজেই চলেছে। সোনাই কি ভাবছে। পথটা সেও জানে। পাঠকজার বুদ্ধিটা মনে পড়ে। বলে সোনাই—আমিও যাচ্ছি সাথে মুনিমজী।

কুইলি শুনে এসেছে সেই বোঙার থানের কথাগুলো। মনে হয় তার বাবারই দোষ, ওদের উপর এভাবে অত্যাচার করা ঠিক নয়, ওই বোঙাবুরুর পাহড়ে দারুভাটি বসানোও ভুলই হয়েছে। দেখেছে কুইলি ওই মানুষ গুলোর মুখচোখ। কানাইকে দেখে আজ কেন জানেনা তার মুরুং এর কথাই মনে পড়ে।

কুইলি বলে—বাবা যাস্নে। উসব কায বন্ধ করে দে! উ ঠিক নয় বাপ!

হাসে সোনাই। মেয়েটা জানেনা সোনাইএর টাকার দরকার। সহরে বাড়ি-গাড়ি—খাদান এসব চালাতে হবে।

তাকে পেতে হবে অনেক কিছু। এপথ তাকে নিতেই হবে। ওই বোঙা, ধরম মিথ্যা বিশ্বাসগুলোকেও সে কিনে নেবে।

হঠাৎ বোঙার থানের সামনে জিপটাকে এসে থামতে দেখে ওরা চাইল। জনতার কোলাহল থেমে গেছে। সোনাই মুনিমজী টুয়াই আরও কিছু লোকজন এগিয়ে আসে।

ভিড় ঠেলে সরে যায়। বোঙার থানের আলো আর ছায়াঘন জায়গাটার সামনে মানুষগুলো সোনাইকে পথ দেয়। ওদের মধ্য দিয়ে মাথা সোজা করে বলিষ্ঠ সোনাই মুণ্ডা এগিয়ে গিয়ে জীর্ণ স্থবির বোরাই সর্দারের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ছুটি যুগ যেন আজ একটি বোঝাপড়া করতে চায়। সোনাই মুণ্ডা দেখছে বোরাই সর্দারকে।

চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। মুখে বয়সের কুঞ্চন রেখা—যেন ব্যর্থ অতীত ইতিহাসের একটা ধ্বংসস্তূপ। তোকি বুড়িও চুপ করে গেছে।

সোনাই বলে ওঠে ওই জনতার উদ্দেশ্যে।

—কি বললি তোরা ?

মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সোনাই এর সামনে। এক একজনের টিকি বাঁধা আছে তার কাছে। জমি জারাত সব ; ওর কাঠএর কারবারে, পাতার গোলায়—ঠিকাদারীতে কায করে দিন চালায়। আজ তারাও মালিকের কঠিন মূর্তি দেখে চমকে উঠেছে। কিন্তু বলতে গিয়েও যেন পেটের জ্বালার কথা ভেবে থেমে গেল।

কানাই বলে—ইসব কি হচ্ছে ?

সোনাই মুণ্ডা জবাব দিল না। বলে সে—সর্দার, ওই লোকগুলোকে আগে খেতে দিও, তারপর সাতাশার সভা ডেকে আমার বিচার করবে ; কে দেখে ওদের ? মতির চিকিৎসার দরকার মুনিমজী।

মুনিমজী কিছু টাকা এগিয়ে দেয়।

ওদের মুখের উপর ওই টাকাগুলো ছিটিয়ে দিয়ে সোনাই নেমে এল টিলা থেকে। বোরাই সর্দার অসহায় রাগে কাঁপছে—কানাই গুম

হয়ে গেছে। আজ ওই লোকটা যেন সারা অঞ্চলের মানুষকে ওই টাকা ছিটিয়ে কিনে নিয়েছে, তাদের নীতি—ধর্ম সবকিছুকেই বিচে দিয়েছে ওরা সোনাই-এর কাছে।

তোকি বুড়ি রাগে ওই ছড়ানো নোটগুলোকে লাথি মেরে গর্জে ওঠে—মুখ বুজে থাকবি ওই ট্যাকার জন্যে? থু্ থু্ থু্! তুদের মুয়ে থুতু দিই। লাথি মারি; মরদ তুরা!

বোরাই সর্দার এর জীর্ণ চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে অশ্রু। পরাজয়ের বেদনায় সে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেছে। ওই থুতুটাকে সারা সমাজের মুখে ছিটিয়ে দিল তোকি বুড়ি। বোরাই সর্দার সেই সমাজের এখনও সর্দার সেজে বসে আছে।

মাথাটা ওই বোঙার থানের পাথরে ঠুকছে বৃদ্ধ লোকটা কি গ্লানিতে। আর্তনাদ করে সে।

—আমাকে বাঁচিয়ে কেনে রেখেছিস বোঙা, ইয়ার পরও বাঁচাই রাখছিস কেনে?

কানাই এর চোখ দুটো জ্বলছে ওই ছায়া অন্ধকারে সারান্দার বাঘের চোখের মত।

মাটিতে আছাড়ি বিছাড়ি খাচ্ছে বুড়ো বোরাই সর্দার। কানাই বলে—চুপ যাও সর্দার! ইয়ার জবাব আমি দিব হে। চুপ যাও! বোরাই সর্দার দেখছে বলিষ্ঠ মরদটাকে, ওর সামনে সারান্দার তাজা যোযান সরজন দারুর গত মাথা তুলে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। বোরাই এর মনে পড়ে মুরুং এর কথা। সেও অমনি ছিল, আজ হারিয়ে গেছে; তার জায়গায় যেন কানাই মুণ্ডা দাঁড়িয়েছে বুক চিতিয়ে।

সোনাই মুণ্ডার ইঙ্গিতেই হাটে আজ দানছত্র খুলেছে টুয়াই লোকজন নিয়ে। দুটো বড় শূয়োরকে খড় দিয়ে পুড়িয়ে আগুনে ঝলসে চামড়া রোম ছাড়িয়ে লালাভ দেহগুলো ফালা ফালা করে স্তূপ করে রেখেছে কাটা শালপাতা পেতে। আর এসেছে গোপন পথে ওদের সেই বোঙা বুরু পাহাড়ের তৈরী চলাই মদ জালা ভর্তি হয়ে।

হাটের লোকজনকে বেদম খাইয়েছে আজ। মুনিমজী বলে-পিও জী। মালিক নয়াখাদান কর লিয়া। কায কাম মিলবে। কল ভি বসাবে—ওহি পূজা কা বারে পরসাদ। পিও জী!

টুয়াইকে ঘিরে ধরেছে এই ডুংরি; আশপাশের ডুংরির মেয়েরা; হাট বলতে গাছতলায় সারবন্দী বসে পড়ে ওরা, চাল-মকাই, মরচাই-লবন এই পশরা, আর আসে মনোহারি জিনিসের কিছু ব্যাপারী, কাচের চুড়ি-পুতির মালা-আয়না-ফুলেল তেল।

এইসব, আর কিছু সস্তা ছিটের জামা-ব্লাউজ-তাঁতের শাড়ি নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী, সকাল থেকে বন পাহাড়ের দিক দিগন্তর থেকে আসে লোকজন, পূব থেকে আসে মেয়ে—উত্তরের দূর ডুংরিতে থাকে মা-বাবা ভাই, তারাও আসে। পসরা বলতে চালের কতু, নাহয় বনে গজানো কুড়কি ছাতু, পশরাটা গৌণ—দেখা হয় বনের এদিক ওদিকে ছড়ানো আপনজনের সঙ্গে। খবরাখবর হয়। আবার বেলা পড়ার মুখে হাড়িয়া খেয়ে টলতে টলতে যে যার ডুংরিতে ফেরে। সাতদিনের মত স্থির হয়ে থাকে বনরাজ্য। ব্যাপারী ও কাঠমহাজনদের ট্রাকে কিছু পয়সা দিয়ে চলে যায় বনের বাইরে। হাটের শাল মহুয়া তলে নামে আবার শ্যামল স্তব্ধতা।

এবার হাটে মদের ফোয়ারা ছুটিয়েছে সোনাই মুণ্ডা সেইসঙ্গে মাংসও রয়েছে। মেয়েগুলো ঘিরে ধরেছে টুয়াইকে। টুয়াই প্যাণ্ট সার্ট পরে আজ যেন খাদানের ম্যানেজার হয়ে গেছে এমনি ভাব নিয়ে চলে।

—খা; খেয়ে লে দেদার; এ্যই চন্দু—মিতান লখি,

লখিয়া গড়িয়েপড়ে হাসিতে—অয় বাপ! সাহাব গ—ইযে দিখ্ সাহাব হইছো বটে! তা খাদানে কাযকাম দিবা তো?

মুনিমজী দেখছে তৃষ্ণার্ত চোখমেলে। সোয়ীও সেজেগুজে হাটে এসেছে। বলে সে-জুলজুল করে ভাবছো কিগো? মুরোদ তো তুমার নাই তবে এতো তিয়াস কেনে?

মুনিমজীর সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। মেয়েটা তা জানে।

তাই যেন নির্ভয়ে ওই লোকটাকে নাচিয়ে চলেছে। বলে ওঠে সোয়ী। —বোরাই বুড়ার জরি বুটি খাও কেনে, ধাতের ব্যামোটা সারাই ফ্যালো, সখসাধ করে ভালোবাসি একটুন।

মুনিমজীও কথাটা ভাবে মাঝে মাঝে। কিন্তু ভরসা হয় না। ধমকে ওঠে—চুপ যা তো!

সোনাই দেখেছে আজ সে জিতেছে, তাই যেন হাটে আনন্দের বান ছুটিয়েছে। আজই সে সহরে যাবে, কুইলিও তৈরী হচ্ছে। হাটে একবার এসেছিল কুইলি। চড়াই এর মাথা থেকে দেখেছে এক বিচিত্র দৃশ্য। সারা ডুংরির ওই হাটের মানুষগুলোকে আজ মাতাল করে তুলেছে ওর বাবা, লোকগুলোর স্বাধীন সত্বার সব বিলুপ্তি ঘটেছে। মেয়েগুলোর শাড়ীর বাঁধন বেবশ, নেশায় টলছে। কোন পুরুষের নির্লজ্জ বাঁধনে ওই প্রকাশ্য হাটের ছায়ামণ্ডপেই যেন গড়িয়ে পড়বে। বেসরম—বেবশ একটা নারকীয় ব্যাপার চলেছে ওই আলোভরা বনের শ্যামল প্রশান্তির বিকৃত পরিবেশে।

সরে এল কুইলি। তার মনে হয় এখানের সবকিছু বিষাক্ত গাঁজলায় মেতে উঠবে এবার। হাটের মাদল বাঁশীর সুর নেই, সিড়িং এর আখর নেই, নেই শালফুলের মৌমাতাল সুবাস। মানুষগুলো কি অস্থির মত্ততায় খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়েছে।

কোন একটা মেয়ের জড়িত কণ্ঠের চীৎকার ওঠে, কয়েকটা মত্ত যোয়ান তাকে তাড়া করেছে।

ওই উন্মত্ত পরিবেশের থেকে দূরে ছায়া অন্ধকার বোঙার থানে বসে আছে বোরাই সর্দার। চুলগুলো মুখ ঢেকে ফেলেছে, কপালে মেটে সিন্দুরের দাগটা জীর্ণ রেখাভরা মুখে মাখানো। আর চেয়ে দেখছে ওই মত্ত হাটের মানুষগুলোর দিকে কানাই মুণ্ডা।

ছোট নাগরার আদিবাসী মাষ্টার শিবু হো—কুমডির রতন মুণ্ডা আরও দুচারজন হাটে এসে সকালের সেই কাণ্ডটা দেখেছে। তারপর দেখেছে ওই মদের ফোয়ারা আর আদিবাসীদের মত্ততা।

রতন মুণ্ডা বলে—ইকি কাণ্ড সর্দার!

বোরাই সর্দার ওই তিনচারজন তরুণকে দেখছে। রতন দিখুদের স্কুলে একটা পাশ দিয়ে মাষ্টারী করে কুমডির আদিবাসী বসতির নোতুন স্কুলে। শিবুও বলে—মানুষগুলোকে কি কিনে ফালাইলো ওই সোনাই মুণ্ডা মদ আর মাস দিই ?

কানাই বলে ওঠে—মদের কারখানা বানাইল বোঙাবুরু বীরসা মহারাজের পাহাড়ের চটানে।

—তাই নাকি ! অবাক হয় শিবু মুণ্ডা।

তাদের অতীত ইতিহাস সংস্কারের সব চিত্রকে বিকৃত করে আজকের লুণ্ঠনের নোতুন এক কাহিনী রচনা করতে চায় সোনাই মুণ্ডা —ওই লোভী মানুষটা।

বোরাই সর্দার বলে—তুরা খাখ ! আজ বুড়া সাতাশীর মাথাটা মাটিতে নুয়াই দিছে, ই এক নোতুন 'নোয়ামুণ্ডি' হই গেল বাপ্ !

রতন, শিবু শুনেছে সেই কলঙ্কের ইতিহাস। ইংরেজ শাসনের রাইফেল বেয়নেটের আঘাতে সেদিনের মুণ্ডা হো সমাজ এর স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তাদের মাথা নীচু করতে হয়েছিল বিদেশী শাসকদের বুটের তলায়। তারই স্মারক হয়ে আছে নোয়ামুণ্ডির বসতির নাম।

আজও এদের সব হারানোর পালা চলেছে কোন এক লোভী অত্যাচারী শক্তিমানদের কাছে।

বাতাসে ওঠে গুরু গুরু শব্দ। চাইল ওরা। লাল কাকরের রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে চলেছে সোনাই মুণ্ডার জিপটা। তীক্ষ্ণ হর্ণের শব্দ ওঠে শাসনের কাঠিন্য নিয়ে। সোনাই বিজয় গর্বে শহরে চলেছে, সঙ্গে চলেছে কুইলি।

কুইলি আজ এই বিষন্ন বৈকালের ম্লান হলুদ আলোয় দেখছে এই অরণ্য, ওই ঝুপড়ি বসত, ঝোরার ধারের ফুলফোটা বনচাঁপা ল্যাম্বার্ণ গাছগুলোকে। সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে বনের ওই ঢালু পাহাড়সীমা ; বনটিয়ার ঝাঁক কলরব করে ফিরছে। কুইলির যেন এই স্বপ্নজগৎ হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেছে মুরুং এর জীবনের সেই মিষ্টি সুরটুকু। আজ সব হারিয়ে একটি মেয়ে চলেছে ব্যর্থ শূন্য হয়ে এই জগৎ থেকে।

জিপটা করমপাদার ঘন বনে হারিয়ে যায়, এখানে আকাশ দেখা যায় না। ছাতামেলা গাছগুলোর নীচে এখনই দিনের আলো মুছে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। ধনেশ পাখীর তীক্ষ্ণ চীৎকার ওঠে।

...স...

জীপটা থেমে গেছে।

কুইলিও চমকে ওঠে, স্তব্ধ বনে বনে ঝড় উঠেছে। মড় মড় শব্দে ডালপালা বাঁশবন ভাঙছে একপাল হাতি। পাহাড়ের নীচের ঢালুতে দেখা যায় কালো পাথর কুঁদা ওই মূর্তিগুলো। বনের জীবনের যেন সম্রাট—এদেরই এই সাম্রাজ্য।

সোনাই মুণ্ডার ঠাঁই এখানে নেই।

জীপটা নিরাপদ দূরত্বেই রয়েছে। তাই বের হয়ে গেল জীপটা। নীচের পাহাড় বন থেকে তীক্ষ্ণ শাসনের চীৎকার ওঠে। যূথপতি হাতিটা বিশাল দাঁতদুটো আকাশের দিকে তুলে শুঁড়টা বাঁকিয়ে গর্জন করে ওঠে তীক্ষ্ণ স্বরে।

বনের এদিকে এবার কিরিবুরুর পাহাড়ে উঠছে জীপটা। আকাশের মাথায় ওই পাহাড়শীর্ষে নোতুন এক সভ্যতার আলোভরা জগৎ, যন্ত্রের শব্দ ওঠে। দোকানপশার-আলোভরা সাজানো কলোনী। রেডিওতে হিন্দী গানের সুর ওঠে।

কুইলি যেন নোতুন এক জগৎকে দেখছে। দূর পাহাড়ের ওদিকে ঢেউখেলানো পাহাড় বনরাজ্যের গভীরে কোথায় তাদের ডুংরিটা আর খুঁজে পায় না কুইলি। সেখানে নেমেছে বিস্তৃত সীমাহীন অন্ধকার, ঝকঝকে আকাশে তারাগুলো ছড়ানো।

ওদের জিপটা পাহাড় ঠপকে এবার বড়জামদার লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসে।

কুইলি চুপ করে দেখছে এই নোতুন বসতকে। পাহাড়ের গায়ে সমতলকরা নোতুন একটা ছোট বাড়ির সামনে জিপ এসে থেমেছে। বিজলী বাতি জ্বলে।

সামনে দেখেছে একটি মহিলাকে। কুইলি বিস্মিত চাহনি মেলে

দেখছে এই নোতুন জগৎকে। সোনাই এর ডাকে হুঁশ ফেরে।

—জোহর কর কুইলি, মস্ত পণ্ডিত মাইয়া উনি!

দুর্গা রায়ানকে দেখছে কুইলি।

দুর্গা বলে—এসো।

কুইলি ওর সঙ্গে ভিতরে চলে গেল, দেখছে বাড়িটাকে। শক্ত সানবাঁধানো মেজে, জানলায় দিকুদের ঘরের মত রঙ্গীন কাপড় ঝুলছে দেওয়ালে বোতাম এর মত কি লাগানো, কট্ করে টিপতে অন্ধকার ঘরটা আলোয় ভরে ওঠে।

দুর্গা রায়ান বলে—বসো কুইলি!

মালপত্র নামিয়ে আনার পর সোনাই মুণ্ডাও এসে বসেছে ডুংরির শাল কেঁদ কাঠের বেড়ের উপর বাবুই দড়ির বোনা মাচুলি খাটিয়া নেই। তার জায়গায় ফরেষ্ট বাংলোয় দেখা দিকু সাহেবদের ঘরের মত চেয়ার—খাট পাতা।

দুর্গা রায়ান বলে—রান্নার লোককে সব বলে গেছি। আজ চলি কাল দেখা হবে।

কুইলি মাথা নাড়ে।

দুর্গা রায়ান চলে যাবার পর কুইলি এঘর ওঘর দেখে চলেছে সোনাই মুণ্ডা দেখছে মেয়েকে। শুধোয় সে—কিরে ঘর পছন্দ হয়েছে? কুইলি ভয়ে ভয়ে শুধোয়—কাদের ঘর বাপ?

হাসে সোনাই, আজ মনে হয় তার পরিচয় দেবার মত কিছু সাধ এবার এসেছে। বলে সে—আমাদের বাড়ি রে?

—ই সব! কুইলির ডাগর চোখে বিস্ময় নামে। সোনাই ডুংরিতে থাকতে মেয়েকে এত কাছে পায়নি। অবকাশ, পরিবেশ সেখানে ছিল না। আজ কুইলিকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—হ্যাঁরে! ইসব তুর জন্যে করেছি। ইখানে থাকবি, স্কুলে লিখাপড়া করবি।

...রাতের বাতাসে তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ ওঠে, পাহাড়ের নীচে আলোর বন্যা, মাইনস কলোনীর আলো—ওর পাশ দিয়ে সিটি বাজিয়ে ট্রেনটা

চলেছে। আলোভরা কামরাগুলোকে যেন আলোর ধাবমান মালার মত মনে হয়।

কুইলি দেখছে বিরাট বিস্তীর্ণ আলোঝলমল একটা জগৎকে।

মুরুং এর কথা মনে পড়ে। কোথায় এই বিচিত্র জগতের ভিড়ে সে হারিয়ে গেছে। তবু মনে হয় তারই কথা। মুরুং এর সন্ধানেই সে যেন ওই সবুজ ডুংরি ছেড়ে এখানের ভিড়ে এসেছে।

দিন, মাস গড়িয়ে বছর এসেছে। সারান্দার বনরাজ্যের ছায়া-অন্ধকারে হরিণ শিশু অবাক চোখের কালো চাহনি মেলে দেখছে বৃষ্টিঝরা বনভূমিকে। মা হরিণের কাছ থেকে এবার ছাড়া পেয়ে ঘোরে সেটা, কান পেতে বনের ঝরা পাতায় শোনে মর্মর ধ্বনি, চোখে লাগে তার ফুল ফোটার হলুদ নেশার ঘোর! একটা হরিণ দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে পাতার ফাঁক দিয়ে। তরুণ হরিণটার শিংএর ভেটভেট এখন শক্ত—সারা দেহে কি আনন্দ। সাড়া, এগিয়ে যায় মর্দা তরুণটা। বাহারের শিং মেলে, ডাগর চোখমেলে বিমুগ্ধ চাহনিতে দেখছে তরুণী এক হরিণ।

দুজনে দুজনে দেখছে। ভয় নেই। নীরব চাহনীর দিকে নির্ভয়ে তরুণী হরিণী এগিয়ে আসে, সারা গায়েঘনহলুদ জমিতে উজ্জ্বল কালো বিন্দুগুলো। গায়ে ওর কবোষ্ণ গা এসে মিশেছে কি মিলন প্রতীক্ষায়।

ঝরাপাতার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে ওরা।

গুরু গুরু শব্দ ওঠে বনের নিবিড় প্রশান্তির মাঝে। সচকিত চাহনি মেলে সরে গেল তারা। দেখছে শাল ঘং পাতার ঘন আড়াল থেকে একটা জানোয়ার যেন দৌড়ে চলেছে, বাতাসে বাতাসে বিশ্রী বদবু।

দীর্ঘ প্রায় দুবছর পর মুরুং ঢুকছে সারান্দার বনে। এই দুটো বছর তার জীবনে এনেছে অনেক পরিবর্তন। যে তরুণটিকে ওরা জিপে করে সেদিন হরিণমারার অপরাধে জেলে পুরতে নিয়েগিয়েছিল, সেই মুরুং আজ আমূল বদলে গেছে।

আজ সে পড়া লিখা শিখেছে, এখন বুঝেছে ওটা আরও শেখার

দরকার, তাই পড়ছে। আর একবছর কয়েকমাস ওই প্রভাত রায় সাহেবের মত মালিকের কাছে থেকে দেখেছে নোতুন এক সম্ভাবনাময় জগৎটাকে।

এর মধ্যে জিপ চালানোটা রপ্ত করে নিয়েছে। মিঃ রায়ই তাকে ওই বড়বিল ক্যাম্পএ থাকার সময় দেখেছিল নিষ্ঠাবান একটি কর্মী হিসেবে। মিঃ রায়ই ওকে বলেছিল—আরও পড়াশোনা কর, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। সামনের সর্দারশিপ্ পরীক্ষায় তোর নাম পাঠিয়েছি, তুই পরীক্ষা দিবি।

অবাক হয়েছিল মুরুং!

—সে কি সাব্! উসব হবেক নাই? কুছু জানি না!

হাসেন মিঃ রায়—হাতে কলমে কাম করছিস। চেন ধরছিস, মিনারেল স্যাম্প্যাল কলেকট করছিস, নামও লিখছিস লেবেলে, যা জানিস সেটার উপর আমি কিছুটা শিখিয়ে দেব এত ভয় কেন? পরীক্ষা দিবি তুই! সর্দারশিপ্ পাশ করে যাবি! আমি বলছি।

মুরুং মিঃ রায় এর কথাটাই পরম সত্যি বলে জানে। দেখেছে একটি বিচিত্র মানুষকে। কায পাগল-সাহসী-একটি তরুণ।

শিবু দত্ত সাহেবও আসেন মাঝে মাঝে।

দত্ত সাহেব বলে—কেন পারবিনা? তুই জন্মথেকেই মুণ্ডা সর্দারের বংশ, তবে এই কুলিসর্দারীতে পাশ করতে পারবি না—কিরে মরদ?

মুরুং ভরসা পেয়েছিল! রায় সাহেব এর মান রাখতেই হবে। আর দুতিনটে ক্যাম্প এদিকের বনপাহাহাড়ে কায করছে। তার মধ্যে কয়েকজন পরীক্ষা দেবে। মিঃ রায় ওকে নিয়ে পড়ান সন্ধ্যার পর। পাথরের বিভিন্ন স্তর। মিনারেল ডিপজিটের ইতিহাস সারান্দার ভূতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত। এ বনের অতলের সম্ভাবনায় অনেক তথ্য জেনেছে সে।

…পরীক্ষার ফল বের হতে মিঃ রায়ই ওকে জড়িয়ে ধরেন—সাবাস মুরুং!

সেদিন একটি পরদেশী দিখ্‌কেই মনে হয়েছিল পরম অপনানজ

বলে। মনে পড়ে মুকুংএর সেই ডুারির কথা, কানাই-ফটিক আরও বন্ধুদের কথা। মনে পড়েছিল বোরাই সর্দারের কথা। কতোদিন দেখেনি তাদের। কে জানে কেমন আছে তারা। ঝোরার ধারে বনচাপা —স্যান্টার্ন—গোলগোলি লতাপলাশের আগুনজ্বলা দিন, কুইলির সেই ডাগর চোখের চাহনি, সেই ভালোবাসার নিবিড় স্পর্শমাখা রাত্রির কথা মনে পড়ে।

আজ বড়বিলের রুক্ষ পাহাড়ীর নীচে কারো নদীর বনের মাথায় ঠাকুরাইনপাহাড়এর সীমা ছাড়িয়ে ওঠে ডুরখাইপিল তারাটা। বাতাসে ফিস ফিশিয়ে শোনে কুইলির সেই কথাগুলো—ডুরখা ইপিল সাক্ষী রইল, তুকে ভালোবাসলাম, সবদিলম। তু আমার জানরাগ বটিসুরে।

সেই জগৎ—কুইলির ভালোবাসার স্বপ্ন-সব যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ এত পেয়েছে সে, সরকারী চাকরী—নিজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু হারিয়ে গেছে অনেক, অনেক কিছু।

আজ সেই বলিষ্ঠ মুরুং যেন সেই ফেলে আসা জগতের সন্ধানে চলেছে গায়ে খাকি প্যান্ট সার্ট চেনাপথ, কিরিবুরুর সভ্য জগতের সীমানা—ক্রাশার প্লান্ট—রেললাইন ছাড়িয়ে এবার আদিম অরণ্যে ঢুকেছে তারা।

মিঃ রায় দেখেছেন এই অরণ্যকে।

এতদিন যে বন দেখেছেন এ তার থেকে স্বতন্ত্র। সেই অরণ্যকে গানের সঙ্গে তুলনা করলে মনেহয় ঠুংরির হাল্কা মেজাজী আনন্দময় একটি অনুভূতি। আর আজকের এ অরণ্য যেন জলদগম্ভীর সুরের কোন ধ্রুপদের মতই। সেখানে আছে গভীর ব্যঞ্জনা, রুদ্রস্পর্শী কোন মহান সুর, মেঘমৃদঙ্গের গুরু গুরু শব্দে তা রূপাতীত, রহস্যমগ্ন। সামনে আরও উঁচু ধ্যানগম্ভীর পাহাড়, দিনের আলোয় তার খানিকটা উদ্ভাসিত, আর নীচে জমেছে আদিম সনাতন কালের তমসা। এ কুমারী অরণ্যে পুরুষ সূর্য্যের কোন উত্তপ্তস্পর্শ তার শুচিতাকে স্পর্শ করে নি। এ মোহময়ী রুদ্ররূপী এক চিরপবিত্রা বন দুহিতা।

…মুরুং বুকভরে এ বাতাস নেয়, শাল ফুলের গন্ধ মিশেছে ধুতারি

—বন পিটুনিয়া ফুলের সুবাসের সঙ্গে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, এখানে যেন চিররাত্রি নেমে থাকে, তাই ঝিঁঝিগুলো মুখর, পাহাড়ের গায়ে বনকলা—বাঁশ বনের ঘন বেষ্টনি, সব ছাপিয়ে দীর্ঘ দেহী বলিষ্ঠ শাল গাছগুলো আকাশ ঘিরে রেখেছে। জিপটা ভিজে স্যাঁতস্যাতে পথ দিয়ে পাহাড়ে ঠেলে উঠছে আর্তনাদ করে। বুক ভোর সবুজ টাইগার গ্রাসএর জঙ্গল গজিয়েছে ফাঁকা জায়গাটুকুতে!

....পাহাড়ের এদিকের ঢালের দিকে এসে জীপটা বাঁকের মাথায় হঠাৎ যেন অন্য একটি জগতে এসে পৌচেছে।

...হঠাৎ অরণ্যভূমির বুক থেকে বিরাট একটা চাকলা যেন একদল লুটেরা এসে লুটপাট করে সেখানে এক শূন্যতা, নিঃস্বতার রাজ্য গড়ে তুলেছে। অরণ্যের বাহার সেখানে নেই, গড়ে উঠেছে মানুষের দখলদারি। আর এনেছে অন্য জগতের অনেক কিছু যা এই ঘন অরণ্যের পরিবেশে বেমানান ঠেকে। এ অরণ্যের মহান সুরের তাল লয় সব চকিতের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বন থেকে বের হয়েছে করমপাদার এলাকায়। মুরু দেখছে এই নোতুন করমপাদাকে! অবাক হয়। সামনে বনের গভীর থেকে বের হয়ে এসেছে নোতুন রেললাইন উঁচু বাঁধের উপর লোহার লাইন দুটো সামন্তরালভাবে গিয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেছে, এপাশে খানিকটা জায়গা সমতল করে ষ্টেশন মত করা। লোকজন যাতায়াত করে না, এপথে শুধু লোহা পাথর অন্যান্য খনিজ জিনিস বনের লগ কাঠ এসবই যাবে মালগাড়িতে। দুচারজন রেলের উদিপরা লোকও রয়েছে, লাইনটা এখানেই শেষ হয়েছে। সামনের পাহাড়ের গা থেকে আদিম সারান্দা আবার স্বমহিমায় বিরাজমান। লাইনটা এসে এখানে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। দু'চারখানা খালি ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে।

মোরামঢালা রাস্তাটা লাইন পার হয়ে ওদিকে সদ্য গড়ে-ওঠা জনবসতে গিয়ে শেষ হয়েছে। জিপটা লাইন পার হয়ে ওইখানে এসে থামলো!

একটাখানিরাস্তা, এটার ছদিকে কয়েকটা দোকান বসতবাড়ি উঠেছে। সেলাই কল বসেছে—কাঠের তাকে কিছু ছিট কাপড় ছোট ধুতি গেঞ্জি গামছা সাজিয়ে কোন লালাজী এই অরণ্য গহনে এসে ডেরা পেতেছে। মনে হয় এটা তার সাইড বিজনেস, আড়ালে কোন অন্য ব্যবসা নিশ্চয়ই আছে। তু একটা চায়ের দোকানও গড়ে উঠেছে। চা ও কাঁচা টাটকা শালপাতায় সেঁও ভাজাও বিক্রী হয়।

ওদিকে একটু ফাঁকা মত জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ইতিমধ্যে এদের ক্যাম্পের জায়গাও তৈরী হয়ে গেছে, বেশ কয়েকটা তাঁবুও পড়েছে। কিচেন টেণ্টএর উনুনে আগুন জ্বলছে, চা চেপেছে। প্রভাত রায় জায়গাটাকে দেখেছে। ওদিকে সদ্য কাটা বনভূমির এতদিনের গাছএর মূল শিকড় তুলে চাষ দেওয়া হয়েছে। উর্বর অহল্যা মৃত্তিকা কালচে মাটির বুকে মাথা তুলেছে ঘন সবুজ মকাই গাছগুলো। দু-চারজন এর মধ্যে বসতি গড়েছে, কাঁঠাল গাছ এখানের বনে প্রচুর হয়। জঙ্গলকাটার সময় দুচারটে বলিষ্ঠ ভরাযোয়ান কাঁঠাল মহুয়ার গাছকে ওরা কাটেনি। কাঁঠাল গাছের আগাপাশতলা ছেয়ে এসেছে ফুলের মুছি, তীব্র সৌরভে বাতাস ভরে ওঠে। ফাঁকা মাঠে উলসী তিল-এর চাষ করেছে। হলুদ সোনালী উলসী ফুলে ভ্রমরের কানাকানি।

প্রভাতবাবু বলে—এ যে আরণ্যকের দেশে এলাম হে।

মনে হয় লবটুলিয়া ন্যাড়ানবহইয়ার অরণ্যভূমি কেটে কেটে এমনি করে মানুষ দখল করেছিল সেই অরণ্য।

আজও সেই দখলদারি শেষ হয়নি। সামনের ছায়াঘন পাহাড় গুলোতে এবার নোতুন খাদান শুরু হবে। তাতে উঠবে লোহা পাথর, আরও কিছু। প্রভাত রায় দলবল নিয়ে এসেছেন সেই সমাজের ওদের সেই হানাদারদের তিনি যেন অগ্রদূত। কি বেদনাভারে ওই অরণ্য ভূমির দিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

মুরুং নোতুন ক্যাম্পে এসে বনের স্বাদ পেয়ে অনেকটা মুক্ত বোধ করে নিজেকে। চারিপাশে আদিম অরণ্য, এই বাতাস তার চেনা—ওই গন্ধ তার জানা, পাখীর ডাক তার পরিচিত। এদিক ওদিক

ঘুরে ফিরে দেখছে সে, সামনের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে মোরমঢালা পথটা, এই পথ গেছে বনের গভীরে তাদের কুসমা ডুংরির দিকে, পাহাড়ের ওদিকে, দুটো ঝোরা—কিছুটা বন পার হলে তার সেই ডুংরি

এখানের বসতিতে চায়ের দোকানে বাতি জ্বলছে। রেল ইষ্টিশানের ঘরের আলোটা দেখা যায়, সামনে সিগন্যালে কে একটা আলো টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। অরণ্যর বুকে সেই লাল চাহনিটা জ্বল জ্বল করে।

···চায়ের দোকানে রেডিও বাজছে। রেডিওর ওই হিন্দীগানের সুর এখানে বেমানান বোধহয়, হাওয়ায় বনের দিক থেকে বিচিত্র সুর ওঠে এখানে। চারদিকের ঘন অরণ্যে অন্ধকার নেমেছে; মানুষ-গুলো অরণ্যে যেন হারিয়ে গেছে।

মুরুং, ফুলু, গোবিনকে নিয়ে গোটা কয়েক গাছের গুড়ি ডাল টেনে গড়িয়ে আনে ক্যাম্পের এলাকায়। ফুলু গজ গজ করে।

—শালো ইখানে ই বনে এসে মরতে হবে হে! বড়বিলের মাগী-গুলান ছিল তোফা, মদও তেমনি সরেশ। ইখানে কুথায় কি পাই বলদিকি?

মুরুং বলে—তুদের জন্যেই ই বনও নরক হবেক ইবার। খাদানের কাজ চালু হলেই সব এসে জুটবেক।

ফুলু মদএর সন্ধানে কাকে কি বলে শোনায়।

—সিসব যখন হবেক তখন হবেক। ইখন তো নাই! ব্যাস?

মুরুং বৈকালের আলোতে বনের ওদিকে ছোট ঝর্ণার দিকটা ঘুরে এসেছে। বনের মানুষ সে, তাই বলে—এখন কাঠ-এর কুঁদোয় আগুন দিয়ে রাখ! সারন্দার বন হে। সতর থাকা ভালো রাত বিরেতে।

ও গুঁড়ি কয়েকটায় আগুন জ্বালায়।

মিঃ রায় বলেন—ওসবে কি হবে মুরুং?

মুরুং তার সাবধানী সন্ধানী চোখ দিয়ে অরণ্যের অশিক্ষিত হুঁসিয়ারীটুকুকে জেনেছে। সে বলে—আগুন করে রাখা ভালো স্যার। ই বনকে বিশ্বাস নাই। তাছাড়া···

ফুলু গর্জে ওঠে—কচু হবেক! এতো লুক রইছে।

মিঃ রায় তবু মুকুল-এর কথা শুনে বলেন—ও বলছে যখন খাবার পর ওগুলোর দু-একটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখো।

রাত্রি নেমেছে বনে। ছোট্ট এই জনবসতের বাতি দু-একটা নিভে গেছে। সবকিছু যেন সারান্দার মহারণ্যভূমির আদিম রহস্যে তলিয়ে গেছে। মানুষের রাজ্য এ নয় যেন—মানুষ এই প্রকৃতিতে হার মানতে পারেনি এত চেষ্টা করেও। এ যেন তার পূর্ণ সত্বা নিয়ে এই অরণ্য বিরাজমান।

সারা আকাশ এখানে ঝকঝকে, মালিন্যমুক্ত। তারাগুলো জ্বলছে প্রদীপ্ত শিখায়। স্তব্ধতার মাঝে জেগে ওঠা অরণ্যের নিজস্ব শব্দ শোনা যায়। কোথায় একটা চাপা গর্জন ওঠে, বনে বনে সেই গর্জনটা ছড়িয়ে পড়ে, দূরে মিলিয়ে যায় ক্রমশ। একটা হরিণ ডেকে ওঠে তীক্ষ্ণস্বরে—কোয়াক্, কোয়াক্!

মিঃ রায়-এর ঘুম ভেঙে গেছে। ক্যাম্প খাটে শুয়ে বাইরের আকাশ বনানী দেখা যায়।

অপরূপ অরণ্য ভূমি মানুষের অস্তিত্বের কোন স্বাকৃতি এখানে নেই। একফালি চাঁদ পাহাড়ের মাথা থেকে বিষণ্ণ পাণ্ডুর চাহনি মেলে দেখছে এই জগৎকে। মিঃ রায় তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কতদিন যেন এই জগৎকে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন।

ঘুমোতে পারে নি মুকুল।

সে দীর্ঘদিন পর যেন ঘরে ফিরেছে। কুইলির মাতাল দেহের কথা মনে পড়ে। বোরাই সর্দারের কান্না-ভিজে চোখ দুটো যেন আজও তার দিকে সদাজাগর হয়ে চেয়ে থাকে। কালই ছুটি করে যাবে সে ওদের কাছে। ফিরে এসে কাজ শুরু করবে এখানে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে বনভূমি কেঁপে ওঠে। একসঙ্গে যেন বেশ কয়েক জোড়া শাঁখ বেজে ওঠে। আর ডাল বাঁশ বন ভাঙ্গার মড় মড় শব্দ ওঠে, যেন বনে ঝড় উঠেছে।

বসতির মানুষগুলো চীৎকার করে, টিন কানেস্তারা পিটছে,

দু-একটা ক্র্যাকারের শব্দ ওঠে বুম্ বুম। দৌড়াদৌড়ি করছে ভীত ত্রস্ত লোকজন।

মিঃ রায়ও উঠে পড়েন—মুরুং, ফুলু, গোবিন, বন্দুক হাতে প্রভাত রায় তাঁবুর বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। ওদিকে এসে দাঁড়িয়েছে বিরাট হাতিটা, থামের মত পা ঠুকছে আর শুঁড়টা বাঁকিয়ে আকাশে তুলে বিকট হাওয়া ছাড়ার শব্দ করে—সোঁ, সোঁ—ও। আর সেই সঙ্গে গর্জন করে।

মুরুংও দেখছে বিরাট প্রাণীটাকে। হুঁশিয়ার করে সে।

—সরে আসুন সাহেব। সামনে আগুন রয়েছে, ও আসবে না। আপনি হঠে যান তাঁবুর মধ্যে।

হাতিটা যেন বনের সম্রাট, ও মানুষের উপস্থিতি সহ্য করতে নারাজ। আগুন জ্বেলে রেখেছিল মুরুং···ইচ্ছা করেই। এদিকে রেললাইনের জলার ধারে হাতির পায়ের ছাপই দেখেছিল, তাতে বুঝেছিল হাতিদের যাতায়াত আছে এদিকে।

রোগ হাতিটাও ঘুরছে এখানে। দত্তসাহেবও বলেছিল ও ব্যাটা এদিকেই আছে।

এদিকে শাসিয়ে এবার হাতিটা ধীরে ধীরে নিজের মেজাজে রেললাইনে উঠে চারিদিক দেখে শুঁড় দিয়ে রেলের লাইনটাকে ধরে দু'একবার চেষ্টা করতেই—লাইনটা পড় পড় করে খানিকটা উঠে গেল। কি আক্রোশে সেটাকে দুমড়ে ফেলে ওদিকের শূন্য ওয়াগন-টাকে নিয়ে পড়েছে। একটা লাথি মারতে সেটা গড়িয়ে চলছে, ওপড়ানো লাইনটার কাছে এসে প্রচণ্ড শব্দে ঢালুর মুখে লাইন থেকে ছিটকে গড়িয়ে পড়লো ওয়াগনটা অনেক নীচের শালবনে।

হাতিটা এবার তার করণীয় কাজ শেষ করে একবার বিজয় গৌরবে চীৎকার করে বনের জবরদখলকারীদের হুঁসিয়ার করে ওদিকে চলে গেল।

···স্তব্ধ ভীত চকিত মানুষগুলো চেয়ে দেখছে অরণ্যের কোন অপদেবতা যেন এসে এক নিমেষে ঘোষণা করে গেল—তাকে হার মানাতে পারে নি এরা।

…ঝুলু হোর নেশা ছুটে গেছে। সে বিড় বিড় করছে।—আয় বাপ! ইটো কি রে?

মুরুং বলে—সেই দাঁতালটাই বটে সাব্। দত্ত সাব্-এর খোঁজেই করছিল।

হঠাৎ ওদিকের দোকান বসতের ঝুপড়ি থেকে আর্তনাদ—ভীত ত্রস্ত চীৎকার স্তব্ধ বনরাজ্যকে ভরিয়ে তোলে। সারান্দার প্রবাসদূত হানা দিয়েছে এই নতুন বসতে।

রাতের আবছা অন্ধকার থেকে জাগছে সেই ভীত ত্রস্ত জনবসত। ওই দোকান পাটের কয়েকটা চালাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে বিশাল দানবটা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রঙ্গীন সালু কাপড়, উল্টে পড়ে আছে সেলাইয়ের কল, সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে কোন পুঁতি জারির দোকানের কাঁচের শো কেসটাকে চুরমার করে গেছে। একটি পরিবার স্বামী স্ত্রী কোলের বাচ্চা নিয়ে শুয়েছিল, তারা বের হতে পারে নি। পিষে তাদের দেহগুলোকে রক্তাক্ত তাল করে দিয়ে রেখে গেছে।

সাজানো ছোট, বসতে হানা দিয়েছে সারান্দার অরণ্য দানব। ওরা মানুষকে এখানে ঢুকতে দেবে না। ওদিকের মকাই ক্ষেতগুলোকে তছনছ করে গেছে সেই যূথপতি দলবল নিয়ে এসে, চুরমার করে গেছে ওয়াগনটা, তুলে শূন্যে দুমড়ে রেখেছে ওদের লুণ্ঠনপর্বের যোগানদার ওই রেল লাইনটাকে।

…খবর ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের জগতে। মিঃ রায়ও একটু ঘাবড়ে গেছেন। এই ঘন বনে আদিম হিংস্র রাজ্যে কায করতে হবে তাদের। তবু রাতের অন্ধকারে মুরুং কাঠের গুঁড়িগুলোয় আগুন জ্বেলে ওই দানবের আক্রমণ ঠেকিয়েছিল।

প্রভাতবাবু বলেন—আজ ক্যাম্প-এ থাকবে সবাই, কাযকর্ম দু একদিন দেখে সুরু করবো।

মুরুং ভেবেছিল আজ সে যাবে তাদের ডুংরিতে। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে বনের মধ্য দিয়ে গেলে ঘণ্টা দুয়েকের হাঁটাপথ, এ পথে

চলা অভ্যাস আছে তার, জিপে গেলে ঘুরে যেতে সময় লাগবে। কিন্তু মিঃ রায় বলেন-কাল এত কাণ্ডের পর হাতিটা দলবল নিয়ে কাছেই আছে। আজ নাই বা গেলি মুরুং!

মুরুং মিঃ রায় এর কথাটা ফেলতে পারেনা, তবু বলে—ই বনে ওসব ও আছে, আমরাও ছিলম স্যার। উদিকে ক্ষেপাই দিচ্ছে ইসব যন্তর-পাতি, এই আলো। মানুষের সরগরম, নালে উরোতো ডুংরিতে ইসব করে না।

হয়তো ওর কথাটা সত্যি। মানুষের দখলদারীকে ওরাও জেনে ফেলে যেন মরীয়া হয়ে আক্রমণ করেছে।

মিঃ রায় বলেন-হয়তো সত্যিরে।

নোতুন বসতের এই ধ্বংসস্তূপে তখনও ওঠে কাদের চাপা কান্নার সুর। মানুষগুলো ভয়ে শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ শোনা যায় একটা জিপের শব্দ। বন থেকে লাল ধূলো উড়িয়ে জিপটা এসে থামলো মিঃ রায়-এর ক্যাম্পের সামনে।

নেমে আসে শিবু দত্ত। পরণে হাফ প্যাণ্ট, কোমরে চামড়ার বেল্ট, চকচকে বড় সাইজের রাইফেলের তিন থাক বন্দী খাঁজ কাটা বুলেট, হাতে ফোর সেভেন ফাইভ হেভি রাইফেল, বাহানা নামছে, কোমরে ওর ইয়া ভোজালী খাপবন্দী, হাতে ধারালো কুঠার, জন্মলগ্নেই যেন ওটাকে সে ধরে মানুষ হয়েছে।

—দত্ত সাব!

শিবু দত্ত বলে—মিঃ রায়: কালরাতের খবর পেয়েই চলে এলাম। এই নিয়ে ব্যাটা দেড় ডজন মানুষ মেরেছে, ইস্—

তছনছ করেছে মানুষের বসত, টেনে টেনে ফেলেছে বেড়ার ঘরগুলো, খুঁটিগুলোকে ভেঙ্গেছে দাঁতন কাঠির মত। রেলের কর্তারাও এসেছেন, যন্ত্রপাতি বোঝাই ওয়াগনগুলো নীচে গড়িয়ে পড়েছে—রেললাইন জোড়াটা আশমানে তুলে মুচড়ে গেছে।

ভীত ত্রস্ত লোকগুলো বলে—ইখানে থাকতে দিবেক নাই উরা।

বনের ফরেষ্ট অফিসার বলেন—হান্দাকুলির ফরেষ্ট বাংলোও ওরা

বানাতে দেয়নি। বড়যাড় জঙ্গলে দেখেছেন তো দত্তসাহেব মারোয়াড় বাংলো এ্যাবানডন করতে হয়েছে, বসতির মানুষগুলো পালিয়ে বাঁচলো হাতির এমনি এ্যাটাক সইতে না পেরে।

হানদাকুলির ঘটনাটা জানে মুরুংও, দত্তসাহেবও এ বনের অন্ত-প্রত্যন্তে ঘোরেন। তিনিও দেখেছিলেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সেখানে একটা বাংলো তৈরী করতে শুরু করে। গভীর গহণ অরণ্য।

দিনমানে মিস্ত্রী মজুররা গিয়ে কিছুটা গাঁথাই করে আসে, আর রাতের অন্ধকারে হাতিগুলো এসে সব গাঁথুনিগুলো ভেঙ্গে তছনছ করে ইট, কাঠ, দরজার ফ্রেম সব ছিটকে ছড়িয়ে রেখে যায়, দুচার বার চেষ্টাও করেছিল। দত্তসাহেবকেও খবর দিয়েছিল তারা।

শিবু দত্ত দেখে শুনে বলেন—এমন সুন্দর বন, এখানে ওরাই নাহয় শান্তিতে থাকুক। ওদের রাজ্যে ইমারৎ গড়ার কি দরকার?

সে বাংলো আর তৈরী হয়নি। সেই বনাঞ্চল এখান থেকে আরও গভীরে। এখানে এখন বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হতে চলেছে। যন্ত্রপাতি বসছে। মিঃ রায় বলেন

—এরাও এখানে ঐ কাণ্ড করবে নাকি?

দত্ত সাহেব ভাবছেন। রেলের কর্ত্তাদের একজন, মাইন্‌স বোর্ডের কোন কর্ত্তা বলেন—সামথিং মাষ্ট বি ডান্ মিঃ দত্ত।

শিবু দত্ত ভাবছে কথাটা।

এ অরণ্যে দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। মুরুং বলে,

—ওরা থাকবে কুথায় দত্ত সাব, ওদেরই তো ই বন—

হাসেন শিবু দত্ত ওর কথায়, বলেন,

—তবে তোর কেন ডুংরিতে ঠাঁই হয়নি রে মুরুং?

মুরুং চমকে ওঠে। তাকে ওরা থাকতে দেয়নি। ঘরছাড়া করে গারদে পুরেছিল। তাই ঠিক তেমনি যেন ওদেরও এখানে আর ঠাঁই হবে না। রাতের তারাজ্বলা অন্ধকারে দেখেছিল মুরুং সেই বনের জীবদের। কি জ্বালায় ওরা জ্বলে উঠেছে!

...চাইল মুরু! বনভূমি কেঁপে ওঠে। ইষ্টিশানের ওদিকের

পাহাড়ে যেন ঝড় উঠেছে। আর্তনাদ করে ধ্বসে পড়ছে জমাট পাথর, ছিটকে পড়ে পাথরগুলো। ব্লাষ্টিং করছে ওরা। ওই পাহাড়ের অতলে আছে দামী লোহাপাথর আরও অনেক কিছু। দিগুরা এর দখল ছাড়েবে না। লাইনটাকে মেরামত করার কাজ শুরু হয়েছে। কর্কশ ধাতব শব্দ ওঠে। বাতাসে তখনও ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড় ফাটানোর আকাশভরা গর্জন আর অরণ্যের হাহাকার।

বিরাট হাতিটা থমকে দাঁড়ালো। কুলোর মত কান দুটো খাড়া করে সে হাওয়ার কাঁপন অনুভব করে, শুঁড়টা শূন্যে তুলে কিসের স্পর্শ। খুঁজছে। থমকে দাঁড়িয়েছে সে। শুক্‌নো পাতায় কিসের শব্দ সাবধানী পদক্ষেপের একটু কাঁপনও হাওয়ায় জেগেছে। ধরা পড়েছে তার কানে। দেহের অনুপাতে চোখ দুটো অনেক ছোট। তাই বেশিদূর অবধি দেখতে পায় না অন্ধকারে, কিন্তু বুঝেছে কারা যেন পিছু নিয়েছে তার।

দলের অন্য হাতিগুলোর থেকে সরে এসেছে বড় দাঁতাল হাতিটা। ও জানে দু-পেয়েগুলো তাকে ছাড়বে না। কাল রাতে সে হানা দিয়েছিল ওদের বসতে, এককালে ওই করমপাদার জঙ্গলে ছিল তাদের আস্তানা, কয়না নদীর জল জমতো নীচু জমিতে পাহাড়ের নীচে ; সেই জলে ওরা নেমে পড়তো, ওড়কলমির লতা—ফুল, বাঁশ, কলাগাছ খেতো। সেই সব এখন হারিয়ে গেছে। বুনোপদ্মের নাল, ফুল এর স্বাদ ভুলে গেছে তারা। আজ সেখানে গড়েছে দু-পেয়েদের পুকুর, বাড়ি-ঘর। বাতাসে ওঠে ওদের বদবু। যূথপতি এসে তাই হানা দিয়ে ওদের বসতকে তছনছ করে দিয়ে গেছে, পায়ের নীচে থেঁৎলে দলে দিয়েছে দুপেয়েদের কয়েকজনকে, গায়ের জ্বালাটা মেটেনি।

ওই যূথপতি হাতিটা তীব্র ঘৃণা জ্বালা নিয়ে চীৎকার করে ওঠে বন কাঁপিয়ে। শুঁড় তুলে কিরিবুরুর পাহাড় চূড়োয় সদ্য গড়ে ওঠা জনপদকে যেন শাসাচ্ছে সে।

দলটা নিয়ে চলেছে গহন বনের ভিতরে। পায়ে পায়ে লতাগুলো

ছিঁড়ছে, ফুটন্ত লতাপলাশ—চিহড় লতা, শুঁড় দিয়ে টেনে সরিয়ে ওরা পথ করে চলেছে নিরাপদ আস্তানার দিকে। তৃষ্ণার্ত তারা-ঐ খানের বাতাসে শোনে কয়নার শব্দ।

ওই কালো শীতল জলে নামবে ওরা, অবগাহণ স্নান করবে, আকণ্ঠ পান করবে মিঠে জল। যূথপতির পিছনে দলটা চলেছে।

তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠে বড় দাঁতাল হাতিটা।

কয়নার কালো জলধারা কোথায় হারিয়ে গেছে। জল নয়—সেই শান্তির সন্ধান নেই, তৃষ্ণা মেটার আশ্বাস নেই। জলটা লাল রক্তের মত জমাট স্রোত নিয়ে চলেছে। এ জলে তৃষ্ণা মেটে না। অবগাহণ স্নানও করা যাবে না! কয়নার বুক ভরে গেছে লাল দগদগে পলি কাদায়। ওরা জানে না কিরিবুরুর বিরাট আয়রণ ওর ওয়াশারির ক্লেদাক্ত জল এসে নেমেছে ওই নদীতে সবুজ বনের বুক চিরে বহতা কয়না নদী আজ মানুষের কারখানার কলুষ বিষে বিযাক্ত। তৃষ্ণার জলটুকুও আজ তাদের কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে আশ্রয়, যূথপতি দেখছে দলের যৌবনবতী—ছোট বড় হাতিগুলোকে, দু চারটে বাচ্চাও রয়েছে। তৃষ্ণার্ত তারা।

চীৎকার করছে যূথপতি; রাগে গরগর করছে হাতিটা। বনের আরো গভীরে চলে গেছে দলটা, দাঁতাল ঐ হাতিটা রুখে দাঁড়িয়েছে, সে এগিয়ে চলে অন্যদিকে। দুপেয়েদের বসতির সন্ধানে।

…সাব্! রায়ান মুণ্ডা পায়ের ছাপটা দেখছে ভিজে মাটিতে, একটা হাতিই নিঃসঙ্গ ঘুরছে এই মুলুকের আশেপাশে, ভিজে মাটিতে ঝুড়ির আকারের গোলদাগ, ভারি পায়ের খাঁজগুলোর মটরের টায়ারের মত দাগ, বাতাসে কি শুকছে রায়ান।

দত্তসাহেব রাইফেল লোড করে ওই হাতিটার সন্ধানেই ঘুরছেন, মত্ত হাতিটাকে শেষ করতেই হবে। আজ সে এদের শত্রু!

সাংঘাতিক প্রাণীটা যেন ওদের চোখে ধূলো দিয়ে সরে যাচ্ছে শিবুদত্ত দুপুর থেকে ট্রাক করছে, দু একবার দেখেছে বিরাট হাতিটাকে, সারা গায়ে, লাল মাটি মাখা, মাঝে মাঝে বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার তোলে।

ওরা ঘিরে ফেলেছে হাতিটাকে, অভিজ্ঞ শিকারী দত্ত সাহেব জানে হাতিটা বেড় ছিটকে হান্‌দাকুলির গভীর অরণ্যের দিকে পালাতে চাইছে, সেখানে আছে তার দলবল, আছে কারো নদীর গহিণ জল, নাগরার বিল জলা। এদিকে তৃষ্ণার জল বিশেষ নেই, কয়না নদীর জল বিষিয়ে দিয়েছে এরা। ও তৃষ্ণার্ত হয়ে বনে বনে ঘুরছে, স্নান করার জলও পাবে না। ওই গর্জনে সেই তৃষ্ণার্ত-হাতিটার জ্বালাই ফুটে ওঠে।

...এ যেন লুকোচুরি খেলা। রায়ান বলে।

—সিধাই হ্যায়, উ!

দত্তসাহেব জানে এবার বেড় দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে, হাতিটাকে এনে সিরিং বুরু পাহাড়ের খাড়া রকফেসের সামনে এনেছে।

ওর পালাবার পথ আর নেই

বন্দীবেড়ে পড়ে হাতিটা ফুঁসছে—সামনে তার বিরাট উঁচু একটা পাহাড়, রংটা কালো পাথরের প্রাচীরের মত সেটা উঠে গেছে, এবার যূথপতি তীব্র গর্জন করে ওঠে।

সামনে কালো পাথরের দেওয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের স্তূপের মত বিশাল হাতিটা। আসমানে শুঁড় তুলে আকাশ ফাটানো চীৎকার করছে—পা ঠুকছে! দুলছে শুঁড়টা—কানগুলো নড়ছে!

বাতাসে এবার সেও গন্ধ পেয়েছে দুপেয়েদের! ওরাই তার পিছু পিছু ঘুরছে, ঠেসে এনে এই বন্দীদশায় ফেলেছে, জল নেই, তৃষ্ণার্ত হাতিটা এবার কি মত্ত আক্রোশে ফুলে ওঠে, সবশক্তি একত্রিত করে এবার আঘাতও হানবে সে।

....সাব্! রায়ান ফিসফিসিয়ে ওঠে। কালো বিশাল পাথরের স্তূপটা সচল হয়ে এগিয়ে আসছে, দেখেছে এবার মানুষ দুটোকে, ওরাই সেই শত্রুপক্ষ।

দত্তসাহেব জানতো এমনি ভাবেই সে এবার চরম আক্রমণ হানবে। স্থির লক্ষ্যে হেভি রাইফেলটা তুলেছে, এতদিন পর আজ এসেছে সেই

মুহূর্ত, দাঁতদুটো আকাশের দিকে তুলে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসছে দৈত্যটা।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শব্দটা ওঠে, একটা পাহাড়ে যেন এসে ঠিকরে পড়েছে হাতিটা। ফোর সেভেন ফাইভ হেভি রাইফেলের ছোট-খাটো শেলটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ওকে ছিটকে ফেলেছে, মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে গুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, আর একটা আকাশ কাঁপানো গুলির শব্দ ছাপিয়ে সারান্দা অরণ্যের যূথপতির অন্তিম আর্তনাদ ওঠে। ছিটকে পড়েছে প্রকাণ্ড দেহটা, শেষ চেষ্টা হিসেবে ধরেছিল শুঁড় দিয়ে একটা সেগুন গাছ, সেটা ওর দেহের টানে মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ে—কি দীর্ঘশ্বাসের মত। কালচে পাথর—লালমাটি ওর রক্তে ভিজে ওঠে।

…দত্তসাহেব টুপিটা খুলে যেন অরণ্যের পরাজিত সম্রাটের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানায়, রায়ান বলে—

—সব সে বড়া দাঁতাল সাব্—সারান্দাকা শাহানশাই হোগা!

….এসে পড়েছে করমপাদা বসতির লোকজন—কুলি ডুংরির মানুষ-জন। কুলি কলোনীতে আনন্দের সাড়া ওঠে।

এ বনের পরম শত্রু শেষ হয়েছে আজ, এসে পড়েছেন প্রভাত রায়, মুরুং, ফুলুদের দলও।

মুরুং এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওই হাতিটাকে এর আগেও দেখেছে সে তাদের ডুংরির আশেপাশে। ওরা কুলোয় করে ধান নামিয়ে দূর থেকে জোহার করতো, বোরাই সর্দার বলতো—গণেশ বোঙা! হেই বাবা গণেশ বোঙা—দয়া করো।

ওরা দলবেঁধে থমকে দাঁড়ালে, হাতিগুলো ওই ধান খেয়ে আবার বনের গভীরে ঢুকে যেতো। ক্ষেতে নামলে এরা ধামসা, টিন পিটিয়ে তাড়া করতো—সরে যেতো ওরা, এই ভাবেই দিন কেটেছে বনে বনে।

আজ সেই ফুলফোটা বনের সব সুবাস মুছে আসছে, হাতিটার চোখের সামনে অস্বচ্ছ হয়ে আসছে কতো স্বপ্নময় রাত্রি, যৌবনবতী

কোন হস্তিনীর আদর ; কোন মত্ততার প্রকাশ। কান পেতে সে শোনে বোরার শব্দ।

ভিজে বাতাসে বনচাঁপার উদগ্র সুবাস, আজ সব বারুদের ধোঁয়ায় —ওই যন্ত্রের ধাতব শব্দে—মত্ত মানুষের গর্জনে মিশিয়ে যায়, হারিয়ে যায়।

—সাব!

হাতিটা শেষবারের মত শুঁড়টাকে নাড়িয়ে যেন এই ফুলফোটা অরণ্য এই জীবনকে নমস্কার জানিয়ে গেল। আছড়ে পড়ে ওর শুঁড়টা। স্তব্ধ হয়ে গেল জীবনের স্পন্দন।

আর্তনাদ করে ওঠে মুরুং—উকে ক্যানে মারলা মারাং শিকারী! কেন চলে যেতে দিলা নাই হান্‌দাকুলির বনে, কেনে তিয়াস লিয়ে ইকে মারলা? কেনে? কি করেছিল তুমার?

শিবু দত্তও যেন অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ওরও মনে হয় শেষ আর্তনাদে ওই যূথপতি জানিয়ে গেল সেই নির্মম আকুতিই— যা ধ্বনিত হয়েছে এই অরণ্যের আদিম মুণ্ডাদের বংশধর ওই মুরুং এর আর্ত কান্নায়।

কি বেদনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মুরুং।

—মুরুং!

মিঃ রায়ের হাতের ছোঁয়ায় চাইল মুরুং। দু চোখ তখনও ওর জলে ভরা। মিঃ রায়েরও মনস্পর্শ করেছে ওর এই আর্ত কান্না—নিষ্ফল এই অভিযোগ। এ যেন কঠিন নির্মম একটি সত্য যাকে জেনেও অস্বীকার করতে হচ্ছে তাদের।

বনমর্মরে ওঠে সেই হাহাকার। মিঃ রায় বলেন,

—চল মুরুং! ওঠ!

ওরা নির্মম কোপে বিশাল হাতিটার শোভন বলিষ্ঠ দুটো রূপালী দাঁতকে কেটে বের করেছে, সভ্য দিগ্গদের ঘরের শোভাবর্দ্ধন করবে ওগুলো। চারটে পাকে কাটছে, ও গুলো টার্কিডামিষ্ট তৈরী করবে সৌখিন বসার টুল, হাড়গুলো অবধি ওরা লুট করে নিয়ে যাবে যে

ভাবে সারান্দার অরণ্য থেকে ওরা কাঠ পাতা পাহাড় এর দামী পাথর গুলোকে লুঠ করে চলেছে ঠিক সেই ভাবেই।

মিঃ রায় জিপটা চালাচ্ছেন নিজে, মুরুং গুন হয়ে বসে আছে। আজ সে একটি নিষ্ঠুর সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ ওঠে। ষ্টেশনের ওদিকে পাহাড়ে এবার পুরোদমে কাজ সুরু হয়েছে, ভাঙ্গা রেললাইনের ওমাথা অবধি একটা ইঞ্জিন কয়েকখানা ওয়াগন টেনে এনে থেমেছে। তার থেকে লোকলস্কর নেমে পড়ে ভাঙ্গা রেললাইন মেরামত করতে সুরু করেছে।

মিঃ রায় মুরুংকে যেন সান্ত্বনা দেবার মতো স্বরে বলেন,—কাল পরশু চল তোদের ডুংরির ওদিকে যাবো।

মুরুং জবাব দিলনা। গুমহয়ে থাকে—মনেহয় সে নিজেই যেন এই সারান্দায় ফের ঢুকেছে মূর্তিমান অমঙ্গলের দূত হয়ে। এনেছে কোন সবনাশের ইঙ্গিত!

ডুংরিতে সে যাবে কিনা ভাবছে। মনেপড়ে কুইলির কথা-তার ডাগর দু'চোখের চাহনিতে রাতের তারার ঝিলিক। সেই নিবিড় স্পর্শ! মনেপড়ে তার কথাগুলো।

—তু আমার জানরগ হ'লি মুরুং—তুকে ভালোবাসলম্—

কুইলি যেন ডাকছে তাকে! বনে বনে শুনেছে সেই ডাক। আজ কেন জানেনা মুরুং তার বেদনার্ত মন কুইলিকে পেতে চায়। যাবে সে ডুংরিতে—বোরাই সর্দারকেও মনে পড়ে।

...কুইলি এখানে এসেছিল মুরুং এর সন্ধানে। দুর্গা রায়ানকে ও দেখেছে। সাজবেশ করে বের হয়ে যায়—তার বাপ্‌কে দেখেছে ওই মেয়েটার সঙ্গে। দুর্গা বলে শান্ত হয়ে থাকবি কুইলি। কাজ সেরে ফিরে এসে তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবো। স্কুলে যাবি কিন্তু!

দুর্গা রায়ান সোনাই এর সঙ্গে কুইলিকে নিয়ে গেছল ফাদার লেডির স্কুলে। কুইলি দেখছে মেয়েদের। ও যেন তাদের থেকে স্বতন্ত্রই।

বেশ বুঝেছে ওকে দেখে। হেসে গড়িয়ে পড়ে মেয়েদের অনেকে।

কে বলে—বুনো একটা মেয়েকে ধরে এনে এবার পোষমানাবে দুর্গা রায়ান। শেষকালে সাহেবদের ভোগে লাগাবে দেখিস।

কুইলি মুখবন্ধ করে থাকে। ওদের ওই হাসি—টিটকারীটা বুঝেছে সে। মেয়েদের কে তার খোঁপাটা দেখে বলে—আবার ফুলের বাহার হয়েছে! নাচতে নামবে নাকিরে?

তা গা গতর কাঁপালে অনেক ছেলেই জুটে যাবে!

যা চেহারা খান্!

হাসছে ওরা। মেয়েদের কে বলে—দুর্গারায়ান তাইতো পুষেছে ওটাকে। নিজেও জুটিয়ে নিয়েছে একটা শাসালো বুনোকে, শুনেছি লোকটার অনেক টাকা কড়ি।

দেখবি এ মেয়েটাকে কোথায় চালানকরে এবার ওই লোকটার সবকিছু লুটে নেবে! যা চালু মেয়ে দুগ্গা। ওদের কথাগুলো আর এগুলো না। দিদিমণি ক্লাশে ঢুকেছে। কুইলি কয়েকদিন স্কুলে এসে এদের মাঝে পড়ে যেন জ্বলে উঠেছে রাগে। সে রাগের প্রকাশ নেই—গুমরে ওঠে মাত্র।

—পড়া করেছো? এই যে তুমি!

কুইলি শুধোয়—আমাকে বলছো?

দিদিমণি কঠিন ভাবে ওর দিকে চাইল! বলে সে—ম্যানার্স শেখনি? উত্তর দিতে গেলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়! ষ্ট্যাণ্ড আপ্—এত বয়স হয়েছে লেখাপড়া শিখতে পারো ম্যানার্স শিখবে না? বুনোই থেকে যাবে নাকি?

অপমানে লজ্জায় কুইলির দুচোখ জলে ভরে আসে। এ অরণ্যের শান্ত পরিবেশ থেকে এ এক হিংস্র নিষ্ঠুর জনারণ্যে সে হারিয়ে গেছে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে সেদিন আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে কুইলি। কি কঠিন আঘাতে তার সব স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে যায়। বাবার দেখা নেই, তখনও ফেরে নি। কি যেন নেশায় পেয়েছে সোনাইকে। দেখেছে কুইলি বাবা জিপ নিয়ে ফিরেছে সঙ্গে দুর্গারায়ান।

অন্ধকার ঘর 'থেকে স্তব্ধ কুইলি দেখছে ওই দৃশ্যটা, সোনাই মুণ্ডা

হাসছে—দুর্গার চোখেমুখে কি হাসির উচ্ছলতা। চলে গেল সে উপরের বাংলোয়। সোনাই ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালালো।

কুইলি সরে গেছে তার আগেই ভিতরের ঘরে। সেখান থেকে দেখছে সোনাই মুণ্ডা ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি নোট বের করে আলমারাতে পুরছে। টাকা—টাকার নেশাই যেন লোকটাকে পেয়ে বসেছে।

—কি রে!···

এতক্ষণে যেন কুইলির দিকে নজর দেবার অবকাশ হয় তার। —দুর্গা বলেছে ইস্কুলে ঠিক ঠিক পড়া লিখা করবি কুইলি! দুর্গা বলেছে তোকে বড় স্কুলে ভর্তি করে দিবেক। ইংরাজী পড়বি, লিখবি দিখুদের মতন!

কুইলি চুপ করে থাকে!

ইস্কুলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে। তার মন গুমরে ওঠে। বলে কুইলি—ইস্কুলে যাবো নাই? দিখু নাই বা হলাম!—

সেকিরে পাগলি? সব ঠিক হয়ে যাবেক। যা লিখা করগে।

কুইলিকে জোর করেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইসব সহ্যকরাবে লোকটা। ওর বাবা বদলে গেছে।

সোনাই মুণ্ডা হাতে এবার বড় চাবিটা পেয়ে গেছে। আর সেই পথ দেখিয়েছে দুর্গা রায়ানই। তাকে নিয়ে গেছে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক এ কাগজপত্র করতে হবে, টাকা তারা দেবে। ওদিকের বনে নোতুন খাদান দু একটা গড়ে উঠেছে, পাগলা হাতিটাকেও মেরেছে দত্ত সাহেব এবার পুরোদমে কাজ সুরু হচ্ছে. সোনাই মুণ্ডার কাজও সুরু হবে।

তার জন্যই দুর্গা রায়ানকে দরকার সোনাই মুণ্ডার। মেয়েটাকে সে আজ বিশ্বাস করে। ওর জন্যই—ওর বুদ্ধিতে আজ সোনাই মুণ্ডা লাইন ওনার হয়ে গেছে। এবার কোম্পানী হচ্ছে—সে আর দুর্গা দুজনে তার মালিক।

দুর্গার কথাগুলো মনে পড়ে। বয়সেরও একটা থমকানো সৌন্দর্য আছে। দুর্গার থমকে থাকা যৌবন সোনাই মুণ্ডার দেহে মনে এনেছে কি দুর্বার উন্মাদনা। দুর্গা বলে—

—আমার ওপর এত ভরসা কেন সোনাইজী!

ওর হাসি ওই চাহনি, দেহের ছন্দ সোনাইকে যেন মাতাল করে তোলে। সোনাই এর মনে হয় ওর নিটোল দেহটাকে জড়িয়ে ধরে ওর রহস্যঘন স্পর্শের মদিরতায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু এগোতে পারে নি। দুর্গার কথায় বলে—তোমার জন্যই আমার এতসব দুর্গা, মনে হয়েছে তোমাকে ছাড়া এত বড় কাজে নামতে পারবো নাই। তাই তোমাকে চাই। হেসে ওঠে দুর্গা—সে কি? এ্যা—আমাকে চাইছো নাকি গ!

সোনাই ওই মুখর মেয়েটির সামনে চুপকরে যায়। দুর্গা দেখছে ওকে। ওর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দুর্গা চিনেছে সোনাইকে। আজ সে-ও অনেক কিছু পেতে চায়। তবু সংযত ভাবে দুর্গা বলে—ঠিক আছে। কোম্পানীতে থাকছি—যখন বলছো।

—সত্যি! সোনাই কি আবেগভরে ওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে।

দুর্গা রায়ানও এবার নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। পাকেপাকে জড়িয়ে নিয়েছে সোনাইকে। সোনাইও স্বেচ্ছায় সেই জালে পা দিয়েছে!

এসেছে ব্যাঙ্ক এর নির্ভরতা। দুর্গা রায়ানও যেন ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে এ বাড়ির সব কর্তৃত্ব তুলে নিচ্ছে নিজের হাতে। কুইলি দেখেছে সেটা।

কুইলি হঠাৎ দুর্গাকে ফিরে আসতে দেখে চাইল।

সোনাই মুণ্ডা আর সে বসেছে খাতাপত্র নিয়ে। দুর্গা বলে কুইলিকে—এখানে কি করছো? যাও, পড়তে বসোগে! স্কুলে পড়াশুনো করোনা তাও শুনেছি। এসব সহ্য করবো না। পরক্ষণেই দুর্গা রায়ান কড়া স্বরে নির্দেশ দেয়—ইউ মাষ্ট বি এ ডিসেণ্ট গার্ল ভদ্র-সভ্য হতে হবে। বুনো হয়ে থাকবে না গো!

কুইলি বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ভেবেছিল পরে বাবা নিশ্চয়ই কিছু বলবে তার হয়ে, কিন্তু তা বলে না। সোনাই বলে,—তাই দেখছি। এখানে এসে যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছো! যাও। কুইলি সরে এলো, বুকচাপা কান্না আছে। এই বিলাস সবকিছু তার কাছে বিষিয়ে উঠেছে, মনে হয় মুরুংকে খুজে পেতেই হবে। এখানে সে থাকবে না। মুরুংকেই খুজবে সে, না পেলে ডুংরিতেই ফিরে যাবে। এখানের সবকিছু বিষিয়ে দিয়েছে বাবার ওই লোভ। টাকা-প্রতিষ্ঠা এমনকি দুর্গা রায়ানের উপর লোভটা কুইলির চোখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। স্কুলের মেয়েদের কথাগুলো মনে হয় নির্মম সত্য।

দিখুদের জগতে দেখেছে এই লোভের নগ্ন প্রকাশ। সহরের পথে ঘাটে, বড় রেস্তোরায়-দেখেছে মদের ছড়াছড়ি! মেয়েগুলোও তেমনি বেসরম। গায়ের কাপড়গুলো নেমেছে পেটের নীচে, মাংসল পিঠ পেট সবযেন পুরুষের সামনে মেলে ধরেছে ওরা নির্লজ্জ পশারীর মত। দুর্গা রায়ান এর উচ্ছল হাসির শব্দ কানে আসে।

পরদিন স্কুলে যাবার নাম করে বের হয়েছে কুইলি। স্কুলে ঢোকার ইচ্ছেও নেই, সোজা এগিয়ে চলে হাটের দিকে, ওদিকে স্টেশন লোকজনের ভিড়। রাস্তার দুপাশে দোকান পশার, লোকজন চলাফেরা করছে। কুইলির দুচোখ খুঁজছে মুরুংকে। কতোদিন দেখেনি— তখন দেখেছিল বনের একটি মরদকে, এখন সে নাকি পড়ালিখা শিখে বদলে গেছে, দিখুদের ওখানে কাজ করে।

হঠাৎ কাকে দেখে দাঁড়ালো—চমকে ওঠে কুইলি। মুরুং এর মত দেখতেই, ছেলেটা চাইল তার দিকে। কুইলি সরে গেল!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, এ খোঁজার যেন শেষ নেই।

ব্যর্থ ক্লান্ত হয়ে ফিরছে কুইলি। খেয়াল হয় তখন বৈকাল হয়ে গেছে। পায়ে, পায়ে কোথায় অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল সে।

দুর্গা সোনাই ফিরেছে। তখনও কুইলি আসেনি। স্কুলে খবর নিতে গেছে—স্কুলেও যায়নি। ভাবনায় পড়ে সোনাই।

—কোথায় গেল সে?

দুর্গা রায়ান এই বয়সের মেয়েদের চেনে। দেখেছে এখানে সে অনেক কিছু। দুর্গা বলে কোন ছোঁড়ার পাল্লাতে পড়েছে বোধহয়! ওকে শাসন করো সোনাই নাহলে ওর এবার ডানাপালক গজিয়েছে; ঘরে থাকবে না আর।

গর্জে ওঠে সোনাই—দেখছি এবার! তেমন দেখলে দূর করে দিব! দুর্গা রায়ানও এসেছে অনেকখানি। ধীরে ধীরে সে এখানে নিজের সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে চায়। ওই মেয়েটা যেন সেই পথের কাঁটা হয়ে রয়েছে। সেটাকে দূর করতে পারলে সোনাইকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারবে সে। সোনাই এর কথায় অখুশী হয়নি দুর্গা। মনে মনে এমনি একটা কিছুই চেয়েছিল সে।

তবু মুখে বলে দুর্গা—এসব করতে যেও না। বুঝিয়ে বলো তাকে।

সোনাই গর্জায়—এতবড় সাহস তার! আমি ভাবছি নিজের ভাবনা। ওদিকে ভূধর পাঠকজী একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছে। লিগিরদার ওখানে কিসব গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে ডুংরির লোকজন।

দুর্গাও শুনেছে কথাটা আজ বৈকালেই। ভূধর পাঠকের সঙ্গে ওর ব্যবসাটা এখন জোর জমে উঠেছে। ভূধর পাঠক দূর দূরান্তর থেকে বিদেশী স্কচের বোতল যোগাড় করিয়ে আনছে রাশি রাশি। বিশেষ কায়দায় ওই বনের মধ্যে বিদেশী মদের বোতলে দিশী চোলাই মদ পুরে একনম্বর স্কচ হিসেবেই জামসেদপুর—রাঁচি মায় কলকাতার বাজারে চালান দিয়ে যেন টাকার ট্যাঁকশাল খুলে ফেলেছে। সোনাইও বেশ কিছু টাকা পাচ্ছে।

সেখানের গোলমালের খবর শুনে তাই মাথা গরম হয়ে গেছে সোনাই এর। দুর্গা রায়ানও বলে—

—তোমাদের লোকরাই বেইমান। তোমার খাচ্ছে, তোমারই সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে।

সোনাই বলে—এবার গিয়ে ওদের দু'একটাকে ঠাণ্ডা করে দেব।

ওই বেইমান কানাইটা সর্দার হয়েছে। ওটাকে দরকার হলে খতম করে দিতে বলেছি। খতম করে জঙ্গলে ফেলে আসবে, বাঘ নেকড়ে, শিয়ালে ছিঁড়ে খাবে ওটাকে! সব বেইমানি ঘুচিয়ে দেব।

দুর্গা রায়ান বলে, সামনে এতবড় কাজ। হুসিয়ার হয়ে কাজ করো মাথা ঠাণ্ডা রেখে সোনাই।...

সোনাই দেখছে দুর্গাকে। দুর্গা গ্লাসটা এগিয়ে দেয়।

—নাও! একটু খেয়ে নাও।

বিলাতি মদটা সোনাইকে যেন শান্ত করে না আর কি এক নোতুন নেশায় মেতে ওঠে। সে যেন নিঃসঙ্গ একা, এ দুনিয়ায সবাই তার সঙ্গে বেইমানি করেছে। আপনজন শুধু ওই দুর্গাই।

কি রহস্যময়ীর মত চেয়ে থাকে দুর্গা। দেখছে নেশার আবেশভরা ওই মাতালকরা চাহনি।

—দুর্গা!

সোনাই এর বন্য রক্তে নেশা লেগেছে। বনে বনে যেন ঝড় উঠেছে। মাতালকরা সব বাঁধন-ছেঁড়া ঝড়। দুহাতে দুর্গাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয়। ওর উদ্দাম স্পর্শ দুর্গার সারা দেহে মনে আগুন ধরেছে। দুজনে যেন আদিম অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

ক্লান্ত কুইলি হতাশ হয়ে ঘরে ফিরেছে শূন্য মনে। সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। মুকুং এইজনারণ্যে হারিয়ে গেছে। ভুলে গেছে তাকে।

হঠাৎ সামনে সাপ দেখার মত চমকে ওঠে। একটা সাপ নয়, সারান্দার অরণ্য গহণে বোরার ধারের জঙ্গলে দেখেছিল কুইলি—দুটো বিরাট মরাল সাপ শঙ্খ লেগেছিল। বাতাসে ওঠে ফোস ফোসানির শব্দ—কি লালসার মত গর্জন! এ যেন তেমনি আদিম দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছে সে।

—বাপ!

পিছিয়ে এসেছে মেয়েটা। চমকে উঠল সোনাই—দুর্গা নিজেকে মুক্ত করে বেআব্রু দেহটাকে নিয়ে অন্ধকারে সরে গেছে। মদোমত্ত

সোনাই এর রাগটা এবার সপ্তমে ওঠে। লাফ দিয়ে এসে মেয়েকে দেখে গর্জে ওঠে।

—কোথায় ছিলি সারা দিন? কোন নাগরের সাথে ঢ্যামনামি করতে গেইছিলি?

কুইলির এতক্ষণ যেন সাড়া ছিল না। তার কাছে লষ্টা দুর্গা রায়ান —আর ওই ঘৃণ্য পুরুষটার ক্লেদাক্ত রূপটা কদর্য হয়ে ফুটে উঠেছে। এই নোংরামির মধ্যে সে থাকতে চায় না।

গর্জে ওঠে সোনাই—বল! কুথাকে ছিলি লষ্টা বেসরম ছুড়ি। শহরে এসে লষ্টাই রোগ ধরেছে তুর! শ্যাস করে দিব—লষ্টা কোথাকার।

সজোরে একটা চড় মেরেছে সোনাই কুইলির গালে। কুইলি এত বড় হয়েছে, কোনদিনই বাবার কাছে এভাবে অপমানিত হয়নি। সব স্নেহ-প্রীতি মুছে গেছে ওই লোকটার মন থেকে সে আজ অর্থ-পিশাচ -প্রতিষ্ঠালোভী লালসাভরা একটা জানোয়ারে পরিণত হয়েছে, পাশে দাঁড়িয়েছে এসে দুর্গা রায়ান। কুইলির বন্য আদিম রক্তে তুফান ওঠে। চোট-খাওয়া বাঘিনীর মত রুখে দাঁড়িয়ে কুইলি বলে—

—আমি লষ্টা লই—বোঙা জানে। ধরম জানে। লষ্টা ওই দুগ্‌গা —আর তুমি? পাপ করো নাই? সরম লাগে না বাপ হয়ে সোমত্ত বিটির ছামুতে লষ্টামি করতে? এমন দিখ্‌ আমি হতে চাই না —তুই হ!

সোনাই লাফিয়ে পড়ে মেয়েটার উপর। কিল চড় লাথি মেরে ছিটকে ফেলেছে কুইলিকে! গর্জায় সে—

—এতবড় মুখ তোর! শ্যাস করি দিব!

দুর্গা এতক্ষণ ব্যাপারটা দেখছিল। কুইলির এমনি একটা যোগ্য শাস্তি হতে দেখে খুশীই হয়েছে সে। এবার সোনাইকে থামাতে আসে।

—সোনাই! প্লিজ—থামো। থামো! সোনাইকে দুহাতে সরিয়ে নিল। তখনও গজরাচ্ছে সোনাই।

মেজেতে ছিটকে পড়ে কুইলির কপালটা কেটে গেছে, শাড়িতে, মুখে রক্তের দাগ। মেয়েটা কাঁদে না—গুম হয়ে উঠে সরে গেল। তার চোখের সামনে এই পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে।

এতক্ষণ চুপ করেছিল—দূর আকাশে তারাগুলো জ্বলছে। ওদিকে পাহাড়ের ওপরে শান্ত সারান্দার বনরাজ্য, সব হারিয়ে গেছে তার। মুরুংকেও আর পায়নি; বাবা—তার সংসারের ছবিটাও কালো অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দুচোখ ছেয়ে জল নামে। একাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কুইলি, সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই। কি দুঃসহ গ্লানিতে তার সব কিছু ভাবনা তলিয়ে গেছে। কাউকে আর সে বিশ্বাস করে না। মুরুংও তার কেউ নয়। নাহলে মুরুংও তার খোঁজ করতো—নিশ্চয়ই আসতো তার কাছে। দিখুদের জাতের নোংরামির মাঝে সব হারিয়ে গেছে।

কুইলি মিথ্যাই এতদিন তার পথ চেয়েছিল, তার ভালোবাসাকে অপমান করেছে মুরুং—তাকে ঠকিয়েছে। তাকে ঠকিয়েছে তার বাবা। অপমান করেছে দুর্গা রায়ান—এদের সবাই। কি কঠিন একটি শপথে যেন ঋজু হয়ে দাঁড়ালো মেয়েটা আজ সব কিছুকেই সে তুচ্ছ করে নিজের পথেই চলবে।

রাত হয়ে গেছে।

সোনাই এর সারা মনে নিবিড় একটা উত্তেজনা, রাগ এর ভাব ফুটে উঠেছে। আজ নিজের চেষ্টায়, সে একটা বিরাট ঠাঁই করে নিতে চলেছে, তার জীবনে এসেছে উন্নতির পথটা। আর তখুনই যেন ওই কুইলি,আর বনের সেই মানুষগুলো মেতে উঠেছে তার সর্বনাশ করতে।

বাইরে জিপটা এসে থামলো। নেমে আসে ভূধর পাঠক, জিপে আরও তার অনুচর বসে আছে। ভূধর পাঠকের অন্ধকারের কারবারের কর্মী তারা।

পাঠকজীকে দেখে বের হয়ে আসে সোনাই।

এ সময় কি ব্যাপার পাঠকজী?

ভূধর পাঠক শুনেছে খবরটা। বনের ভিতরে তার কারবারে এখন হাজার হাজার টাকার মাল জমে আছে। ওদিকে গোলমাল যদি শুরু হয় তার আগেই সে সব মালপত্র সরিয়ে আনতে হবে, তাই আজ রাত গভীরে কয়েকখানা ট্রাক পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাও চলেছে। দরকার হলে মোকাবিলাই করবে ওদের।

সোনাই সব শুনে চাপা স্বরে গর্জে ওঠে—এতবড় সাহস ওদের?

পাঠকজী শোনায়—ওই কানাই মুণ্ডা আর ভি কুছ আদমী মিলকর ইসব নকরা বানাচ্ছে সোনাইজী।

সোনাই আজ একটা হেস্ত নেস্ত করতে চায়। তাই বলে সে —চলো পাঠকজী, আমিও যাচ্ছি।

ওরা বের হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে ওই বনের দিকে। ঘুম আসেনি কুইলির। আজ তার সারা মনে কি দুঃসহ জ্বালা। বাবাকে ওই ডাকাতদলের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যেতে দেখল মাত্র। লোকটা যেন আজ সব হারিয়ে শুধু টাকা আর নোতুন এক নেশায় মেতে উঠেছে। কুইলির চোখে ওই মানুষগুলোর বিচিত্র রূপ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হয় আজ তার এখানে আর ঠাঁই নেই, নিঃস্ব রিক্ত একটি মেয়ে ওই অরণ্য থেকে এসেছিল সেখানেই হারিয়ে যাবে।

গোলমালটার সূত্রপাত হয়েছিল হাটবারের সেই সকাল থেকেই। বনের অনেক মানুষ এখন নানাভাবে দিখুদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ওদেল বাঁও—কুদলিবাদ—কুমচি—ছোটনাগরা, থলকোবাদ অঞ্চলে কাঠ মহাজনদের আনাগোনা। ওদের ক্যাম্পএ কায করে অনেকে। ট্রাকে করে কাঠ যাতায়াত করে—তারাও সহরে যায়। সহরের স্বপ্ন তাদের মনকে হাতছানি দিয়েছে আর শিখেছে অনেক কিছু পেতে।

তাই সেদিন মদের দানছত্রে ওদের মন ভিজিয়ে দিতে পেরেছিল সোনাই মুণ্ডা। বোঙার যানের পবিত্রতার কথা ভুলে গেছে তারা। ওনিয়ে মাথা ঘামায় নি। ওই বিষ তাদের দরকার। সোনাই মুণ্ডার কারখানা থেকে বনের মানুষ ফি হাটে সস্তাদরে মদ পায়। সোনাই—ভূধর

পাঠক এমনি করেই জারকরসে ওই অরণ্যচারী আদিবাসীদের নীতি বিবেককেও নেশায় ডুবিয়ে কিনে রেখেছে।

কিন্তু কিছু মানুষকে সে কিনতে পারেনি। তাই বোরাই সর্দার আজ মরতে বসেও প্রতিবাদ জানায়, রুখে ওঠে কানাই মুণ্ডা রতন মুণ্ডা—কুনডির কিছু তরুণ মুণ্ডারা প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে।

কানাই মুণ্ডা বলে—গিরা পাঠাই দিব!

রতন মুণ্ডা লেখাপড়া জানে। সে বনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরেছে। দেখেছে ওই দিখুদের লম্বা হাতকে কেমন করে এদের বিবেক সংস্কারকে পিষে মেরেছে।

অতীতে ওদের সমাজে সেদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেবার বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে। সারা বনের গহনে ছড়ানো বসতিতে গিরা পাঠান হয়েছে, গিরা ওদের সমাজের পবিত্র নির্দেশ। একটা শাল ডাল ভেঙ্গে তার বাকল তুলে সেটাকে দিয়ে গিঁঠবেঁধে পাঠানো হয় এক বসতিতে সেখানের সর্দারের কাছে। তারা অবহিত হয় গোপন পবিত্র সেই নির্দেশের, আবার তারা সেই গিরাবাঁধা ডালটিকে পাঠিয়ে দেয় অন্য বসতিতে। এইভাবে গোপনে সর্বত্র ঘুরে পৌঁছে যায় বনে বনে। আদিম মানুষ গুলো আহ্বানের জন্য তৈরী হয়। তারপর আসে নির্দেশ। ধামসার গুরু গুরু শব্দ ওঠে বনকন্দরে, রাতের অন্ধকারে সেই গুরু গুরু শব্দ শুনে প্রতিবসতে তার প্রতিধ্বনি তোলো। সমবেত জনতা বের হয়ে আসে বনকন্দর থেকে সেই নির্দেশ শুনে।

...সে ছিল অতীতের কথা। সেদিন আদিবাসী সমাজের মধ্যে নিবিড় বন্ধন ছিল, ছিল নীতি সংস্কার চেতনা। সাগোয়ানা রোগাই এর সময়ও তারা প্রতিবাদ করেছিল দিকে দিকে—হাটে হাটে এই ভাবে। ধ্বনি তুলেছিল—শাল আদিবাসীর, সাগোয়ান দিখু, সাগোয়ান রোগাই বন্ধ করো।

শাল বন কাটা চলবে না, শালগাছ তাদের আপনজন, পারদেশী সেগুন রোগাই বন্ধ করো।

সে আন্দোলনও মুছে গেছে।

রতন মুণ্ডা বলে—গিরে পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না সর্দার! আজ ওরা সাড়া দেবে না।

বোরাই সর্দারও জানে। বুড়ো বলে

—হু! উরো মরে গেছে, তবে কেনে তুরা ইসব করছিস? সোনাই মুণ্ডা—ভূধর পাঠকরা তুদের শ্যাষ করে দিবেক। সবাই মেনে লিছে—তুরা চুপযা।

তবু যেন উদ্ধত যৌবন এই পরাজয়কে মেনে নিতে পারে না। রতন মুণ্ডা বলে—বনের মানুষগুলোকে বিষ খাইবেক? উ মদ লয় আদিবাসীরা হাড়িয়া খায়-মহুয়া খায়, সাতো লয়, ই বিষ! ই খেয়ে কতো মরিছে জানো?

বোঙার যানে বসি-বীরসা মহারাজের থানে বসি ইসব করতে দিব নাই! দরকার হয় আমরাই ইয়ার বিহিত করবো!

গোপনে গোপনে এখনও বনের অতলে একা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। সেদিন একটা ট্রাক বোঝাই মদ চালান যাচ্ছে, ওরা রাতের অন্ধকারে বনথেকে বের হয়ে এসে ড্রাইভারকে নামিয়ে ট্রাকটা মদসমেত খাদে ফেলে দিয়েছিল, ছিটিয়ে পড়ে সেই মদ-মাটি ভিজে গেছে। নষ্ট করেছে কয়েক হাজার টাকার মাল। অবশ্য প্রাণের দায়ে ড্রাই-ভার বলে গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করেছিল।

কিন্তু খবরটা চাপা থাকে নি।

সোনাই এসেছে ওর সমন্ধে খোঁজ খবর নিতে। সে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করে। মুনিমজী-টুয়াইও বুঝেছে ব্যাপারটা। কিন্তু তারাও এবার যেন বিব্রত বোধকরে। সোনাই মুণ্ডা এখন বেশীর ভাগ সময় সহরে থাকে ডুংরিতে আসে-যায় মাত্র।

মুনিমজী বলে কুছ গড়বড় হোগা মালিক। কানাই কা সাথ দোচার লেড়কা ভি আসে উধার। হাটমে কিছু মিটিন ভি করেছে।

সোনাই ভাবছে কথাটা। বলে সে—

—যারা কাজ করছে ওখানে তারা কি ওদের দলে? মুনিমজী

চুপ করে থাকে। টুয়াই বলে—সব শালাই বেইমান মালিক। আমি ওদের দু চারটেকে এবার ঠাণ্ডা করে দেব!

সোনাই ঘাটাতে চায় না ওদের। বলে—রোজ বরং কিছু বাড়িয়ে দে টুয়াই!

রাত নামে।

সোয়ীও এসেছে যথারীতি। সোনাই এর মনে এখন বিরাট ব্যবসার কল্পনা, এদিকের কারবারেও গোলমাল ঘনিয়ে আসছে। তবু তার কাছে একটি মুখ যেন ধ্রুবতারার মত কি আশা আনে। সব কামনা স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে একটি মেয়ে—সে দুর্গা রায়ান। পুলিশের কর্তাদেরও অনেকেই নাকি তার জানা শোনা। এবার তাদের দিয়েই কানাই রতন মুণ্ডা শিবু হোদের ধরিয়ে নিয়ে যাবে যাতে এইখানে আর কোন প্রতিবাদ না গড়ে ওঠে।

সোয়ীর সেই দাপট কমে গেছে। রোজগারও তেমন নাই। মুনিমজী লোকটা হাড় কেপ্পণ। কাঠবিড়ালির মত দেহটাকেই শুধু ঠুকরে উত্যক্ত করে তোলে, পয়সা কড়ি দিতে চায় না। ফলে সোয়ীকেও এবার দিনমজুরি করতে হচ্ছে।

তোবি বুড়ি এবার কথা শোনায়।

—পরের সোনা দিস্‌নে কানে
কেড়ে লিবেক হ্যাচকা টানে॥

কিলা লবাবী তুর ঘুচে গেল? তাই বলে পাপের ফল পাবি না—হয়েছে কি তুর?

সোয়ী চুপকরে থাকে। মনে হয় সোনাই তাকেও ভুলে গেছে। আসে অল্প সময়ের জন্য কথা বলারও ফুরসৎ থাকে না।

সোয়ীর মনে হয় সোনাই তাকে এড়িয়ে চলেছে।

কি রাগে জ্বলে উঠেছে মেয়েটা।

আজ তাই এসেছে সোয়ী সোনাই এর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় দেখা করতে।

মুনিমজী কাজ শেষ করে বের হয়ে আসছে কাঁঠাল গাছের নীচে ছায়া অন্ধকার ঠাঁই এ সোয়ীকে রঙ্গিনীর বেশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে সে।

মুনিমজী বলে—এসেছিস ! চল—ঘরে চল্ ! কতোদিন আসিসনি ! মুনিমজী ওর হাতটা ধরতে ফুঁসে ওঠে সোয়ী।

—হাত ছাড়ো গ ! খুব মরদ তুমি ? ট্যাকা দিবার বেলায় নাই সুহাগ কাড়তে এসেছো ? হট্ ! আমার কাম আছে। একধাক্কায় হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সোয়ী।

মুনিমজী বুকে নিয়ে বলে—মালিকের কাছে যাবি বুঝি ? যা—

সোয়ী গজরায়—তুমি আবার মানুষ নাকি !

এগিয়ে যায় সোয়ী !

সোনাই ঘরের মধ্যে টুয়াইকে কি গোপন নির্দেশ দিয়ে চলেছে। ওই লিগিরদার কড়া পাহারায় রাখতে হবে। মালপত্র সাবধানে রাখা দরকার। আর তাক্ বুঝে কানাই এর উপর চরম ঘা মারার কথাই ভাবছে সে।

হঠাৎ সোয়ীকে ঢুকতে দেখে চাইল সোনাই।

টুয়াই জানে মালিকের রাতের এই চিত্ত বিনোদনের কথা। তাই ঘাড় নেড়ে টুয়াই বের হয়ে যেতে সোনাই চাইল মেয়েটার দিকে। ওর মুখচোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে মেয়েটার সাহস দেখে।

সোয়ী এগিয়ে এসে আগেকার মতই সোহাগভরে সোনাই এর পাশে বসে দুহাত দিয়ে ওর দেহটাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করতে যায়।

সোনাই এর কাছে সোয়ীর আজ আর কোন আকর্ষণ নেই। ওর গায়ে মাটির গন্ধ, চোখেমুখে সেই নেশা আর নেই, ফুটে ওঠে সেখানে বিকৃত কামনার সাড়া।

সোনাই বলে এখন কাম আছে। তুই যা সোয়ী ! কি ভেবে সোনাই পকেট থেকে দশটাকার নোট ছুড়ে দিয়ে বলে—নিয়ে যা নেশা করবি।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সোয়ী। সোয়ী আজ অনেক আশা নিয়েই এসেছিল। সোয়ী বলে—ইখান থেকে চলে গেলা আমাকেও লিয়ে চল সোনাই উখানে। কাজ কাম করে দিব। তুমার কাছে থাকবো—

চমকে ওঠে সোনাই ওর কথা শুনে। মেয়েটা যেন তাকে গ্রাস করতে চায়। সেখানে সহরে ওকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দুর্গা রায়ানকে নিয়ে সেখানে রাজ্য গড়বে সে, আজ সোয়ীর কোন ঠাঁই নেই।

সোনাই বলে—ইখানে কাজ কাম করে খা। সিখানে কেনে যাবি?

সোনাই বিজ্ঞের মত পরামর্শ দেয়।

—ঘর—স্বোয়ামী ছেড়ে কুথাকে যাবি? ডুংরির লুক কি বলবেক!

সোয়ী বুঝেছে আজ তার কোন দামই নেই সোনাই-এর কাছে। কানেও শুনেছে সে সেখানে দিখুদের মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলির কথা।

তবু স্বপ্ন দেখেছিল সোয়ী!

আজ সেই স্বপ্ন—বিশ্বাস সবকিছু তার হারিয়ে গেছে। লোকটা এতদিন তাকে ঠকিয়ে তার দেহটাকে লুটেছে। আজ এঁটো পাতার মত ফেলে দিয়েছে। রাগে জ্বলে ওঠে সোয়ী।

তবু বলে সে—তোর জন্যে ঘর স্বোয়ামীও ছেড়েছিলাম সোনাই আজ ইখানে ঠাঁই নাই, জ্বলে মরছি। তু লিয়ে চল!

সোনাই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

আরও ক'খানা নোট ছুঁড়ে দিয়েছে সোয়ীর দিকে। বলে ওঠে সোনাই—ওই লিয়ে যা এখান থেকে। এখানে আর আসিস না।

তর কাযের জন্য মুনিমজীকে বলে দিব। যা—

চোট খাওয়া সাপের মত এবার ফুঁসে ওঠে সোয়ী!

—অনেক ট্যাকা হয়েছে তুর না? তাই ইজ্জত—ধরম সব কিনে লিবি? ভুল করেছিলম রে—চিনতে পেরেছি তুকে। আজ চিনেছি—তু একটা জানোয়ার—দানো। সব কেড়ে লিয়ে একাই বাঁচতে চাস!

—এমন ট্যাকায় তোর থুক্ দিই!

মেয়েটা রাগে জ্বলে বের হয়ে গেল, টাকাগুলোও তুলে নিল না। ও যেন চোট খাওয়া বাঘিনীর মত চলেছে রাতের অন্ধকারে।

হঠাৎ ছায়ানামা পথের ধারে মুনিমজীকে দেখে চাইল সোয়ী। লোভী লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটার জন্যে। মুনিমজীও শুনেছে ওদের কথাগুলো। তাই যেন বুড়ো আজ নতুন করে আশার আলো দেখেছে।

বলে ওঠে মুনিমজী—শোন্ সোয়ী এত গোস্‌সা করছিস কেন? হামিতো রয়েছি! আয়—

ওর আদুড় গায়ে হাত দিয়ে একটু আদর করতে যায়। অসহ্য রাগে জ্বলে ওঠে সোয়ী। সে এবার সাপটে লোকটার তোবড়ানো গালেই একটা চড় ক'সে গর্জায়—তুরা সব ক'টাই কুত্তা-বানর শিয়াল! তুদের মুয়ে আমি থুক দিই!

অন্ধকারে থুতু ছিটিয়েছে মেয়েটা। সরে যায় মুনিমজী। তখনও চড়ের ঘায়ে জ্বলছে গালটা, সোয়ী চলে গেল বনের পথে। মুনিমজীও অবাক হয়েছে ওর ব্যবহারে।

মেয়েটা যেন ক্ষেপে উঠেছে এবার।

সোনাই-এর সঙ্গে আর দেখাও করেনি সোয়ী।

মনে মনে সে আজ ওই সোনাই মুণ্ডার সর্বনাশই চায়। তবু সাপিনীর মত রাগটা চেপে থেকে কায করছে শুধুমাত্র যেন সোনাইকে চরম আঘাত করার জন্য। মুনিমজী অবশ্য ঠিক চটেনি ওর ওপর। লোকটা এখনও সোয়ীর আশা ছাড়েনি। তবে দাগা পেয়েছে তাই মনমেজাজ ভালো ছিল না।

পরদিন মুনিমজীই সোয়ীকে বলে—ইখানে নয়, লিগিরদার ওই কারখানাতেই কাম করবি তুই। মাইনেও দিব পাঁচট্যাকা রোজ।

সোয়ী ওই দুর্গে ঢোকার জন্যই যেন কাযটা নেয়! কায তেমন কিছু নয়। বাতাসে বস্তাবন্দী শুক্‌নো মহুয়া ঝাড়াই করে রোদে দেয়, গম কোটে, আর দেখেছে বড় বড় চৌবাচ্চায় তাজা মদ জমে, সেগুলো বোতল বন্দী করে—না হয় বড় বড় ড্রামে পুরে চালান যায় ট্রাকবন্দী হয়ে। সোয়ী মুখ বুজে দেখে যায় সবকিছু।

পাঠকজীর ভাতিজা এখানেই থাকে। বিড়ালের ল্যাজের মত

কজোড়া গোঁফ, গোলমুখখানা—লোভী লোকটা এবার এগিয়ে াসছে তার দিকেই।

সোয়ী জানে পুরুষগুলোর ওই স্বভাব। বার্ বার্ ঠকেছে সে। াই যেন সোনাই, এই নবীন পাঠক—সবাইকে আজকে ঘৃণা করে। বীন বলে—একরোজ আও সোয়ী রাতমে!

রাগটা চেপে সোয়ী বলে—যাবো গো পাঠকজী, যা পাতটাঙ্গির ত গোঁফ তোমার, সুড়সুড়ি লাগবে গ!

হাসে নবীন পাঠক, আরে কি বলছো তুমি! গোঁফ তো মর্দানার াবুত!

—কি আমার মরদ গো? দিখা যাবেক! স্বৈরিনী মেয়েটা আজ যেন ওই লোকটাকেও নাচাতে চায়।

…রতনদের প্রতিবাদের খবরটা চাপা থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছে নেকের কানেই। সোয়ীও শুনেছে সেটা।

বোরাই সর্দার-এর ঝুপড়িতে রাত নেমেছে। তারাজ্বলা রাত্রি। নরাও তৈরী। সোনাই মুণ্ডার সেই মদের ট্রাক উল্‌টে দেবার পরাধে থানা পুলিশও হয়েছে। ডুংরীতে পুলিশের জিপ এসে ঘিরে ফলে চারিদিক।

বোরাই সর্দার, তোকি বুড়ি, অনেকেই অবাক হয়।

সোয়ীও এসে পড়ে। সেবার এমনি ভাবে পুলিশ এসে ঘিরে লেছিল ডুংরীর চারিদিক। একজনকে তুলে নিয়ে গেছল, ডুংরীর াতাজা ছেলেটা সেই মুরুং আর ফেরেনি, সোনাই তাকেও সরিয়ে য়েছিল এখান থেকে।

আজ আবার পুলিশ এনেছে সোনাই। লোকগুলো চুপ করে কে। বোরাই সর্দার এর দিকে চাইল পুলিশ অফিসার—কানাই গ্গা কোথায়? রতন, শিবু্ তো এদিকে এসেছে, তারা কোথায়?

বোরাই সর্দার দেখছে ওই দিখুদের। তার ভাইপোকেও ওরা ায়ে গেছে। আজ এসেছে আবার।

ডুংরির সোজা সাহসী মরদকে ওরা রাখবে না এখানে, ি
গিয়ে গারদে পুরবে।

পুলিশ অফিসার ধমকে ওঠে।—জবাব দে ?

বোরাই সর্দারের চাপাপড়া জ্বালাটা যেন ঠেলে ওঠে। সে জান

—জানি নাই ক ! কে কুথাকে যায় আসে, বুড়া হইছি—ক্যা
জানবো ?

গজগজ করে ওরা,—বুড়ো ভাম তুমি ! সব নষ্টের মূল। ও
সারা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করবোই। তারপর তোমাে
ছাড়বো না।

গর্জে ওঠে বোরাই সর্দার ! চুলগুলো মুখে ঝামরে পড়ে
নুয়ে পড়া দেহটা সিধে হয়ে যায়, দুচোখ জ্বলছে ভাঁটার মত ! গ
ওঠে বোরাই সর্দার—লিয়ে চল, কুথাকে লিই যাবি। মেরে ফাল
তুদের জ্বালা থেকে লিশ্চিন্দি হই। মার—বাঁচাই রাখছিস কে
ইখনও। সব তো লিছিস তুরা—জানটাও লে ইবার !

ওই প্রদীপ্ত মূর্তির সামনে পুলিশ অফিসারও একটু ঘাবড়ে যা
ওই মানুষটার চীৎকারে যেন আদিম অরণ্যের প্রতিবাদ ফুটে ও
তাকে অস্বীকার করতে পারে না এরা।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে জনতা। বোরাই সর্দারের এই রূপ ত
অনেকদিন দেখেনি। অন্য পুলিশ অফিসার বলেন, চলে এসো, ও
ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ওদিকের বসতিতে খোঁজ করা যাক কো
গেল তারা।

পুলিশ বাহিনীও জানে, এই বনের মধ্যে ওদের ধরা যাবে ন
তবু একবার হাঁকডাক করে বিভিন্ন জনবসতে হানা দিয়ে ওদের জানি
যায়, যে ফের কিছু হলে এবার যোয়ান মরদদেরই ধরে নি
যাবে।

গুমরে ওঠে প্রতিবাদের আগুন !

বোরাই সর্দার বলে, ইবার ই বন শ্যাষ হই যাবেক। বসুম
চৌফাট হই যাবে, সোরার জল বিষিয়ে যাবেক। দিখুরা করমপা

াকে শ্যাষ করছে। বোঙা পাহাড়কে ইরা বিষাইছে—ঘর ঘর থেকে ায়ান মরদেরে ধরি লিই যাবেক!

কথাটা মিথ্যা নয়।

এমন সময় এখানে নামে বৃষ্টির ধারাস্নান। শীত চলে গিয়ে বসন্ত সেছে, ঝরাপাতার স্তূপে ভরে উঠেছে বনতল, গাছগুলো এখনও পত্র ন বিবর্ণ। সেগুন বনের পাতা আসতে সময় নেই, তাই বনের বাহার ই, জেগে উঠছে লতাপলাশ—গোল গোলি ফুলের আগুন।

এমন সময় এবার বৃষ্টি নামে, মকাই-এর ধারায় ভরে ওঠে নগুলো, শ্যামল হয়ে ওঠে মাটি। এখনও বৃষ্টি নাই?

কালো মেঘের দল সাতশো। পাহাড়ের দেশ সারান্দার বনে আসার যেন হারিয়ে ফেলেছে। বাঘ-এর ডাক ওঠে রাতের অন্ধকারে। লর সঞ্চয় কমে গেছে—হাতিগুলোর খাবার সবুজ পাতা আসেনি ,, ওরাও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে ফেরে বনবাসী মানুষের মতই। রির মানুষগুলোর চোখে ফুটে ওঠে উপবাস—অনাহারের ভয়। কি : অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। তারপর হানা দিয়েছে ওই পুলিশ ইনী!

বোঙার থানে রাতের অন্ধকারে এসেছে রতন-কানাই-শিবুর দল। । সোনাই-এর এই অত্যাচারের জবাব দেবেই। পুলিশের জুলুমের াবও দেবে তারা।

সোয়ীও এতদিন পরে যেন সুযোগ পেয়েছে।

সেই-ই বলে—কারখানাটা ভাঙ্গি দে! তছনছ করি দে। দিখ্- ানকে কুদাই দে ইখান থেকে! তবে তো মরদ!

রতন দেখছে ওকে।

কানাইও ভেবেছে কথাটা। কিন্তু বলে সে—ওই নবীন পাঠকের ছে বন্দুক রইছে। যদি গুলাই দেয়। সিটাকে আগে বাগাতে হবেক! ায়ী কি ভাবছে! এতদিন সে অনেক বদনামই কুড়িয়েছে। এবার ন সত্যিকার করার কিছু কায সে পেয়েছে। তার জীবনের দাম কি? য়েটা আজ রুখে ওঠে। বলে সে,—

—সি আমি পারবো ; তুরা আর সব পারবি ওদিকে ? স্থা
চাতালের পথ তো চিনিস তুরা ? নীচের চাতালে মদের ইয়
চৌবাচ্চা—কতো ডেরাম ভর্তি মদ। দে সব লিগিরদার জলায় ফেলে
জড়াই দে মরদ উ গুলনে !

রতন মুণ্ডার তাজা রক্তে বান ডাকে। কানাইও ভাবছে কথাটা।

সোয়ী বলে—আজ রেতেই চল ! আমি বাতি জ্বালি নিশান
দিব, ঝাঁপাই পড়বি তুরো।

...কথাটা মনে ধরে। অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। ভোরের দিকে
ওদের চোখে ঘুম নামবে। সেই সময়ই চরম আঘাত হানবে তারা।
বোরাই সর্দার তবু বলে, বড় বেপদের কাজরে।

রতন বলে, বিপদ তো চারিদিকে ঘনিয়ে আসছে সর্দার। দিকুরা
ঘুইছে, ধরলে জেলে পুরবেক। একবার জবাব দিব নাই ? ইবার
বাঁচা মরার দিন এসেছে। আর কত সইবো ! সবতো যেতে বসেছে
না হয় জানটাই যাবেক। তবু জানাই যাবো !

বোরাই সর্দার বিড় বিড় করে। বোঙার দয়া যেন পায় ওরা।
এ বনের সবকিছু যেতে বসেছে, তবু ওরা বাঁচার লড়াইএ যেতে
চায়। বোরাই সর্দার জানেনা কি হবে। তবু তার সারা মনে নামে
ভয়ের কালোছায়া।

রাতের অন্ধকারে ওরা এগিয়ে যায়।

নবীন পাঠক আজ খুশি হয় সোয়াকে দেখে। শুধোয় সে
—ডুংরির ওখানে কি সলা হচ্ছিল রে শুনলাম ?

নবীন পাঠকের লোকজন কিছু ছড়ানো আছে। তারা সব খবর
অবশ্য পায়নি। তবু দেখেছিল ওই রতনদের। নবীন সে খবরটা
শুনে বৈকালেই জিপ দিয়ে লোক পাঠিয়েছে চাচাজীর কছে। রতনদের
নাকি পাশের ডুংরিতে দেখা গেছে। চাচাজী সবসময়ে পুলিশের
সাহায্য নেয় না। তার নিজের নিজের বিশেষ দলবল আছে। খবর
পেয়ে হয়তো তাদের নিয়েই রাতের অন্ধকারে এসে ডুংরিতে হানা দিয়ে
ধরে নিয়ে যেতে পারে।

নবীন তবু খবরটা সোয়ীর কাছে যাচাই করতে চায়।

সোয়ীর তুচোখে কি বিচিত্র নেশা। সোয়ী হাল্কা স্বরে বলে।

—যেতে দাও সাহেব, উদের মুরোদ বুঝা আছে। কইগো—-ালটাল বার করো। তবে বাপু শুধু মাল এ হবেক নাই। মানসো-ও চাই! নবীন পাঠক বলে—হবে রে, হবে!

সোয়ী জানে পুরুষকে মাতাল করে দিতে। রাত নামে। তারাগুলো জেগে আছে। বনের গভীরে নীচের জলায় হরিণ সম্বরের ডাক শোনা যায়। কালো ছায়ার মত তু'একটা ভালুক মদের ভাটি থেকে বাতিল জল খেয়েই নেশা করতে আসে।

সোয়া দেখছে আকাশের মাথায় ডুরখা ইপিল উঠেছে। নবীন পাঠক যেন নেতিয়ে পড়েছে। মদের বোতল থেকে সব মদই ঢেলেছে ওর গেলাসে। আর নিজের দেহটাকে তুলে ধরেছে,···নজর রেখেছে সোয়া বন্দুকটার দিকে। ওটাকে সরিয়ে ফেলেছে সামনে থেকে। নবীন পাঠকের ওসব দেখার সময় নেই। মেজেতে গড়িয়ে পড়েছে লোকটা। বিড় বিড় করছে তখনও—এই সোয়ী কাছে আয়। এ্যই শলী—

বনের গভীরে এগিয়ে এসেছে রতনের দল। কানাই শিবু ওরাও তৈরী। রাতের বাতাস থিতিযে আসে—জানোয়ারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়, জেগে ওঠে মাঝ আকাশে ডুরখা ইপিল তারাটা।

হঠাৎ হারিকেনটা তুলছে পাহাড়ের ওদিকের টং-এর ঘরে, যেন সেই লগ্ন এসেছে। পথ পরিষ্কার। হয়তো নবীন পাঠকের চোখে ঘুম নেমেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে লোকগুলো।

মশালের আলো জ্বলে ওঠে। ওই ছায়ামূর্তির দল এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই পাহাড় চাতালের চোলাই খানায়। ছিটকে পড়ে কে ওদিকে। আর্তনাদ করে অন্ধকারে একজন। ওরা ভাঙ্গছে বিরাট জালাগুলো। ছিটকে পড়ছে মদের পচানি, ওদিকের চৌবাচ্চাগুলো খুলে দিয়েছে, জলের মত গড়িয়ে পড়ে মদের ধারা। বাতাস ভরে ওঠে তীব্র গন্ধে। ড্রামগুলোকে গড়িয়ে ফেলছে পাহাড় থেকে, বিকট শব্দে সেগুলো ভেঙ্গে ফেটে ছিট্‌কে পড়েছে মদের ধারা।

নবীন পাঠকের নেশা ছুটে গেছে, চারদিকে কলরব আর্তনাদ ওঠে। লাফ দিয়ে নবীন বন্দুকটা তুলতে যাবে হাতের কাছে সেটা নেই। গর্জে ওঠে নবীন—বন্দুক! এ্যাই মাগী—মেরা বন্দুক!

সোয়ীও পালাবার চেষ্টা করে বের হয়ে এসেছে। পিছু পিছু দৌড়ে আসে নবীন—হঠাৎ পায়ের কাছে বন্দুকটা। এবার যেন জোর পেয়েছে সে। ওই মেয়েটারই কীর্তি এসব। নবীন দেখছে মশালের আলোয় ছায়ামূর্তিগুলোকে—তাণ্ডব বইয়ে দিয়েছে তারা।

নবীন বন্দুকটা তুলে গুলি চালাতে যাবে। ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সোয়ী তার ওপর, টলছে নবীন। গুলিটা বিকট শব্দে বের হয়ে যায়, তবু বন্দুকটা ছাড়েনি সে। আরও একটা গুলি রয়েছে, এবার আর নবীন পাঠকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি।

তীব্র আর্তনাদ শোনা যায় গুলির শব্দ ছাপিয়ে, ছিটকে পড়েছে সোয়ীর রক্তাক্ত দেহটা। গর্জে ওঠে নবীন—খতম করে দেগা সব কো।

তার আগেই কে জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়েছে তার দিকে, আগুনের ওই পিণ্ডটা ঠিকমত লাগে নি, পাথরের দেওয়ালে লেগে ছিটকে পড়ে নীচের ছড়ানো মদের জায়গাগুলোয়, আর সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ডভাবে জ্বলে ওঠে আগুনটা।

চারিদিকে মদের ধারা। টাটকা স্পিরিটের প্রাচুর্য্য—আগুনটা দেখতে দেখতে এবার ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

ছুটছে আগুনের রেখা ওই মদে ভিজে ওঠা গাছপালা বনভূমির দিকে।

নবীন আরও কজন ওই আগুনে বন্দী হয়ে পড়েছে। চীৎকার করছে। কিন্তু বাঁচার পথ নেই, লেলিহান শিখায় জ্বলছে আগুন, পুড়ছে সবকিছু, মদের পিপেগুলো ফাটছে আর আগুনের বিস্ফোরিত হল্‌কা ছুটছে বনের দিকে, লিগিরদার লালবনে আগুন ধরে গেছে। আগুন ধরে গেছে বনের শুকনো ঝরা পাতার স্তূপে, পত্রহীন গাছগুলো—শুকনো বাঁশবন জ্বলছে বারুদের মত।

সবুজ শ্যামল অরণ্যে জ্বলে ওঠে বেড়া আগুন, যেন খাণ্ডব দহন শুরু হয়েছে।

সোয়ী আর ফেরে নি। ওর সব জ্বালা—এদের আরণ্যক প্রতিবাদ -এর রুদ্ররূপ ফুটে উঠিছে শান্ত বনভূমিতে।

চমকে ওঠে ডুংরির মানুষ! অয় বাপ! হেই বোঙা—ইকি হল'গ!

ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আকাশ ছেয়ে উঠছে ধোঁয়ার পুঞ্জ। কানে আসে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, তীব্র জ্বালাকর ধোঁয়া যেন ছেয়ে ফেলেছে ডুংরির আকাশ!

বোরাই সর্দার দেখছে ওই দিকে। চীৎকার করে ওঠে সে,—

—হুঁসিয়ার! দাবাগুন লেগেছে বটে বনে বনে! সামাল দিবা হে—

সামলাবার কোন পথই নেই। পাতা ঝরা বন—শুক্‌নো গাছ—রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে সব, আর বেড়া আগুনের তাপে বিরাট বনস্পতিগুলো জ্বলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পাহাড় এর বুক জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা নেচে চলেছে, জ্বলছে বুক জুড়ে ঘাস বন। আর্তনাদ করে আছড়ে পড়লো গাছটা!

বনের দিক থেকে তীব্র চীৎকার ওঠে, বের হয়ে আসছে হুঙ্কার ছেড়ে রিরাট একটা বাঘ—দৌড়চ্ছে সে বোরো পার হয়ে ওদিকের বনে। কয়েকটা হাতি পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে ভীত ত্রস্ত বনশূয়োরকে। …ওরা পালাচ্ছে অন্যদিকে, হরিণ সম্বরগুলো হলুদ রেখার মত লাফিয়ে লাফিয়ে বের হচ্ছে, কে ছিটকে পড়ে ওই আগুনে—অন্যগুলো দৌড়লো।

বোরার দিকে এগিয়ে আসছে আগুন। তিনদিকে ঘিরে আসছে এই ডুংরিকে। চীৎকার করে ওরা।

—জল দিয়ে ভিজিয়ে দে ঝুপড়ি গুলানকে!

মেয়েরাও কলসী নিয়ে জল তুলছে, ছুঁড়ছে ঘরের দিকে। মরদগুলো কুড়ল নিয়ে নেমেছে, ওদিকের গাছের বেড়াকে কেটে ফেলছে ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে।

আকাশ ভরে ওঠে পাখীদের কলরবে। বিষ ধোঁয়ায় ছিটকে পড়ে বনটিয়ার সবুজ ঝাঁক—ধনেশ পাখী। পাহাড়ী ময়নাগুলো কলরব করে বোঙার থানের বনপাতির মাথা ছেড়ে উঠে পড়েছে। এতো দিনের আশ্রয়ও আজ নিরাপদ নয়।

চীৎকার করে ওঠে বোরাই সর্দার—হায় বোঙা! ওরে ভাপি যা! আগুন ছিটকেছে ইধারেও! অয় বাপ্!

বিরাট বট শাল গাছগুলোর নীচে বোঙার থান। এতদিন ধরে ওই বনস্পতিমূলে ওরা বাসা বেঁধেছিল, এ মাটিতে ফল ফসল ফলিয়েছে, ওই বোরার অমৃত ধারা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে। আজ সেই বোরার জল আগুনের তাপে যেন বাষ্প হয়ে উঠছে, ভেসে আসছে মরা ময়ূরের পোড়া দেহ, জলটা কালো ছাই-এ বিষিয়ে গেছে!

...আগুন ছিটকে পড়েছে ওই বনস্পতির মাথায়, দাউ দাউ করে জ্বলছে ওই গাছটা, ঝুপড়িতে আগুন ধরেছে, জ্বলছে ঝুপড়িগুলো!

যুদ্ধ শেষ, গৃহহারা সর্বহারা মানুষগুলো ওদিকের ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে, নিষ্ঠুর কোন প্রকৃতি ওদের সব কেড়ে নিয়েছে।

বোরাই বুড়োর মাথার চুলগুলো সর্বাঙ্গে পোড়া ছাই-এ কালো হয়ে গেছে। আগুনের ফুলকিতে ওর হাত-পা গুলোও পুড়েছে! জ্বালা করছে। ক্লান্ত পরাজিত লোকগুলো আজ ভীত চাহনি মেলে দেখছে ওই অরণ্যের রুদ্র অগ্নিরূপ। বোঙার অভিশাপে যেন সব শেষ হয়ে গেল।

অপরাধী মুনিমজী, টুয়াইও সরে এসেছে।

কে গর্জে ওঠে—ও দুটোকেও ফেলে দে আগুনে, পাপের বীজ শেষ হোক!

চমকে ওঠে মুনিমজী, ওরা যেন চরম প্রতিশোধই নেবে এবার।

আর্তনাদ করে মুনিমজী—সর্দার!

বোরাই সর্দারের পায়ের কাছেই ছিটকে পড়ে ওই লোকটা। কাঁপছে ভয়ে। সব গেছে ওদের। বোরাই সর্দার চাইল ওই উত্তেজিত লোকগুলোর দিকে। পোড়াছাই মাখা মানুষগুলোর দু'চোখে

আগুনের হল্‌কা। সর্দারও জানে এ জ্বালার মর্ম। সেও আহত, ক্লান্ত! তবু অসুস্থ মানুষটা ধমকে ওঠে তাদের—চুপ যা তুরা, ছেড়ে দে উদিকে!

ডুংরির এদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে, ওদিকে জঙ্গল বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়ের ঢাল থেকে সুরু হয়েছে। তাই ওই আগুনটা এই ডুংরি অবধি এসে সব পুড়িয়ে শেষ করে থেমে গেল।

তখনও জ্বলছে ঝুপড়ির ঘর—বাঁশ সবজীর ক্ষেত।

বৃদ্ধ বটগাছটা জ্বলে জ্বলে আংরা হয়ে ছিটিয়ে পড়েছে ওই মাটির বুকে—বোঙার থানের পাথরগুলোর উপর, এই বসতের শেষ ধ্বংসস্তূপের উপর কি অভিশাপের মত।

সোনাই মুণ্ডা, ভূধর পাঠক রাত ভোর বনের ওদিকে চোরাপথ দিয়ে জিপ নিয়ে ঢুকেছিল, এগিয়ে আসছে দারুভাটির ওই পাহাড়ের দিকে। ভোরের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে দূরে।

চমকে ওঠে পাঠকজী—আগ্ জ্বলতা সোনাই! দেখো জী!

সোনাইও জিপ থেকে নেমে দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠে, ওদের দারু ভাটির সারা পাহাড়টা জ্বলছে, জ্বলছে ওদিকে বন! পথটার দুদিকের গাছে আগুন লেগেছে।

—কি হল? সোনাই বিড় বিড় করে।

—সত্যনাশ হোয়ে গেল সোনাই, লাখো রুপেয়া বরবাদ হোয়ে গেল! চলো উধরি সে!

ভূধর পাঠক পাগলের মত হাহাকার করে।

গুম হয়ে বসে আছে সোনাই। এ আগুন বোধহয় ওরাই লাগিয়ে দিয়েছে। কে জানে লোকগুলো কোথায়। ভূধর আর্তনাদ করে।

—নবীন বেটা কিধার হ্যায়?

এখন ওদিকে যাওয়া অসম্ভব। তাই ঘুর পথে ওরা এদিকের ডুংরিতেই আসছে। ঘণ্টা কয়েকের পথ। তবু আসতে হবে তাদের, খবরটা নেওয়া দরকার।

—জল ! বোরাই সর্দারের তৃষ্ণায় যেন বুক জ্বলে যায়। তৃষ্ণার্ত ওরা সকলেই। ওদের বোরোর জল বিষিয়ে গেছে। ওপাশের দূর বনে থেকে কয়েকজন জল আনছে। সে জলও বিস্বাদ। তাই খাচ্ছে ওরা ! হঠাৎ জিপটা এসে দাঁড়িয়েছে এদের সামনে।

নেমে আসছে সোনাই—ভূধর পাঠক-এর দল। মুনিমজী-টুয়াই ওদের দেখে দৌড়ে যায়—জান বাঁচাও মালিক !

টুয়াই এবার বলে, অভিযোগের স্বরে—ওরা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছিল মালিক ! সোনাই দেখছে মাঠের এদিকে ওদিকে ছড়ানো মানুষ গুলোকে। পেছনের বনে তখনও আগুন জ্বলছে, ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে ডুরির ঘরগুলোয়, বোঙা থানের বট-শাল, পিয়াশাল, সবুজ হরিতকী গাছগুলো পুড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওই বিরাট ধ্বংসের মাঝে কাঠের আংরা ছাই মাখা মানুষগুলোকে যেন আদিকালের প্রেতাত্মা বলে মনে হয়।

বোরাই সর্দার ধুঁকছে তবু টুয়াই-এর কথা কানে যেতে সে গর্জে ওঠে—মিছা কথা বলবি নাই তু !

সোনাই—ভূধর পাঠক আজ অনেক হারিয়েছে। মনে হয় এই অগ্নিকাণ্ডের মূল ওই ভাটিখানা, ওরাই গোলমাল বাধিয়েছে সেখানে। সোনাই গর্জে ওঠে।

—ও মিছে কথা বলছে ? এ আগুন কেনে লাগলো হে সর্দার !

—বোঙা জানে ! বোরাই জ্বালা ভরা কণ্ঠে চীৎকার করে—তুরা, তুদের লোভ লালসার আগুনে আজ এই বন—ই বসত পুড়ে ছাই হয়ে গেইছে। কেনে গেলি বোঙার থানে বাবা বিরসা মহারাজের থানে ওই কায করতে ? আজ তুদের জন্যেই আমাদের ঘর বসত সব গেল—তুই ! সোনাই তুই ধরমনাশ করলি !

গর্জে ওঠে সোনাই—

—আমার জন্যে ? এতবড় মুখ তোর ? সর্দার—

সোনাই এগিয়ে এসে সপাটে একটা চড় মেরেছে বুড়ো বোরাই-এর মুখে, প্রচণ্ড আঘাতে আহত অসুস্থ জীর্ণ লোকটা ছিটকে পড়ে

পাথরের ওপর, কপালটা কেটে গেছে—মুখ নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। কালো ছাইমাখা বৃদ্ধ মানুষটাকে ওই রক্তে যেন বীভৎস দেখায়।

এরাও লাফিয়ে ওঠে। কে গর্জায়,—

—শেষ করে দিব তুকে সোনাই। ওই আগুনেই জ্যান্ত পুড়াবো তুদের।

ভূধর পাঠকও তৈরী হয়ে বের হয়, বিপদের গুরুত্ব বুঝে সে রিভলবারটা বের করেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে এই ডুংরির মানুষগুলো।

বোরাই হাঁপাচ্ছে, থাম, থাম তুরা। ইকি করছিস?

প্রকাশ্য লড়াইটা তখনকার মত থেমে রইল। স্তব্ধতা নামে পোড়া প্রান্তরে। দুপক্ষই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে আগামী ঝড়ের থমথমে আভাস।

ভূধর বলে—চলো সোনাইজী, বান্দাবস্ত পিবু হোগা।

স্তব্ধ ধ্বংসপুরীতে দিনের সূর্য এক সর্বনাশা রূপে আজ প্রতিভাত হয়েছে, কোথাও যেন কোন আশ্বাস নেই। ওই যেন এক মহাশ্মশানের ধ্বংসস্তূপে বসে একটি যুগের অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে কি বেদনায়।

কুইলি ঘুমতে পারেনি। সে আজ বিনিদ্র রজনীর প্রহর গোণে, দেখেছে, বাবা বের হয়ে গেল। বাড়িতে সে একা! দুর্গা-রায়ানের—কথাগুলো মনে পড়ে। দুর্গারায়ান-কে আজ ঘৃণা করে কুইলি, ঘৃণা করে এদের সবাইকে, এই দিখুদের জগৎকেই।

ভোর হয়ে আসছে। কুইলিও বের হয়ে এল। সহরের ঘুম ভাঙ্গে নি এখনও। আলোগুলো জ্বলছে, এককালে এখানেও ছিল ঘন বন। এখনও চড়াই উৎরাইর ঠাঁই ঠাঁই মাথা তুলে রয়েছে শালবন গুলো! থমথমে অন্ধকার জড়িয়ে আছে। বিজলি আলোগুলো এখানে বেমানান। কুইলির মতই ওরা যেন নিস্তব্ধ অন্ধকারে টিকে আছে কোনমতে।

কোনদিকে যাবে জানেনা কুইলি, সভ্যজগতের দিকে নয়, ও চলেছে এই দিখুদের জগৎ পিছনে ফেলে সামনের বনজগৎ-এর দিকে।

আবছা অন্ধকারে পাহাড়-এর ঢেউগুলো আকাশ ছুঁয়েছে, নিবিড় অন্ধকার-এর বুক থেকে সেই মহান একটি রূপ নোতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

এই বিরাট রূপ এই অপরূপ সৌন্দর্যকে কোনদিন দেখেনি কুইলি, তার চোখের সামনে এক নবদিগন্ত নোতুন আলোয় জেগে ওঠে। পাখীরা কলরব করে, মেঘগুলো ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় পাহাড় বনের রাজ্যে, ওই বিশাল রহস্য জগতের সে একজন—ওখানেরই একজন।

তার তুলনায় এদিকে দিখুদের রাজ্যটা কেমন এবড়ো খেবড়ো। পাহাড়গুলোকে ধ্বসিয়ে যেন লাল-কালচে দগদাগ্ করে তুলেছে নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের ক্ষতের বিবর্ণতায়। কুইলিকেও যেন এমনি ভাবেই এরা শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

আজ সে বিজয়িনীর দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে চলেছে বনরাজ্যে ওই ফেলে আসা জগতে। কাউকে তার দরকার নেই। যে কোন বসতিতে সে আদিবাসি সমাজের একজন হয়েই বেঁচে থাকবে আজ, তার কাউকে দরকার নেই। সব প্রেম, সব ভালোবাসা-বাবার স্নেহ সব মিথ্যায় পরিণত হয়েছে।

থমকে দাঁড়ালো কুইলি। বনে ঢুকেছে সে—এ বাতাস, এর সৌরভ তার চেনা, বনটিয়ার কলরব ওঠে। কতদূর পথ তাদের ডুংরী তা জানেনা। এগিয়ে চলে কুইলি শিশিরভেজা বনের পথ ধরে।

তার মনের সেই তীব্র জ্বালাটা হিমেল বাতাসে শাল ফুলের গন্ধমেশা পরিবেশে একটু কমে আসে। কোথায় যাবে জানে না, কোন দিকে তাদের ডুংরীর পথ তাও জানে না। লোকজনও কেউ নেই বনের গভীরে, শুধু ঘনছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে সরজম দারু শালবন। চলেছে একটি অরণ্য দুহিতা তার চেনা জগতের সন্ধানে।

করমপাদার বনপাহাড়-এর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কায শুরু হয়েছে। ঘনবন সাফ করে পাহাড়-এর পাথর বের করছে, ওদের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিটকে পড়ে শাল সেগুন বন। দামী রোজউড

গাছগুলোর মিষ্টি গন্ধ লিকুইড অক্সিজেনের বিস্ফারিত বিষ বাতাসে হারিয়ে যায়।

প্রভাত রায় এগিয়ে চলেছেন, তার মিনারেল ডিপজিট রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে বনঅঞ্চলে লুটেরার দল এসে হানা দিয়েছে। মাথা তুলেছে লোহার ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচারগুলো, নীল মেঘমুক্ত আকাশে ধোঁয়া উঠছে, কালো বিষ ধোঁয়া। রেললাইন ঠিক হয়ে গেছে, আসছে মালগাড়ি—বোঝাই মালপত্র, যন্ত্রপাতি। ইঞ্জিনের সিটির শব্দ বনের স্তব্ধতাকে খান্‌খান্ করে দিয়েছে। করমপাদার নোতুন বসতে ফিরে এসেছে স্বাভাবিক জীবন, দোকানগুলো মাথা তুলেছে আবার, মদের দোকানে হল্লা ওঠে। সেই হাতিটার উপদ্রব আর নেই। বনের আতঙ্ক মুছে গেছে।

প্রভাত রায় দেখেছেন মুরুংকে। সেই বুনোহাতিটার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মুরুং যেন বদলে গেছল, তার পর থেকে কেমন গুম হয়ে গেছে, কায করে যায় মুখ বুজে।

আর উদাস শূন্য চাহনি মেলে চেয়ে দেখে ওই বনপাহাড়ের দিকে। তাঁবুর বাইরে বসে মিঃ রায়কে শুধোয়।

—এ বনপাহাড়েও কিরিবুরুর মত সহর গড়বেক না স্যার? শ্বেতি বোরোকে বাঁধ দিচ্ছে দেখলম!

মিঃ রায় দেখছেন মুরুংকে। মনে পড়ে বারবার বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এর কথা। সেদিন অরণ্য কেটে মানুষ সবুজ শস্যক্ষেত বানিয়েছিল, ঘরবসত করেছিল মাটির কাছাকাছি মানুষগুলো। তবুও অরণ্যমর্মরের নিঃশেষ বিলুপ্তির হাহাকার শুনেছিলেন তিনি। কতো চাঁদনী-রাতে বার বার মনে পড়েছে, সেই নির্মম সত্যটাকে, যমুনা প্রসাদের সরস্বতী কুণ্ডীতে ফুল ফোটানোর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

আজ এখানের অরণ্যে তার চেয়েও বেশী কিছু ঘটে চলেছে আর প্রভাত রায় যেন নিজেকেও সেই অরণ্যমেধ পর্বের অন্যতম অপরাধী বলেই মনে করেন। সুন্দরী সারান্দাকে এরা দখল করছে, তার কুমারী আরণ্যক শুচিতাকে এরা অপবিত্র করেছে, সেই হাহাকারকে

দিয়েছে দাবিয়ে এরা এদের উদ্ধত বিস্ফোরণে। অরণ্য কেটে সবুজ শস্য-ক্ষেত গড়েনি—এরা লুঠ করে চলেছে এর বুকের অতলের সম্পদ, পাহাড় গুলোকে ধ্বসিয়ে ভিতরের লোহাপাথর-ম্যাঙ্গানীজ-কোবাল্ট-তামার চর তুলে তুলে ধ্বসিয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে অরণ্যের গভীরের দিকে চলেছে।

—স্যার! এসব বন হারিয়ে যাবে বড় বিলের মত!

মিঃ রায় মাথা নাড়েন—হ্যাঁ রে। এখানে গড়ে উঠবে মাইনস্ কলোনী। দেশের কাযে লাগবে এই সব সম্পদ।

মুরুং বলে ওঠে—কেনে বন—ওই বনের জানোয়ারগুলো ইখানের ডুংরীর মানুষগুলো কি দেশের কুন কাযে লাগাতা নাই স্যার? তবে এগুলো যুবাই দিবেন কেনে?

এর জবাব দিতে পারেন না মিঃ রায়। সভ্যতার এই আগ্রাস আজকের জীবনকে গ্রাস করেছে, ক্লিষ্ট করেছে। হয়তো দিয়েছে অনেক, কিন্তু হারাতে হয়েছে অনেক কিছুকেই।

তবু একে এড়াবার পথ নেই। মেনে নিতেই হবে। মুরুংও মেনে নেবে ক্রমশঃ, আজ পারেনি, একদিন পারবে।

মিঃ রায় বলেন।

—কাল চল তোদের ডুংরির দিকে যাবো। কতোদিন যাস্‌নি, দেখে আসবি ওদের।

মুরুং চুপচাপ থাকে। ভয় হয় তার। মনে হয় তার চোখের নজর হয়তো ভালো নয়, এখানের করমপাদার বন যেতে বসেছে, ওদের ওই বনরাজ্যের দিকে চোখ দিতে যাবে না সে। যদি আবার সেই ছায়াসবুজ পাখী ডাকা বন—সেই অরণ্যজীবন হারিয়ে যায়? তাই এড়াতে চায় সে। শুধোয় মুরুং।

—উদিকে ওই ম্যাপ-চেন-থিয়েডোলাইট, কালেকশন ব্যাগ নিয়ে যাবেন নাকি স্যার?

হাসেন মিঃ রায়—না রে। ভয় নেই। এখানেই যা চলছে চলুক। শুনেছি ওদিকের বন সত্যিই সুন্দর। তাই দেখতে যাবো।

:দখে আসবো তোদের ডুংরী—বোঙা বুরুর থান তোদের বোরোটাকে —:যেখানে বনচাঁপার ঘন গাছগুলো হলুদ ফুলে ভরে থাকে।

মুরুং যেন স্বপ্ন দেখছে—হ্যাঁ স্যার! বহু ফুল খিলে সেখানে, পাহাড়তলি পুরো হলুদ হয়ে থাকে, এখন সেতাপলাশ-গোলগোলি ফুলও খিলবে, লাল—রক্তের মত লাল বরণ। বনে যেন সিন্দুর ছড়ানো থাকে, ময়ূরগুলো ঘুরে বেড়ায়, বোরোয় হরিণ চিত্রল, বারোসিঙ্গা নামে জল খেতে। সোন্দর বাহারের বন স্যার। ছবির মতন! বৈকালে গেড় বুরুর ওদিকে সবুজ ডুবে যায় তখন আলোর বান ডাকে, লাল গোলাবী আভায় সবুজ হলুদ বন রেঙ্গে উঠবেক। মকাই-রামদানার ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে সেই আভা।

মিঃ রায়—এর চোখে শান্ত গহন অরণ্যের পর্বতসানুর একটি উপত্যকার শান্ত ছবি ভেসে ওঠে। সেখানে তবু প্রশান্তি বজায় থাকুক, বিভ্রান্ত মানুষের জন্য থাক একটু সবুজ স্নিগ্ধতা বাঁশীর সুর।

মিঃ রায় বলেন—ওখানে ওরা শান্তিতে থাকুক মুরুং। চল তবু সেই ছবিটাকেও দেখে আসবো।

নোতুন উৎসাহ নিয়ে চলেছে মুরুং এতদিন পর তার ডুংরির দিকে। রমপাদার লালাজীর দোকান থেকে বোরাই সর্দারের জন্য কিনেছে নোতুন ধুতি, একটা চাদর। শীতে কষ্ট পায় বুড়ো। আর কুইলির জন্য কিনেছে একছড়া মালা, কারবারী বেনিয়ারা এখানেও সেই শঙ্খের মালা আমদানী করেছে। কুইলিকে মানাবে ভালো। চোখে সেই ডুংরির ছবিটা ভেসে ওঠে। চলেছে জিপ দাবড়ে।

পাহাড়ী পথ, মোরাম ঢালা একটু রাস্তার নিশানা রয়েছে মাত্র, মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে ঝরনার জল নেমে পথটা পিছল, দুদিকে নবন বুকভোর চাইগ্রার গ্র্যাস এর জঙ্গল। একপাল হরিণ চরছিল জিপের শব্দে শূন্যে লাফ মেরে ঘাসের বনে হারিয়ে গেল।

মিঃ রায় বলেন—পাহাড়ী পথ, একটু আস্তে চলো মুরুং। ডুংরীতে পৌঁছাবার নামে দেখছি উড়ে যাবার মত চলেছিস!

কে আছে রে?

চমকে ওঠে মুরুং! কুইলির কথা মনে পড়ে। এতদিনে আরও সুন্দরী আরও পরিপূর্ণ হয়েছে সে। তার ডাগর চোখে ফুটে উঠবে কি বিস্ময়, হয়তো অভিমানই।

—কিরে। চুপ করে রইলি যে! মিঃ রায় হাল্‌কাস্বরে শুধোন। মুরুং বলে—জেঠা আছে স্যার। ডুংরীর সর্দার। বন্ধুবান্ধব আছে। হাসেন মিঃ রায়, আর কেউ নেই? এঁ্যা—মিছে কথা বলছিস না তো? কাউকে ভালোবাসিস নি?

মুরুং এর মুখটায় ফুটে ওঠে সলজ্জ আভাস। মাথা নাড়ে সে।

—নেহি স্যার!

হাসেন মিঃ রায়, ধ্যাৎ—মরদ! লজ্জা কিসের রে? এখনতো তুই সরকারী চাকরে। ভালো মাইনে—বল, কেউ ছিল কিনা? তালে বিয়ে সাদীর ব্যবস্থাই করে দোব। একদিন তোদের সাদীতে এন্তার মহুয়াই খাবো।

মুরুং-এর চোখের সামনে তেমনি একটি উৎসবের ছবি ফুটে ওঠে। মাদল বাঁশীর সুর উঠবে। ধামসায় বাজাব বিলম্বিত লয়। সমবেত সুরে গান গাইবে!

কুইলির ডাগর কালো সলজ্জ চোখের চাহনি ভেসে ওঠে। জিপটা চলেছে করমপাদার বন ছাড়িয়ে সুলং বুরু পার হয়ে এবার তাদের বসতির দিকে। কিছুটা গেলেই এই ঘনবনের এলাকা শেষ হবে। তারপরই তাদের ডুংরির উপত্যকা—মাঠে মাঠে এখন মকাই রামদানার ফসল, ঘন টিয়া-ময়না, খঞ্জন-বাঁশপাতা পাখীর কলরব ওঠে, বাতাসে উঠবে বনচাঁপার সুবাস। তাদের উপত্যকা সুরু হবে সেখান থেকে —কানে আসবে তাদের বোরার কুলু কুল শব্দ।

মুরুং বলে—এসে গেছে স্যার্। এই বনের পরই আমাদের ডুংরি। বাতাসে ইবার বনচাঁপার খোসবু দেখবেন মৌ মৌ করছে, বনকে বন হলুদ হয়ে আছে সামনে!

জিপটা বনের বাইরে মোড় নিয়ে সামনের ফাঁকা মাঠে বের

হয়েছে। মুরুং ব্যগ্র চাহনি মেলে খুঁজছে তার সেই ডুংরিকে—বনচাঁপা বনঝোরা পাহাড়ের বুকঢাকা সবুজ হলুদ অরণ্যসীমাকে!

—একি! চমকে ওঠে মুরু। হাত কাঁপছে তার!

বাতাসে ওঠে বিষগন্ধ, বাতাস এখানে পূতিগন্ধে ভরা, বোরার স্বচ্ছ কাঁচধার জল ছাইএ কালো, পোড়া পাখী জানোয়ারের মৃত দেহের ভিড়ে বিষাক্ত; সামনের ডুংরিটা নেই। ছবির মত সাজানো ডুংরি-রঙ্গিন গিরিমাটি—খড়ি মাটির আলপনা চিত্রিত দেওয়াল—ঘরগুলো পরিণত হয়েছে আংরা ছাই এর স্তূপে। বনচাঁপার অরণ্যসীমা ছাড়িয়ে সামনের গেড়াঁবুরুর সবুজ বন পোড়া গাছের বিবর্ণ নিঃস্বতায় শ্মশানের মত হয়ে উঠেছে। কোন সবুজ স্নিগ্ধতা নেই।

বোঙার থানের বনস্পতিগুলো পুড়ে ভেঙ্গে পড়েছে,…শাল, বট-হরিতকি গাছগুলোর ছায়াসবুজ দাক্ষিণ্য আজ অবলুপ্ত!

মিঃ রায়ও এই সর্বনাশ দেখে চমকে ওঠেন।

—এ কোথায় এলাম রে? তোদের ডুংরি—সেই বোরা, বনচাঁপার অরণ্য—

আর্তনাদ করে ওঠে মুরু—সব হারিয়ে গেছে স্যার, পুড়ে ছাই হয়ে গেল! জেঠা— জেঠা'গ!

জিপটা এসে থেমেছে মাঠের মধ্যে ওই ছন্নছাড়া মানুষগুলোর কাছে। তোকি বুড়ি এগিয়ে আসে—কে! মুরু—তু আলি রে!

ই কুথায় আলি বাপ্! সব যে জ্বলেপুড়ে খাক্ হই গেল, হ দ্যাখ বোঙার থান্ জ্বলছে, বিষাই দিলেক বোরার খীর ধারা বসুমতিকে জ্বালাই দিলেক উ সোনাই মুণ্ডা। ভাগি গেল উ তবু ছাড়লেক নাই। উর্ লুভে সব গেল রে।

—জেঠা, জেঠা কুথা'গ! কানাই উরো—

তোকি বুড়ি বলে—কানাইকে পুলিশ ধরবেক্—সোনাই জেলে পুরে দিবেক।

উ ভাগি গেল দিখুদের উদিকে। আর তুর জেঠা—হ দ্যাখ—

…কয়েকটা শালডাল মহুয়া-ডাল কেটে কুড়ে মত করা—সেখানে

পড়ে আছে মুণ্ডা সর্দারের দেহটা। শীর্ণ হাতে পায়ে পোড়ার ক্ষত, নাক মুখ কপালটা ফুলে রয়েছে—কুঁকছে বোরাই সর্দার। তখনও সর্বাঙ্গে ওর ছাই এর কালো দাগ!

বোরাই সর্দার চোখ মেলবার চেষ্টা করে—ঠিক দেখতে পায় না! আবছা অস্বচ্ছ একটা মুখ, বলিষ্ঠ চাহনি—বোরাই হাতটা তুলবার চেষ্টা করে। পারে না!

বসন্ত মুণ্ডা বলে—কাল থেকেই এমনি হইল, উ আর বাঁচবেক নাই মুরুং। ই বনের সব সরজম্ দারুর মত উর ভিতর বাইর কি কি জ্বালায় জ্বলে খাক্ হই গেছে মুরুং! তবু তু শ্যাষ দ্যাখা দেখে যা—

তোকি বুড়ি চীৎকার করে ওঠে কান্না ভরা হাহাকারে।

—দ্যাখ, দ্যাখ সর্দার। তুর মুরুং আইছে রে!

....দীপ নিভে আসে। নিভে আসে এ অরণ্যের একটি যুগ। মুণ্ডা সাতাশীর অপমৃত্যু ঘটেছে আগেই। আজ এক বিষাদ ভরা মধ্যাহ্নে কুস্‌মা ডুংরির জীবন থেকে বোরাই সর্দারের নাম টুকুও মুছে গেল। সারান্দা অরণ্যের এক অতীত, মুণ্ডা রাজার শেষ প্রতিভূ ওই অগ্নিদগ্ধ বনস্পতির মত জ্বলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

—জেঠা! জেঠা'গ! মুরুং এর সেই আর্তরোল ওর কানে যায় না।

নীরবে কি অবহেলায়—একালের কঠিন আঘাতে হারিয়ে গেল সেই সর্দার রাজা।

এই মুরুং তাদের কেউ নয়! স্তব্ধতা নামে শ্মশান ভূমিতে! ডুকরে কেঁদে ওঠে ওরা! অসহায় বিভ্রান্ত মানুষগুলোর আপনজন আজ হারিয়ে গেল। দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মুরুং!

মিঃ রায় এই সর্বনাশ দেখে শিউরে উঠেছেন। মুরুং-এর স্বপ্ন-দেখা সেই বন, তার জগৎ-এর এমনি একটি নিঃশেষ ধ্বংসস্তূপে পরিণতি দেখে তিনিও বেদনা বোধ করেন।

বোরার ধারে ওইখানেই পোড়ামাটির নীচে ঘুমিয়ে রইল বোরাই

সর্দার। বসতির অসহায় মানুষগুলোর চোখের জল জমে পাথর হয়ে গেছে। বেলা ফুরিয়ে আসছে এবার। এই উপত্যকার ওদিকের জোড়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলে দিনশেষের আবছা আঁধার ঘনিয়ে আসে। মিঃ রায় মুরুং-এর ডাকে চাইলেন।

ও উঠে এসেছে। চারিদিকের কালো ছাই ছড়ানো নিঃস্বতায় রচিত হয়েছে কুসমা ডুংরির সর্বনাশের কাহিনী। সব হারিয়ে গেল মুরুং-এর।

চলে গেল বোরাই সর্দার। কুইলিও হারিয়ে গেছে। তার অতীত-ভবিষ্যৎ সব হারিয়ে গেছে সেই সঙ্গে। কোন ছায়া-তরুর আশ্বাস্ নেই। আজ সামনে শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

মুরুং বলে—চলুন স্যার! ইখানের পালা তো শেষ হই গেল। জিপটা ফিরছে এবার করমপাদা লুটেরা নোতুন কলোনীর দিকে। মিঃ রায় বলেন—সদরের ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারে খবরটা দিয়ে যাই। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট কি করছে জানা দরকার। ওই মানুষগুলোর বাঁচার পথ করতে হবে তো?

মুরুং অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে—ভিখ্ দিই বাঁচাই লাভ কি উদের? আর ডুংরি কুনদিন গড়ে উঠবেক নাই সাহাব। ওই বোঙা পাহাড় গেড়াবুরুতে খাদান হবেক। পোড়া বনের ছাই সরিয়ে ইবার ব্লাষ্টিং করে ফাটাই দিবেক ওই বোঙার থান। আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানীজ ওর তুলবেক, আর ডুংরির ফুলফোটা বনচাঁপার ঢাল, বনে লয় গোল-গোলি লতা পলাশের আগুন জ্বালবেক উদের বুকে, উদের হু হু করা মনে। মাদল বাঁশীর সুরও উঠবেক নাই—

সিখানে উঠবেক কনভেয়ার বেল্ট ক্রাশিং মেশিনের পাথর চিরোনের শব্দ। ওরা খাদানের মালকাটা মজতুর হই দিখুদের সাথে মিশে যাবেক। হারিয়ে যাবেক। সারান্দার বনকে বাঁচাতে পারবা নাই স্যর, সাথ সাথ উরাও মরবেক!

প্রভাত রায় চুপ করে শুনছেন ওর কথাগুলো। সেইটাই সত্যে পরিণত হবে এবার। মাইনস্ ডিপার্টমেণ্টও এ সুযোগ ছাড়বে না।

ওসব পাহাড় সাফ হয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, এখন অর্দ্ধেক খরচায় ওখানে রেজিং করা যাবে। কুসুমা ডুংরী পরিণত হবে ন্যাশ-ন্যাল ওর মাইন্‌স-এ।

মুরুং চুপ করে বসে দেখছে, বনপর্বতে দিনশেষের আলো নেমেছে, জিপটা চড়াই এ উঠছে বুক ঠেলে, এখানে নীচের গভীর অরণ্য এখনও কোনমতে টিকে আছে, কতোদিন থাকবে কে জানে।

…খাড়া পাহাড়ে উঠে চলেছে, জিপটা সামনে খানিকটা সমতল তার পরই সোজা নেমে গেছে পাহাড়টা, তার বহু নীচে বয়ে চলেছে কয়না নদী। উপল বিছানো পথে নদীর স্বচ্ছ জলধারা নেচে নেচে যেতো সুর তুলে। বহু নীচ থেকে এখানে দেখা যেতো সুন্দরী করনা পাহাড়, নর কঠিন শিলাস্তরক যেন হারের মত জড়িয়ে পেঁচিয়ে কুমডির বনের দিকে চলে গেছে, তুদিকে সবুজ ছায়াতরুর বেষ্টনী।

হঠাৎ চমকে ওঠে মুরুং কাকে দেখে। পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে একটা রথ পাথরের উপর বসে হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। মুখ চোখ শুক্‌নো, কি বেদনায় মলিন বিষণ্ণ!

চমকে ওঠে মুরুং।

এতদিন ওকেই সে খুঁজে বেড়িয়েছে, দীর্ঘ তুবছর ধরে স্বপ্ন দেখেছে একটি অনুভূতির, একটি জীবনের! আজ মুরুং এর সব হারিয়ে গেছে। তাই ওকে আজ সত্যিকার প্রয়োজন। এই শ্মশানের মাঝে আবার নোতুন করে বাঁচবে সে আর কুইলি।

—কুইলি! সাব্ জিপটা রুখ্‌ন সাব্! আভি!

মিঃ রায়ও দেখেছেন ওই মেয়েটিকে। দেখেছেন মুরুং-এর চোখমুখের পরিবর্তন, শুনেছেন তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। ওই ডাক। ব্রেক করেছেন জিপটা। একটু গিয়েই থেমে যেতে লাফ দিয়ে নেমেছে মুরুং! দৌড়চ্ছে ওই মেয়েটির দিকে।

কুইলি একরাত কুমডির আদিবাসী বস্তিতে রাত কাটিয়ে পথের নিশানা নিয়ে বের হয়েছে। চলেছে সে বনের পথ ধরে। সারা মনে ওর অবিশ্বাস আর ঘৃণা। মনে হয় বাবা তার বের হয়ে আসার

খবর পেয়ে খুঁজতে বের হবে এই পথে। আবার খুঁজে তাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। এবার আটকে রাখবে তাকে, বন্দী করবে মুক্ত বিহঙ্গকে! ওই দিখুদের সঙ্গে মিশতে হবে, চুপ করে শুনতে হবে ওদের বিশ্রী কথাগুলো মুখ বুজে সইতে হবে দুর্গা রায়ানের শাসন আর বদলে যাওয়া সোনাই মুণ্ডার সব নির্দেশ। সেখানে ফিরে যাবে না কুইলি। সেখানে সে বাঁচতে পারবে না।

তাই বনের পথে জিপের শব্দটা শুনে চমকে উঠেছে, মনে হয়েছে সোনাই মুণ্ডার জিপ আসছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে, কুইলি পথ ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে ওই সমতলে ছড়ানো পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। কিন্তু জিপটা থেকে কারা তাকে দেখেছে, জিপটা থেমে যেতেই ধরা পড়ার ভয়ে কুইলিও দৌড়তে থাকে সামনের দিকে প্রাণভয়ে।

সামনেই কয়নার ধ্বস বহু নীচে সিধে নেমে গেছে পাহাড়টা, চীৎকার করছে মুরুং—কুইলি!

চমকে ওঠে কুইলি! দৌড়তে দৌড়তে থেমে গেছে। শুনছে ওই ডাক!

খাকি পোষাকপরা দিখুদের মতই কারা জিপ থেকে নেমেছে। ডাকছে ওকে!

থমকে দাঁড়িয়ে আবার পালাবার কথাই ভাবছে কুইলি!

—কুইলি! আমি মুরুং— কুইলি—

কুইলি একটু এগিয়েছে, হঠাৎ ওই কণ্ঠস্বরটা স্পষ্ট শুনেছে;

—মুরুং

তার জামরগ—ভালোবাসার স্মৃতি। শূন্য ব্যর্থ জীবনে যেন এসেছে ফুল ফোটার ইশারা, শুনেছে সেই বাঁশার সুর। ডুংরির বোরার কলরব—মাথার উপর ডেকে ডেকে চলেছে এক ঝাঁক পাহাড়ী ময়না।

—মুরুং!

অজানাতে সে এসে দাঁড়িয়েছিল তাড়া খাওয়া হরিণীর মত

ধ্বসের সীমান্তে, ঝুরো খড়িমাটির স্তর ঝরছে, হঠাৎ পায়ের নীচের শেষ মাটি টুকু ধ্বসে পড়ে সশব্দে বহু নীচে কয়নার বুকে।

আর্তনাদ করে ওঠে কুইলি। ব্যাকুল দুহাত দিয়ে সে সবকিছু পেতে চায়, ধরতে চায় তার শেষ নির্ভরটুকুকে, বাঁচাতে চায় সে!

কিন্তু তার আগেই ধ্বসে পড়েছে আলগা মাটি, ঝুরো পাথরের স্তর, সামনের একটা কেঁদ চারাকেই দুহাতে ধরেছিল কুইলি—মাটির বুক থেকে শিকড় সমেত সেটা উপড়ে কুইলিকে নিয়ে ছিটকে পড়েছে বহু নীচের কয়নার লাল কাদা মেশা জলের প্রবাহে।

আর্তনাদ করে ওঠে মুরুং! চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল সার্থক স্বপ্ন নিয়ে বাঁচার আশ্বাস, কিন্তু নিমেষেই সেটা শূন্যে হারিয়ে গেছে। অতল ধ্বসে তলিয়ে গেছে তার সব কিছু।

—কুইলি! মুরুং এর আর্ত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ বনের বুকে মুক্ত আকাশে কি হাহাকার ছড়িয়ে দেয়। কয়নার প্রবাহমান ধারা বনের একটি স্বপ্নকে বুকে নিয়ে এক মহান সুরের মীড় মূর্চ্ছনা তুলেছে।

...পিছনে আর একটা জিপও এসে পড়েছে। সোনাই মুণ্ডাও খুঁজতে বের হয়েছিল তার অবাধ্য মেয়েকে। সেও একটি চকিত মূহূর্তে দেখেছিল কুইলির তৃপ্তিমাখা, আশ্বাসভরা সেই চাহনি। ওই খুশির উদ্ভাসিত প্রকাশ কুইলির চোখেমুখে সে দেখেছিল নোতুন করে, সেই মূহূর্তেই নিষ্ঠুর এই পাহাড় অরণ্যে তাকে মানুষের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বনের কুমারী কন্যাকে তার বুকে স্থান দিয়েছে, কুইলি হারিয়ে গেছে সেই শ্যামল প্রশান্তির গভীরে চিরদিনের জন্য।

...মুরুং সামনে সোনাই মুণ্ডাকে দেখে চাইল।

সোনাইও চমকে ওঠে—তুই! মুরুং! কুইলিকে আটকাতে পারলি নাই রে!

সোনাইও এই সর্বনাশে চমকে উঠেছে। ওর কণ্ঠস্বর পরিণত হয় কি করুন আর্তনাদে। একমাত্র মেয়েকেও হারিয়েছে সে।

মুরুং দেখছে এই সোনাইকে, পরণে তার প্যান্ট-সার্ট। জিপে করে

ঘোরে। আজ সে মাইন-ওনার, পেয়েছে অনেক কিছু। সম্পদ, প্রতিষ্ঠা। তবু সে আজ আর্তনাদ করে, সব হারিয়ে গেল রে!

মুরুং আজ দেখেছে অনেককিছু। চিনেছে জীবনের কঠিন সত্যটাকে। বলে মুরুং—অনেক কিছু পেতে চেয়েছিলে সোনাইজী, তার জন্য দামও দিতে হয়। ডুংরীর সেই শান্ত জীবন—সব সুর-শান্তি এমনকি কুইলিকে ও তাই হারালে।

তবুতো অনেক পেয়েছো?

মুরুং এর কণ্ঠস্বর কি বেদনায় বুজে আসে। তার জীবনে সঞ্চয় কিছুই নেই। বোরাই জ্যাঠা-কানাই-ডুংরীর আশ্বাস-জীবনের সুন্দর স্বপ্ন, ওই কুইলি সব তার হারিয়ে গেছে। সে পেয়েছে শুধু হারাবার বেদনাই।

সুন্দর মুণ্ডার লোকজন ওদিকের পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে গেছে কয়নার নীচের ধারায় কুইলির শেষ চিহ্নটুকুকে উদ্ধার করতে।

—চলিয়ে স্যার।

মিঃ রায় অবাক হন। স্তব্ধ মুরুং এসে জিপে উঠেছে, তার ঘরে ফেরার সব পালা চুকে গেছে। আজ সে মুক্ত-নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ।

রাত্রি নামে করমপাদার ক্যাম্পে। সামনের সবুজ পাহাড় ধ্বসে পড়েছে ডিনামাইট-লিকুইড অক্সিজনের তীব্র বিস্ফোরণে। এগিয়ে চলেছে সভ্যতার বিজয় কাহিনী সবুজ সারান্দার গহনে।

চুপ করে দেখছে মুরুং!

আর এজীবনে কোনদিন ছাতাবুরুর পরব হবে না। সুর উঠবে না রেগড়া টামাক্-এ—ভুড়ি ভুড়ি তাম্ বাম্‌কে পটাম তাম্।

উঠবে না বাঁশীর সুর মৌফুলের গন্ধমাখা বনপথে কলরব করে, যৌবন মাতাল তরুণ তরুণীরা যাবে না শিকারের খেলায়, বারোসিঙ্গা। চিত্রল হরিণ, বনময়ুরের ডাক উঠবে নিশীথ বনরাজ্যে, আর কোনদিন ডুরকা ইপিল তারার রহস্যময়চাহনির দিকে চেয়ে মিলন রাত্রির প্রতীক্ষা।

তবু বিদায়ী সারান্দার বনমর্মরে যেন কান পেতে শোনে মুরুং তার প্রেয়সী কুইলির সেই ব্যাকুল আবেদন।

—তুকে সব দিলম্, ভালবাসলাম। তু মোর জামরগ্ হলি মুরুং!

....গুর্ গুর্ কাপড়ে সামনের পাহাড়টা—আছড়ে পড়ল কঠিন বিস্ফোরণে বনস্পতির দল—কলরব করে ভীত ত্রস্ত আশ্রয়চ্যুত পাখীর দল।

...এই সারান্দা-তাদের জীবন সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে কোন লুটেরার দল।

—মুরুং!

মুরুং মিঃ রায়-এর ডাকে চাইল। মিঃ রায় দেখেছেন ছেলেটাকে স্তব্ধ হয়ে বসে ওই পাহাড় বনের দিকে চেয়ে থাকতে। চোখে ওর বেদনার আভাস। মিঃ রায় বলেন—শোগে যা। কাল থেকে আবার কাযে বেরুতে হবে।

—যাই স্যার! চলে গেল মুরুং তাঁবুর ভিতরে।

দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ রায়। তাদের কায সুরু হবে আরও ভিতরে। মনে পড়ে আরণ্যকের কথা—বিভূতিভূষণ-এর চোখের সামনে হারিয়ে গেছল সেদিনের নাড়াবইহার লবটুলিয়ার অরণ্যভূমি, বনমহিষদের দেবতা টাঁড়াবারোর উপাখ্যান ঠাঁই নিয়েছিল গল্পকথায়, তার চোখের সামনে আজও মিঃ রায় দেখেছেন, মানুষের লোভী লম্বা হাতটা সারান্দাকেও মুছে মুছে দিয়ে এক নতুন ইতিহাস রচনা করছে!

তাই হারিয়ে যায় মুণ্ডা সর্দার বোরাই অমনি নিষ্ঠুর মৃত্যুর অন্ধকারে, মুছে যায় কতো ডুংরী—কতো কুইলির স্বপ্ন।

বনমর্মরে ওঠে তাদের হাহাকার। কেউ শোনে, কেউ এই বনমর্মরের বুকে হারানো বেদনাকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠুর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। কারণ ইতিহাস যত নিষ্ঠুরই হোক সে থামতে জানে না।